কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

সন ১২৮৭ আশ্বিন হইতে সন ১২৮৮ ভাদ্র।

প্রথম বৎসর।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৯৯ নং কালেজ ষ্ট্রিট, পটলডাঙ্গা ক্যানিং প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালের দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

OPINIONS OF THE PRESS.

Most of the articles in it give unmistakable evidence of the thinking powers of the writers, and of the command they possess over the Bengali language. The programme of the Magazine embraces a variety of subjects—social, political, literary and scientific. We have been particularly pleased with perusal of the exquisitely touching paper, headed "Young Widow of Bengal." The series of papers on "The Poet and the painter," are also worthy of perusal. The cheapness of the periodical *should* secure for it an extensive circulation.

INDIAN MIRROR.

Several short papers of value and interst appear in the eighth and ninth numbers of the *Kalpana*. Among the papers worthy of mention are those entitled "Kuliinisim in Bengal," "Kalidasa and Shakespeare," and "Medical Treatment as Followed by the Aryans.' We trust the little magazine will gradually ingratiate itself into the favor of the Bengali reading public, and attain the success which it so well deserves.

IBID.

It deals on questions social, moral and historical. Its language is simple, terse, unaffected.

INDIAN EMPIRE.

ইহা যে কৃতকার্য্য হইবে তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বঙ্গদর্শন (বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য)

ইহা বিষয়াংশে মূল্যবান্; কিন্তু ইহার মুদ্রামূল্য ১ টাকা মাত্র। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ সুপাঠ্য ও সুরুচির পরিচায়ক।

বান্ধব।

পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। লেখা সরল ও সুপাঠ্য হইতেছে, এবং লেখকদিগের যে কল্পনাশক্তি আছে, মধ্যে মধ্যে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

বামাবোধিনী।

আমরা এত অল্পমূল্যের পত্রিকায় এত বহুমূল্যের প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া যদি আমোদিত না হই তবে কিসে হইব? ঈশ্বরেচ্ছায় কল্পনা দীর্ঘজীবিনী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকুক।

বীণা।

কল্পনা শিক্ষিত সমাজে আদর পাইবার যোগ্য।

সোম প্রকাশ।

গ্রাহকগণের নিকট হইতে এত অল্প পয়সা লইয়া সম্পাদক এতগুলি সরস ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখাইতে পারিয়াছেন দেখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতেছি।

নববিভাকর।

এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানি আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। যে কয়েকটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে সকল গুলিই সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। কল্পনা দীর্ঘজীবিনী হন ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

প্রভাতী।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অবতরণিকা। ...	সম্পাদক	... ১
আর্য্যচিকিৎসা। ...	শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র রায়	... ১০৬, ... ১৬১, ২০৫
কথায় চিঁড়ে ভেজেনা। ...	" কালীপদ ঘোষ এমএবিএল	... ১০
কবিও চিত্রকর। ...	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ২৩, ২৯, ৬১, ৯৪
কুসুম উদ্যানে কুসুম চয়নে।	শ্রীমতী বসুমতী দেবী	... ১১২
চুম্বক রহস্য। ...	সম্পাদক	... ১৬৫
চোখ গেল। ...	সম্পাদক	... ২৪১
টাকা যায় কোথায়? ...	শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মুখোপাপাধ্যায়	২১৪
তটিনী। ...	সম্পাদক	... ২০৮
তোষামোদ দর্শন। ...	সম্পাদক	... ১৯২
দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। ...	সম্পাদক	... ৬৫
নিশ্চল প্রদীপ। ...	সম্পাদক	... ২৬৯
প্রকৃতি বর্ণনায় সেক্সপীয়র ও কালীদাস।	শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২০২, ২৩০
প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।		... ৮৮, ১৮৩
বঙ্গে কুলীনাধিকার। ...	সম্পাদক	... ১৭৭, ১৮৮, ... ২৪১
বঙ্গের বালবিধবা। ...	শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৩
বাঙ্গালার কবিও কাব্য। ...	" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২০৯

সূচীপত্র।

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা।
বিজয়া।	...	সম্পাদক	... ২৫
বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুনরালোচনা।		শ্রীযুক্ত বাবু অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৮
ভারতে ইংরাজী শিক্ষা।	...	সম্পাদক	... ৪
ভারতোন্নতি-বিপ্লব।	...	শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ বসু	... ৭১
ভ্রমর ও কেতকী।	...	শ্রীমতী বসুমতী দেবী	... ১৫৯
মনু ও চাতুর্ব্বর্ণের আশ্রমবিভাগ।		পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ	... ১৩৭
মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি?		শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৪, ৭৯, ১২৬ ১৮৫, ২৫৭
মাকড়সা-স্তোত্র।	...	” যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ১৭৪
মানসমোহিনী।	...	” হীরালাল ঘোষ	... ২২
মোহিনী।	...	পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম,এ	১৫৬
যোগিনীচক্র।	...	শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল ঘোষ	... ৫৬,৮৩,১৮০
শিশির কি পড়ে?	...	সম্পাদক	... ১৩১
সন্তানহীনা রমণী।	...	শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী	... ১৩৫
সরলা।	...	কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়	... ৮৯
সিশিরো (Cicero)।	...	সম্পাদক	... ২২৫, ২৩৩
সুহাসিনী।	...	সম্পাদক	... ১৮,৪২,৪৯, ৯৭,১১৭,১৪৭,১৭০,১৯৫,২১৯,২৬২
স্ত্রীবিপ্লব।	...	পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম,এ	২৫০
হুক্কা।	...	সম্পাদক	... ৭৫

বিজয়া।

আজ বিজয়া। আজ বঙ্গের বিজয়া দশমী। আজ আর সে হাসি আমোদ নাই, সে উৎসব নাই। সে ব্যাকরণপরিশুদ্ধ অমৃত-সংস্কৃত মন্ত্রকলাপ আজ আর শুনা যাইতেছে না, সে নানা বাদ্যসংমিলিত তানলয়শুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি আজ আর গগন মাতাইয়া মন মধু ঢালিয়া দিতেছে না, সে জনতার ভীম কোলাহল ও বাদ্যে প্রতিশব্দিত হইয়া কর্ণপুটহে তেমন করিয়া ভীষণ অথচ নিনাদিত হইতেছে না। সে প্রফুল্লতা আর নাই,—এখন তৎসকলেরই মুখে বিষাদের অঙ্করেখা পরিলক্ষিত হইতেছে। আজ নিস্তব্ধ—গভীর নিস্তব্ধ। নাট্যরঙ্গ পরিসমাপ্ত হইলে নাট্যশালা স্তব্ধ হয় সেইরূপ নীরব ও নিস্তব্ধ। কল্য যে ভবনে ঝাড়লণ্ঠনের বাত্রিকে দিন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, আজ তথায় একটী মাত্র অতিকষ্টে অন্ধকারের বিক্রম সহ্য করিতেছে। সে আলোক ও নির্ব্বাণোন্মুখ। হায়! কেন এমন হইল? কেন এই তিনদিনেই রোহময় সুখোৎসব অবসিত হইল? কৈ সে মূর্ত্তি কোথায়? কোন্ তাহা বিসর্জ্জন দিয়া আসিল? আ মরি মরি! কি সুন্দর রূপ— কি য়ে সর্ব্বসংমিলন! বামে বীরচূড়ামণি কার্ম্মুকহস্ত সুরসেনানী বামেতরে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা চতুর্ব্বেদলেখক গণপতি; উভয়পার্শ্বে প্রসূতী লক্ষ্মীদেবী ও বিদ্যাবিনোদিনী বীণাপাণি ভারতী। মা স্বয়ং অসুরমর্দ্দিনী। আ মরি মরি! এমন আর আছে কি? এমন এমন অন্তর্ভেদী, এমন নাস্তিকঘাতী মূর্ত্তি আর আছে কি? এ কে গড়িল?— মানুষে গড়িয়াছে? না, মনুষ্যের ইহা অসাধ্য। চনানৈপুণ্য কার? এমন সর্ব্বব্যাপিনী কল্পনাশক্তি কার সম্ভবে? শল্পীবর! তুমি যেই হও, এমন মূর্ত্তি গড়িলে তো আবার তাহা কেন? তুমি গড়িয়াছিলে কি কেবল আপনার সৃষ্টিকৌশল দেখাই-

বার জন্য ? যদি তাহাই বাসনা ছিল, যদি আমরা দেখিতে না এ মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিবার অভিলাষ ছিল ; তবে কেন ইহা আ চক্ষে ধরিলে ? কেন অভাগা বাঙ্গালীদিগকে বৎসরান্তে তিনদি উৎসবে মাতাইয়া গভীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিলে ? আলোকে অন্ধকার যে বড় তীব্র, বড় ভয়ানক, বড় যন্ত্রণাপ্রদ !

কিন্তু না, তোমার দোষ নাই। এ জগতে সকলই নিয়তির ত এ বিশ্বমণ্ডলের যদি কেহ নিয়ন্তা থাকেন তো তিনিও নিয়তির নহিলে আলোক অন্ধকার কেন ? সুখ দুঃখ কেন ? হাসি কান্না এত প্রভেদ, এত বৈষম্য, এত বৈপরীত্য কেন ? নিয়তির না অদৃষ্ট অর্থে মাংসাস্থিবিশিষ্ট কপাল নহে অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জি বুঝায় না— সে তো মূর্খের অর্ব্বাচীনতা মাত্র। ন দৃষ্ট অদৃষ্ট। যা মানের অগোচর, যাহা ভবিষ্যৎগর্ভনিহিত তাহারই নাম অদৃষ্ট কার্য্যে, প্রতিকাণ্ডে, এ বিশ্বব্যাপারের প্রতি নিয়মে অদৃষ্টের স কতা। কে বলিতে পারে পরমুহূর্ত্ত তাহার জন্য কি ফল প্রসব যে অদৃষ্ট মানে না সে নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড : সে অনায়াসে ই ইতে পারে। তাই বলিয়া লক্ষ্মণ সেন বা ওয়াজিদ্ আলি সাহ পাত্র নহেন। যতক্ষণ না অদৃষ্ট-ফল উপস্থিত হইতেছে ততক্ষ প্রতিবিধান অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু— কিন্তু অদৃষ্ট একবার আসিলে ফিরিবার পন্থা নাই ? দিন যায় আবার আসে, সূর্য্য অস্তগত হয় উদয় হয়, নক্ষত্র ডুবে আবার ভাসিয়া উঠে, নদীর জলে ভাঁটা প জোয়ার খেলিতে থাকে, কুসুম শুখাইয়া যায়— ঝরিয়া পড়ে হাসিতে থাকে। তবে এ অদৃষ্ট কি ফিরিবার নয় ? আর কি ত পর আলোক হাসিবে না ? আর কি সকলের মুখ তেমন হাসি তেমন প্রফুল্লতামাখা দেখিতে পাইব না ? বঙ্গে কি আর সুখে পঞ্চমী ফিরিয়া আসিবে না ?

আর, ভারত ! কবিকুঞ্জ, সাহিত্যাগার, বেদমাতা, বীর-ধাত্রি তোমার কি বিজয়া দশমীর পর আর কখন সুখের সপ্তমী দেখা এ বিজয়ার কি শেষ নাই— সীমা নাই— অন্ত নাই ? কেবল

[নের জন্য তোমার এত উৎসব, এত সমারোহ, এত ধুম ধাম ? হায় ! সে
মস্ত কোথায় ? কোথায় গেল ?

. সে ধর্ম্ম— যে ধর্ম্মের করস্পর্শে এক দিন সমস্ত আর্য্যহৃদয় পরস্পর
রে তারে বাজিয়া উঠিত ; পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব একাকী শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর
নে বসিয়া যে ধর্ম্মের কঠোর সাধনায় একদিন শরীর ঢালিয়া দিয়া-
ল ; রাজভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, মায়া মমতা বিসর্জ্জন করিয়া ভারতের
মান্ত হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত শাক্যসিংহ একদিন যে ধর্ম্মের গাথা উন্মত্ত-
াবে গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; যে ধর্ম্মের ভারে নদীয়া একদিন টলমল
রিত— সেই দেবগ্রাহ্য সনাতনধর্ম্ম কোথায় ? সে বীরত্ব— যে বীরত্ব-
ল একদিন অষ্ট দশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত করিয়াছিল ;
বীরত্ব-বহ্নি রাণা প্রতাপ একদিন রাজপুতহৃদয়ে সন্ধুক্ষিত করিয়া তাবৎ
র্য্যাবর্ত্ত বিধূমিত করিয়াছিলেন ; যাহা দেখিয়া একদিন দিগ্বিজয়ী
কন্দর সার বীরহৃদয় ও চমকিত হইয়াছিল— সে অসাধারণ অমানুষিক
রত্ব কোথায় ? সে গভীর— সে অভেদ্য— সে কূট মন্ত্রিত্ব কোথায় ?
স্থবির সেই গম্ভীর উপদেশ, কণিকের সেই কৌশলময়ী রাজনীতি,
ণক্যের সেই জটিল মন্ত্রণাজাল— সে সমস্ত কোথায় ? সেই ন্যায়, সেই
নি, সেই বেদ— গ্রীশ্ বল, রোম বল, মিসর বল যাহা দেখিয়া এক-
ন সকলে আশ্চর্য্যবোধে অবাক্ হইয়াছিল, বংশপরম্পরায় যাহার অনু-
রণ প্রাণপণ করিতেছে অথচ পারিয়া উঠিতেছে না— সে সমস্ত কোথায় ?
রামায়ণ, সে মহাভারত, সে শকুন্তলা, সে নৈষধ-- ভাষাবিদ্
শষ যত্নে ভাষান্তরিত করিয়া আপনার কীর্ত্তিস্তম্ভ মনে করেন
সমস্ত দিগন্তবিশ্রুত, বিশ্বপ্লাবী, প্রশস্ততম গভীর সাহিত্য
— কোথায়, সে সব কোথায় ? কাহাকে বলিব, কে বলিয়া
সব কোথায় ? একমাত্র সমীরণ মনোদুঃখে ব্যথিতস্বরে বলিল
ব কোথায় !” সেই স্বর লুকিয়া লুকিয়া মাথার উপর আকাশমণ্ডল
রিয়া প্রতিধ্বনি বলিতে লাগিল— ‘হায় ! সে সব কোথায় !”
সব আর নাই। সে ধর্ম্ম নাই, সে ধার্ম্মিকতা নাই।— উপধর্ম্মের
দ্রবে ভারত এখন উৎপীড়িত। সে বীরত্ব নাই, সে ধনুর্ব্বাণ নাই,

সে গদা-প্রহরণ আর নাই।— পরপাদুকাসহিষ্ণুতাই এখন বীরত্বের পরা কাষ্ঠা। সে সাহিত্য, সে শাস্ত্রালাপ সে সব আর নাই। যে সাহিত্য পড়িয় অন্য দেশ আপনাকে সভ্য বলিয়া অভিমান করে সে সব সাহিত্য এখ লুপ্ত। দুঃখের কথা কি বলিব, ভারতের বহুদিনকথিত কথা সকল এখ ভাষান্তরিত হইয়া ভারতেই বহুমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। হরি হরি হরি!— জগতের আদি গুরু এখন শিষ্যানুশিষ্যের নিকট শিক্ষার পাত্র! সভ্যতায় সেই মৌলিক সংস্কারক এখন সামান্য বিষয়ের জন্যও পরপ্রত্যাশী! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে ভারত কোহিনূর মণির গর্ভধারিণী তাহারি অধিবাসী-গণ এখন জঠরজ্বালায় পরের গোলাম!!

কিন্তু, কেন এমন হইল? জগদীশ!— প্রভো! কেন এমন করিলে? তিনদিনমাত্র আলোকে রাখিয়াই আবার কেন অভাগাদিগকে ঘনঘোর অন্ধ-কারে নিক্ষিপ্ত করিলে? কে তোমায় এমন প্রতীমা গড়িতে বলিয়াছিল? গড়িলে তো তাহা এমন করিয়া সাজাইলে কেন? সাজাইলে তো আবার সেই বহুআয়াসপ্রসূত স্বর্ণপ্রতীমা অকালে চূর্ণ করিয়া ফেলিলে কেন? লীলাময়! এ তোমার কেমন লীলা!

কৈ, সে সোণার প্রতীমা কৈ? ভারতমাতা কৈ? কোথা গেলি মা? আয়— একবার তেমনি করিয়া সকলগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভারতভুবনে আয় মা। তুমি যে মা ভারতমাতা— ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতই যে তোমার লীলাচত্বর। একবার তেমনি ভুবনমোহিনী রূপে করিয়া আসিয়া দাঁড়া মা। কেন তোর এত নিষ্ঠুর পরাণি? মাত্র আলো করিয়া কেন এমন চপলার মত অন্তর্হিত হ'লি?— বার আয় মা। আবার সকলেরি তেমনি মুখভরা হাসি দেখি। তেমনি শ্রবণমধুর শব্দপরম্পরায় কর্ণ ভরিয়া যাউক, আর এক ললিত ভৈরব বেহাগখাম্বাজ তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া হৃদয়ের প্রবেশ করুক। আর কি মা আসিবি না?— মা বুঝি আর আ আমরাই নিজহস্তে তাঁহাকে অকালে বিসর্জ্জন দিয়াছি, মা আ আসিবেনা। জয়চাঁদ— ভারতকলঙ্ক ক্ষত্রিয়গ্লানি জয়চাঁদ! কেন পথের দারুণ প্রান্তরে তোর সমাধি হইয়াছিল। আর, চিলেন

কেননা তোকে ভাগ্যপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই সিন্ধুনদ দূরে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহা হইলে বুঝি এত কষ্ট হইত না, বুঝি তাহা হইলে আর এ দুঃখের নিশা পোহাইতে হইত না। হায়, এযে ভয়ানক অধঃপতন। ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া পরস্পর জমাট বাঁধিয়া ক্রমশই যে ঘনীভূত হইতেছে। এই ঘোর অন্ধকারে গুটীকতক মাটীর প্রদীপ মাত্র কি করিবে? তাহারা তো তাহে আবার ক্ষীণায়ত ও বিদেশীয় তৈলপুষ্ট। কি হইবে? হায়! বিজয়ার দিনেই যদি এত অন্ধকার, এত বিষাদ, এত মর্ম্মবেদনা এখনও তো কতদিন আছে তাহার জন্য কি হইবে?

তাই বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় হস্তোপরি কপোল সংরক্ষিত করিয়া গৃহে বসিয়া ভাবনা কর্ত্তব্য নয়। যখন বিজয়া হইয়াছে, তখন আইস সকলে বিজয়ার কার্য্য করি। বঙ্গের প্রতিগ্রামে, প্রতিগৃহে, প্রতি পরিবারে বিজয়ার দিনে যে চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, আইস সকলে আজ হইতে তাহা অবলম্বন করি। আইস, সকলে জাতিভেদ ভুলিয়া, আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বার্থবিসর্জ্জন করিয়া, আত্মপর বিস্মৃত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি প্ররোচন-বীজ-স্বরূপ সিদ্ধি ভক্ষণ করিয়া সকলে মিলিয়া— পণ্ডিতে মূর্খে, ধনীদরিদ্রে, স্ত্রীপুরুষে, শৈবে শাক্তে, আর্য্যে অনার্য্যে, উচ্চে নীচে সকলে মিলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করি। আইস, পরস্পর মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব সঞ্জাত হয় এখন হইতে তাহার প্রতিবিধান করি। হিমালয় হইতে কুমারিকা অবধি বিংশতি কোটী লোকের বাস, কিছুই না হয়— সকলে মিলিয়া কাঁদিলেও দুঃখের অনেক লাঘব হইবে।

—000—

কবি ও চিত্রকর।

—000—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথমতঃ জানা আবশ্যক, আমরা সাধারণ চক্ষে কোন বস্তু যে রূপ ভাবে দেখি কবি তাঁহার চক্ষে সেই বস্তু সেরূপ ভাবে দেখেন না। অতি

প্রত্যূষে আমরা সরোবরে গিয়া দেখিলাম কুমুদ গুলি এক একটি করিয়া মুদিত হইতেছে, তীরস্থ বৃক্ষের উপর নানাবিধ পক্ষী নানাবিধ রবে কোলাহল করিতেছে, বিন্দু বিন্দু করিয়া পত্রান্ত হইতে প্রভাতশিশির টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সে স্থলে সেই সময়ে একজন কবি গিয়া দেখিলেন—

"নিশাতুষারৈরনবাম্বুকল্পৈঃ পত্রান্তপর্য্যাগতদশ্রুবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং জীবতকর্দ্দিনাদৌ॥"

ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে কবির চক্ষু সাধারণ চক্ষু হইতে কি রূপ নূতন সামগ্রীতে সংগঠিত। কিন্তু একজন চিত্রকরের অন্য বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলে ও তাঁহার চক্ষু সাধারণ চক্ষু হইতে ভিন্ন নয়। কবির ন্যায় তিনি মুদিত কুমুদে বিরহকাতরতা দেখিতে পান না, পত্রকে চক্ষু করিয়া শিশির বিন্দুকে অশ্রুজল করিতে ও তাঁহার ক্ষমতা নাই।

কবি সকল শিক্ষার গুরু, কবিই সমাজের প্রধান সংস্কারক। ধর্ম্মোপদেশক আমাদিগকে তীব্রস্বরে শিক্ষা দিতেছেন "পাপ কর্ম্ম করিও না।" কবি সে পথ অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেন না, তিনি কাহাকে পাপকর্ম্ম করিতে বলেন না বা কাহাকেও সে কর্ম্ম করিতে নিবারণ করেন না; কিন্তু কৌশলে একটি পাপের ভয়ানক চিত্র আনিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সে চিত্র যে দেখে সেই পাপের বিষময় পরিণাম দেখিয়া ভয়ে আকুল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এ পাপ পৃথিবীতে ধর্ম্মোপদেশকের শিক্ষায় কয়জন পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে? কিন্তু কবির কি সুন্দর উপদেশ! কি কৌশলময়ী শিক্ষা! ইহাতে ধর্ম্মোপদেশকের সে তীব্রতা নাই—সে কঠোরতা নাই। মুগ্ধকর, প্রীতিপ্রদ, অনায়াসলভ্য; অথচ অপেক্ষাকৃত অধিকতর ফলপ্রদ। চিত্রকরের নিকট হইতেও আমরা অনেক শিক্ষা পাইয়া থাকি। সরোজিনী নাটকের শেষ অঙ্কের একটি চিত্র সম্প্রতি আর্টস্কুল হইতে বাহির হইয়াছে—সম্মুখে অগুরু চন্দনসজ্জিত চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, দুর্বৃত্ত মুসলমান আলাউদ্দিনকে সতীত্বনাশে উদ্যত দেখিয়া অসহায়া ক্ষত্রিয়কুলবালা সরোজিনী সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতেছেন, আর চিতার সেই গগণস্পর্শী শিখা যেন

তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছে—অতি সুন্দর। এই লোম-হর্ষণ চিত্র দেখিলে ঘোর নারকী ও সতীত্বের স্বর্গীয় মহিমায় স্তব্ধ হয়। কিন্তু নাটককার সেই স্থানটী যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা আরো সুন্দর, আরো মনোহর। তাহার কারণ কি?—কবি যেরূপ বাহিরের আকৃতি ও অন্তরের মনোবৃত্তি সকল দুই সমভাবে চিত্র করিতে সক্ষম চিত্রকর ততদূর নিপুণ নন। মহাকবি সেক্সপিয়ার ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে ম্যাক্‌বেথের যে পাপ চিত্র দেখাইয়াছেন একজন সুনিপুণ চিত্রকর শত তুলি ঘসিলেও তাহার তৎকালীন মনোবৃত্তি সকল ততসুন্দর চিত্রিত করিতে সমর্থ হইবেন না।

একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে কবি ও চিত্রকর উভয়কেই প্রথমে সেই চিত্র এরূপ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যেন তাহা সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উভয় চিত্রের প্রভেদ কি? মহাকবি কালিদাস ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধকালে রঘুকে কেমন সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন!—

"স এবমুক্ত্বা মঘবন্তমুন্মুখঃ করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্।
অতিষ্ঠদালীঢবিশেষশোভিনা বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়ম্বিতেশ্বরঃ॥"

বামপদ আকুঞ্চিত আর দক্ষিণপদ অগ্রসর করিয়া ঊর্দ্ধমুখে রঘুর এরূপ বিরোচিত অবস্থান যদি একজন চিত্রকরকে চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কত উপকরণের আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তিনি দুই চারি কথায় তাহা সম্পন্ন করিলেন। ইতালীয় চিত্রকর রাফেল যে জগদ্বিখ্যাত এডাম্ ও ইভের চিত্র চিত্রিত করিয়া পৃথিবী মধ্যে একজন অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, কবিবর মিল্‌টন তাঁহার 'প্যারাডাইস্‌লষ্টে" সেই চিত্র কত সহজে, কত অল্পে সুচিত্রিত করিয়াছেন! কিন্তু চিত্রকরের চিত্রের ন্যায় কবির চিত্র আমরা সাধারণ চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহা আমরা মানসচক্ষে দেখিয়া থাকি। এই জন্যই কবির চিত্র চিত্রকরের চিত্রের ন্যায় তত আশুপ্রোজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয় না। চিত্রকরের চিত্র আমরা সম্মুখে থাকিলেই দেখিতে পাই, কিন্তু কবির চিত্র আমাদিগকে ভাবিয়া চিন্তিয়া লইতে হয়।

আমরা পূর্ব্বে যে সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছি তাহা দুই প্রকার—বস্তুগত ও অবস্থাগত। বস্তুগত সৌন্দর্য্যে বস্তুর আকৃতি ও বর্ণ প্রভৃতি বর্ণিত। কবি লিখিলেন —

"নীলবর্ণ—শোভাপূর্ণ—বিপুলশরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি,
শত শত অবধ্যানী কত শোভাময়
চারিদিকে শোভে কত শ্যামল বিটপে।"

এই বস্তুগত সৌন্দর্য্য আর্টগ্যালারি বা তদ্রূপ কোন চিত্রশালায় চিত্রফলকে অঙ্কিত দেখিলে যত সুন্দর যত হৃদয়গ্রাহী হইবে, কবির চিত্রে তাহা হইতে পারে না। নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিয়া কখন২ ঐরূপ চিত্রপট দেখিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়, যেন বাস্তবিক ঐ সমস্ত বস্তু আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চিত্রকর যে পরিমাণে তাঁহার চিত্রে সৃষ্টির যথাযথ অনুকরণ করিতে সক্ষম হইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার চিত্র তত উৎকৃষ্ট হইবে। অনুকরণই চিত্রকরের প্রধান সহায়। তিনি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক চিত্রের এক একটী আদর্শ আবশ্যক। কবি অনেক সময়ে সৃষ্টির অনুকরণ করেন বটে, কিন্তু তাহা অনুকরণের উদ্দেশে নয়, সাদৃশ্যজনিত সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নিমিত্ত। কবি কেবল অনুকরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি তাঁহার কল্পনাশক্তির প্রভাবে সৃষ্টির উপাদান সমস্ত লইয়া নূতন সৃষ্টি সৃজন করেন। সুতরাং কাব্যসাধারণকে আমরা অনুকরণ সংজ্ঞা দিতে পারি না। অনুকরণ দ্বারা কখন কাব্য হইতে পারে না। সৃষ্টি যেমন এক সৃষ্টি কাব্য তেমনি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। যে কবির কাব্যে কিছুই নূতনত্ব নাই কেবল অনুকরণ মাত্র তাঁহাকে আমরা প্রকৃত কবি বলিয়া গণ্য করি না। আধুনিক বঙ্গদেশের অনেক নূতন কবি নূতন সৌন্দর্য্য কিছুই দেখাইতে পারেন না, তাঁহারা যখনই প্রভাত কিম্বা সন্ধ্যা বর্ণনা করিতে যান তখনই কুমুদিনী ও কমলিনীর বিরহে কাঁদিয়া আকুল হন। এইরূপে তাঁহারা বিরহিণী কুমুদিনী ও কমলিনীকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা

সকল বর্ণনা শতশত বার পাঠ করিয়াছি, ইহাতে কিছুই নূতনত্ব নাই; সুতরাং এই সকল লেখককে আমরা কবি বলিতে পারি না। আমাদের অপকৃষ্ট নাটক লেখকেরা ও তাঁহাদের নাটকের ছাই ভস্মের মধ্যে 'প্রাণনাথ' 'প্রিয়তমে' 'হায় হায়' বড় জোর 'মাতর্বসুন্ধরে তুমি দ্বিধা হও' ইত্যাদি লিখিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এ সমস্ত বর্ণনায় কিছুই নূতনত্ব নাই, তাঁহাদিগের সেই সকল খেদোক্তি পড়িয়া আমাদের হাসি পায়। কিন্তু চিত্রকরের চিত্র যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতে নূতনত্ব না থাকিলেও আমরা তাঁহার চিত্র দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকি। তাহার কারণ সে চিত্রে সাদৃশ্য সৌন্দর্য্য আছে।

অবয়বগত সৌন্দর্য্যের মধ্যে কবির কল্পনার সৌন্দর্য্যই প্রধান। পৃথিবীতে যে সকল সৌন্দর্য্য আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না, কিন্তু সম্ভব বলিয়া দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি ও দেখিয়া মোহিত হই, কবি তাঁহার কল্পনা-প্রভাবে আমাদিগকে সেই সকল সৌন্দর্য্য দেখান। বাল্মীকির সীতা, পুরাণের হরিশ্চন্দ্র, সেক্সপীয়রের ডেসডিমোনা ও লীয়ার এই সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সীতা ও ডেসডিমোনার প্রেম এত পবিত্র যে দুরবস্থা, যন্ত্রণা, বিরহ, পরিত্যাগ, অপবাদ এবং প্রাণনাশেও তাহা অটল রহিল,—কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। আমরা পরমের এ সুন্দর চিত্র দেখিতে ভালবাসি এবং দেখিলে মুগ্ধ হই ও আমাদের হৃদয় অহ্লাদে নাচিয়া উঠে। কিন্তু, সীতা ও ডেসডিমোনার ন্যায় সুন্দর কুসুম কবির কাব্যোদ্যানে ভিন্ন পৃথিবীতে আমরা বড় দেখিতে পাই না। হরিশ্চন্দ্র ও লীয়ার পরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন। এ চিত্রও অতি সুন্দর; কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ চরিত্রের কয়জন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়? কবি এই সমস্ত চিত্র করিয়া সমাজকে নূতন নীতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। চিত্রকর এই সকল চিত্র চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কবির চিত্রকে আদর্শ করিয়া চিত্র করিতে হইবে, নতুবা তাহার চিত্রের সৌন্দর্য্য কেহ অনুভব করিতে পারিবে না। তাঁহার কল্পনাশক্তি নাই, সুতরাং তিনি অনুকরণ ভিন্ন কিছুই চিত্র করিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিগম্য জগৎ কল্পনার বিস্তৃত রাজ্যের তুলনায় অতি সামান্য। চিন্তাশক্তি যে ভাবময় শৈলে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ইন্দ্রিয়গণ সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলেও সেই দুরারোহ স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। বাহিরে—এই অনন্তবিস্তৃত পরমাণুসম্ভূত জড় জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে; দেহাভ্যন্তরে—সুকৌশলময় যন্ত্রবৎ এই হৃদয় ঘড়ির মত অবিরত চলিতেছে: মধ্যদেশে—শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি উৎপাদনের উপায় স্বরূপ উপন্যস্ত রহিয়াছে, এবং অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের সম্মিলনে নিয়তঃ ব্যস্ত থাকিয়া চৈতন্যের বিকাশ ও চিন্তাশক্তির প্রস্ফুরণ করতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের অপার মহিমা উপলব্ধি করাইতেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যে সকল তত্ত্বের সমাবেশ হয় জ্ঞানশক্তি সেই সকল তত্ত্বের সাহায্যে তদপেক্ষা মহত্তর ও বৃহত্তর জগৎ সমূহে বিচরণ করিবার অধিকার প্রদান করে। কিন্তু, ইন্দ্রিয়গণ যেখানে লব্ধ-প্রসর হয় না, জ্ঞান যেখানে অনুভূতিতে ডুবিয়া যায় সেখানে জ্ঞানের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কল্পনা ইন্দ্রিয়গণের অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালীসমষ্টি একত্রীকৃত করিয়া নূতন সত্যসমূহ আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং তন্নিহিত তত্ত্বসকল সহজে হৃদয়ঙ্গম করায়। যে কল্পনার ক্রীড়া আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের অভিলাষ প্রদান করে, যীশুকে ঈশ্বরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করায়, এবং শুদ্ধ অন্ধবিশ্বাসের উপর উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ আপ্যায়িত করিবার ভাণ করে—আমি সে কল্পনার কথা কহিতেছি না। যে মানসিক প্রভাব ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতার বহুউর্দ্ধে অবস্থানকারী তত্ত্ব সকলের উপলব্ধি বিষয়ে সহায়তা করে—একক গ্রহণ করিলে অনুভূতিতে আসে না, অথচ সমষ্টিতে একটী সত্যের আশ্রয়-স্থল হয়, সেই সমস্ত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া মনোদর্পণে প্রতিফলিত করায়;—কবিহৃদয়ের মূল প্রস্রবণ, বিজ্ঞান

শাস্ত্রের প্রধান পথপ্রদর্শক সেই কল্পনার কথা কহিতেছি। নিউটন যাহার কৃপাব্যতীত বৃন্তচ্যুত ফলের পতন হইতে আকর্ষণী শক্তির উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না, কালিদাস শকুন্তলার অবতারণা করিয়া মানবহৃদয়ের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ উদ্ভিন্ন করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হইতেন না এবং কলম্বস্ ও নূতন এক মহাদেশের অস্তিত্ব লোকলোচনের পথবর্ত্তীকরণে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না—সত্যের সেই আশ্রয় স্বরূপ, তত্ত্বনিরূপণের সেই প্রাণস্বরূপ এবং জ্ঞানের সেই আধার স্বরূপ কল্পনার কথা উল্লেখ করিতেছি। আইস দেখি, একবার এই স্বার্থসঙ্কুল সংসারে এই চিন্তাশক্তিহীন সুতরাং পশুবৎ এই বাঙ্গালীজীবনে ক্ষণকালের জন্য স্বার্থশূন্য ও চিন্তাশীল হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক... ই সহায়তায় জীবিতের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রধান তত্ত্ব উদ্ভিন্ন করিতে যত্নবান হই। আইস দেখি একবার নির্ব্বিঘ্ন হৃদয়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়া দেখি—আমরা কি?—জীবন কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি?

দক্ষিণে চাহিয়া দেখ, অতলস্পর্শী ঐ বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে—ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণ নিকর বিতরণ করিয়া লবণাম্বু হইতে বাষ্পরাশি উদ্ভূত করিতেছেন। বামে, হিমাচল তুষারমণ্ডিত মস্তকে বিরাজমান। ...ই ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—সমস্তই পরমাণু-সমষ্টি মাত্র লইয়া প্রকৃতির খেলাধূলা। রবিরশ্মিসম্পাতে সাগর হইতে যে বাষ্পরাশি উত্থিত হইল, বায়ুবশে অভ্রংলিহ হিমালয়ের শীর্ষদেশে নীত হইয়া উহাই আবার হিমানীতে পরিণত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে একটী কার্য্যকারক ক্ষমতার আবির্ভাব—জলে ও বাষ্পে তাহা অন্তর্নিহিত ছিল, প্রাকৃত ধর্ম্মবশে তুষারের আকৃতি ও গঠনে প্রস্ফুট হইয়াছে। জল, বাষ্প ও তুষার একই পদার্থ; মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। তুষার অন্য কিছুই নহে, অন্য কেহ আসিয়া তাহা গড়িয়া যায় নাই।

আর, এই যে বালির মত একটী ক্ষুদ্র বটবৃক্ষবীজ ভূমধ্যে উপ্ত হইয়াছে, ঐ দেখ সূর্য্যের উত্তাপ ও মৃত্তিকার রস উহার বহিরাবরণ উদ্ভিন্ন করিল, বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তদভ্যন্তরশয়ান বৃক্ষাঙ্কুরের আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিল। বীজের ভ্রূণ (Embryo) মধ্যে মূল সম্মুখে বৰ্দ্ধিত হইল

এবং বহির্দ্দেশে আগমন পূর্ব্বক মৃৎরস পান ও বায়ুসেবন করতঃ বীজপত্রে তাহা প্রেরণ করিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র কাণ্ড মস্তক উত্তোলন করিয়া আলোকে আসিয়া দেখা দিল, এক একটী করিয়া তন্তু সকল (woody fibres) প্রস্তুত হইতে লাগিল, স্বল্পপ্রসর গর্ভগুলি (cells) দেখা দিতে লাগিল, ক্ষুদ্র বৃক্ষ শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিতায়াতন হইতে লাগিল। কালে, প্রকাণ্ডকাণ্ডবান্ বহুদূরপ্রসারিত শতহস্তপরিমিত এক মহান্ বটবৃক্ষ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া তলস্থ ভূমিখণ্ড ছাইয়া ফেলিল। এখন বল দেখি, এই ক্ষুদ্র বীজ এবং এই বৃক্ষ ও এতন্মধ্যবর্ত্তী যোগাযোগ সমূহ কি সমুদয়ই পরমাণুসমষ্টির কার্য্য নহে?— পদার্থ নহে? কেহ উত্তরচ্ছলে বলিতে পারেন, এ পদার্থে প্রাণ সঞ্চার করিল কে? আমি বলি সে কথা এখানে জিজ্ঞাস্য নহে। ইহাতে পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু আছে কি? যদি থাকে তো তাহা কি এবং তাহা কোথায়? বৃক্ষ হইবার পূর্ব্বে তাহা ছিল কোথায়? আর সেই বৃক্ষ যখন শতধা বিভাজিত হইয়া অগ্নির সেবায় প্রদত্ত হইবে তখনি বা তাহা রহিবে কোথায়? তাই বলিতেছিলাম, সমস্তই পরমাণু সমষ্টি লইয়া প্রকৃতির খেলা ধূলা।

শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান দ্বারা নিরাকরণ করিয়াছেন যে প্রথমে খনিজ পদার্থ সকল যে প্রণালীতে জন্মে গর্ভসঞ্চারের পর অবিকল সেই প্রণালীতে অণুঅণু সম্মিলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে একটী কোষ হয়। সেইকোষ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তু সকল সংযুক্ত থাকে ও ক্রমে উদ্ভিদ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। আজি গর্ভসঞ্চারের পর সপ্তাহকাল অতীত হইয়াছে ঐ চাহিয়া দেখ ভাবী সন্তানের প্রথম রেখা পাত হইল। স্বল্প কালেই দেখিতে পাইবে উহাই আবার নিকৃষ্ট জীবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে তিল তিল করিয়া অণু আসিয়া অণুতে মিলিত হইতেছে। মাতৃকুক্ষি মধ্যে ভুক্ত সামগ্রী যেমন অস্থি, মাংস, মজ্জায় পরিণত হইতেছে অমনি তিলে তিলে আসিয়া ঐ সকল পদার্থ উহার পুষ্টিসাধন করিতেছে। নয় মাসের পর দেখিবে পশু শরীর হইতে ক্রম পরিণতিতে দিব্য কলেবর নরশিশুর আকার প্রাপ্ত হইয়া ঐ জরায়ুজজীব মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবে। এখন একবার ভাবি

দেখ দেখি এই নয় মাসে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সমূহ সংঘটিত হইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থান রচনাতে কি বিচিত্র নৈপুণ্য -কি বোধাতীত কৌশলই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে! ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে এমন পশুহৃদয়ের অসদ্ভাব নাই যাহারা এ সকল তত্ত্ব জানিতে অনিচ্ছুক নয়। যে গূঢ় রহস্য সমূহ আজি অষ্টাদশ শতাব্দীর গবেষণার ফল—যাহা জানিবার জন্য অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন মনিষীগণ অনাহারে অনিদ্রায় নির্জ্জনে বসিয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়াছেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদিগের এমন লোকও অসদ্ভাব নাই যাহারা এই সকল প্রকৃত তথ্য গ্রহণে সম্পূর্ণ উদাসীন নন। এই যে হস্ত মসী-মর্দ্দনে সুপটু,— এই যে লম্বোদর সভাব শোভা বর্দ্ধনে অগ্রসর, এই যে মস্তক পরপাদুকা-ঘাতে অক্লিষ্ট -এ সকল কি রূপে গঠিত হইয়াছে— জ্ঞান, চিন্তাশক্তি থাকিতে, যে তাহা জানিতে না চায় তাহাকে পশু ভিন্ন আর কি বলিব? ইউরোপে ষষ্টি বর্ষের বৃদ্ধ আজি দম্ভ সহকারে বলিতেছেন যে, যদি আর ষাট বৎসর আমি জীবিত থাকি তবে মনুষ্যশরীরে প্রাণ সঞ্চার করিব। আর এখানে পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় উন্নতিশীল যুবা শরীর কি ধাতুতে গঠিত, কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহাও অজ্ঞাত!! যাউক।— কিন্তু ঐ যে বটবৃক্ষবীজ, উহা যেমন অচেতন জড় পদার্থের সংমিশ্রণে মহান্ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে ঐ দেখ মনুষ্যও সেই রূপ অচেতন জড় পদার্থ হইতে ক্রম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেহ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। সেই অচেতন জড় পদার্থই দ্রবীভূত পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য শরীরে স্পন্দন, মনন, ও চিন্তনাদি সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল গূঢ় রহস্য আমাদিগের অগোচর থাকিলে ও কি এক্ষণে মাত্র পরমাণুসমষ্টির কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না?—তাহাই বলিতে ছিলাম, যে দিকে নয়ন ফিরাও দেখিতে পাইবে, সমস্তই পরমাণু সমষ্টি মাত্র লইয়া প্রকৃতির খেলা ধুলা।

ক্রমশঃ

—— ০০০ ——

বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুনরালোচনা।

লেখক যথার্থই বলিয়াছেন— "ভারতের মহিমা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।" বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে— মিশর যখন নীলনদের মৃদু মধুর কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে শৈশবদোলায় ক্রীড়া করিত, গ্রীস ও রোম যখন ভূমধ্যসাগরের অতলগর্ভে শায়িত ছিল, আমেরিকার নাম ও যখন কেহ জানিত না— সেই সময় বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের কিরূপ গভীর আলোচনা ছিল আজ উনবিংশ শতাব্দীতে বসিয়া সে বিষয় স্থির নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর ধারণা [illegible] পারে, তৎকালে বিজ্ঞানের যে প্রকার আলোচনা হওয়া সম্ভব [illegible] যে তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তদ্বিষয়ে [illegible] সন্দেহ মাত্র নাই। বিজ্ঞানদীপ্ত ইউরোপ কেন সহস্র গর্ব্ব করুন না, আমেরিকা কেন নির্জ্জনে বসিয়া সহস্র [illegible] মস্তিষ্ক আলোড়িত করুন না, নিউটনের [illegible] [illegible] অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়ুন না, দাম্ভিক ইংরাজ [illegible] কেন বলুন না—

> "Long had the mind of man with curious art,
> Search'd nature's wondrous plan thro' ev'ry part;
> Measured each track of ocean, earth, and sky,
> And number'd all the rolling orbs on high:
> Yet still, so learn'd herself she little knew,
> Till Locke's unerring pen the portrait drew."

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সকলই হিন্দুদিগের পুনঃসংস্করণ মাত্র। মাত্র বিজ্ঞানের জন্য বলিতেছি না, পাশ্চাত্য-শিক্ষক গ্রীসই হউন আর তাঁহার গুরু আরবই হউন সকলকেই একদিন অঙ্কশাস্ত্রের নিমিত্ত ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বীজগণিত এবং রেখাগণিত এইরূপ

হইতেই আরবে রপ্তানি হইয়াছিল। এক জ্যোতিষে আর্য্যগণ অদ্বিতীয়। চিকিৎসা শাস্ত্রেও কম নয়, তাঁহারা জানিতেন কোন্ উদ্ভিদে কোন্ গুণ ধারণ করে; জানিতেন শরীরের কোথায় কি কি যন্ত্র অবস্থিতি করে, কোথা হইতে কোন্ শিরা আরম্ভ হইয়াছে, ধমনীতে রক্ত কিরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। অসাধারণ মনঃসংযোগ, দীর্ঘব্যাপিনী গবেষণা ও প্রগাঢ় চিন্তার উৎকৃষ্টতম ফল— নিদান। আর্য্যগণের জ্ঞানের প্রদীপ কেমন জ্বলিয়াছিল রসায়ন. শাস্ত্রেও তাহার অনেক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। তবে, আর্য্যগণ যে সমস্ত পদার্থকে রূঢ়ভূত মনে করিতেন অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সেই গুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদিগের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন [illegible] পঞ্চভূতের স্থলে এক্ষণে [illegible] [illegible] ভূতের আবিষ্কার হইয়া[illegible]; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে [illegible] [illegible] হইবে— সমস্তই সেই হিন্[illegible]র পুনঃসংস্করণ মাত্র।

[illegible], পূর্ব্বের দোহাই দিলে [illegible] না। যাহা হইয়া গিয়াছে, আর হইবার নয় অথবা হইবে কি [illegible] না; যাহা অতীতের অঙ্কগর্ভ-নিহিত— সে বিষয় বলিয়া আর আস্ফালন করিলে কি হইবে? পুরাকালের কথা অনেকে অনেক বলিয়াছেন এখনও বলিবার অনেক আছে; কিন্তু সে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিবার জন্য আজ আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। যাহা হইতেছে, যাহা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষীভূত, যাহাদ্বারা ভবিষ্যৎ কল্পিত হইতে পারে সে বিষয়েই যাহা কিছু বলা আমাদিগের অভিপ্রেত।

জাতিগত বা ব্যক্তিগত উন্নতির প্রধান সহায়—বিজ্ঞান।* ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন২ সময়ে বিজ্ঞান সহায়ে কিরূপ অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে সে বিষয়

---

* "The world to the unscientific is like an automaton to one unacquainted with its secret springs and mechanical action: But to him who knows its secret, it becomes obedient to a touch, and does all his pleasure."—

Rev. Dr. Brewer.

বোধ হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বিজ্ঞান অভাবেই বা কিরূপ অধঃপতন সম্ভবে ভুক্তভোগী ভারতবাসীদিগকে আর বষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। যে ভারত সকল দেশের—সকল জাতির উত্তমর্ণ আজ সেই ভারত সকলের নিকট অধমর্ণ বলিয়া পরিগণিত! মহামান্য আর্য্যের সন্তান আজ লজ্জা নিবারণের জন্য পরপ্রত্যাশী, দেশলাইয়ের ন্যায় একটী সামান্য দ্রব্যের নিমিত্ত পরের মুখ তাকাইয়া থাকে; রাজরাজেশ্বর হইয়া আজ কড়ার ভিখারী!—বড় সুখের বিষয়, একটু২ করিয়া আবার বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, ধীরে ধীরে আবার সেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের সূত্রপাত হইয়াছে। বড় সুখের বিষয় আবার ভারতে বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নাটকসংকুল বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র আবার "বিজ্ঞান রহস্য" প্রভৃতি পুস্তক প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে; চাকুরিগতপ্রাণ বাঙ্গালীও আবার Doctor of Science উপাধি লাভ করিয়া বিজ্ঞানবলে আপনার ও স্বজাতির গৌরব সাধন করিতে শিখিয়াছে।

শুভক্ষণে মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের পদার্পণ হইয়াছিল, শুভক্ষণে তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৩৫খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংস্থাপিত হইল, সঙ্গে২ বিজ্ঞান শাস্ত্রের পুনরালোচনার সূত্রপাত হইল। চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থদর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্র একে একে একটু২ করিয়া প্রসব লাভ করিতে লাগিল। দেখিতে২ এমন দিন ও আসিল, যে দিন লোকভয় অবজ্ঞা করিয়া, শত নিন্দাকে তুচ্ছ করিয়া মধুসূদন গুপ্ত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য ছুরিকা ধারণ করিলেন। আবার এদেশে অস্ত্রবিদ্যার পথ খুলিল।

এদিকে হিন্দুকলেজেও কিছু২ বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, ইহা দ্বারা প্রাণীতত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থদর্শন, ভূবিদ্যা এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা আরো অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মৃত মহাত্মা উড্রো সাহেব এজন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন, অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন; তিনি আমাদিগের

কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহারই আগ্রহে এক্ষণে মাইনর অধিকন্তু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইল, সঙ্গেং অন্যতম বিভাগ স্বরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। দিন দিন বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা বাড়িতে লাগিল।

সে দিন আবার যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান লিগের সভ্যগণ মহা উৎসাহভরে "Albert Temple of Science" নামে এক বিজ্ঞানময় বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। তাহা দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলিল, অনেকে অনেক আশা করিল। কিন্তু কেমন শনির দৃষ্টি! দুই দিন না যাইতেই—"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"!—প্রভাতের মেঘ আকাশের গায় মিশাইয়া গেল।

ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকারকে শত সহস্র ধন্যবাদ! তাঁহারই প্রযত্নে ১৮৭৬ অব্দের ২৯শে জুলাইয়ে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা হইল। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল ইহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডাক্তার মহাশয় বিপুল অর্থ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজের শরীর পাত করিয়া, দিবা নিশি চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া, অশেষ পরিশ্রমে, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে, বিজ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিগণের হৃদয় অধিকার করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। "কালে বীজমুপ্তমবশ্যমেব ফলমুপদর্শয়িষ্যতি"—হয়তঃ কালে এমন দিনও আসিতে পারে যে দিন ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির (Royal Society) ন্যায় ইহাদ্বারা আবার নির্ব্বাপিত দীপ পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিবে, পতিত ভারত আবার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে।

সুহাসিনী।

——:o:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুজনে।

"Thus to him spake she of her jealousie,"

Chaucer.

সম্মুখেই উগ্রচণ্ডার মন্দির। উভয়ে যাইয়া ধীরে ধীরে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যুবকের সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল—করালমূর্ত্তি। "মহামেঘপ্রভাং ঘোরাং"—রুধিরাক্তকলেবরা নবঘনবরণী শ্যামাঙ্গিনী আলুলায়িতকেশে রণরঙ্গে উন্মত্ত। গলে নৃমুণ্ডমালা, কটিতটে করশ্রেণীর কিঙ্কিণী, বামহস্তে একটা প্রকাণ্ড সদ্যঃছিন্ন যবনশির ঝুলিতেছে,—এখনও যেন তাহা হইতে রক্ত টোপাইয়া পড়িতেছে, এখনও তাহাতে কুটিল ভ্রুকুটী বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অদূরে দুইটা ডাকিনী আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া বিকট হাসি হাসিয়া ছিন্ন হস্ত পদ চর্ব্বণ করিতেছে —এখনও তাহাদিগের সৃক্কণী দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মুখে দাউ দাউ করিয়া দুখানা খর্পরের সরা জ্বলিতেছে, সেই আলোক প্রতীমার হস্তস্থিত কৃপাণফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে।—ভীষণদৃশ্য! যুবক দৃষ্টি ফিরাইলেন। গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে উন্মুক্তদ্বার দিয়া পবন প্রবল বেগে মন্দিরে প্রবেশ করিল, দেখিতে দেখিতে খর্পরের আলোক নিবিয়া গেল। মন্দিরময় গাঢ় অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইল।

ক্ষণেক উভয়েই নিস্তব্ধ। যুবতী কি বলিবে মনে করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। অনেক ইতস্তত: করিয়া দৃঢস্বরে বলিল;—"যুবক, আমি তোমায় কি জন্য আজ এই ভয়ানক দুর্য্যোগে ডাকিয়াছি তাহা কি তুমি শুনিতে চাও? তোমাকে বলিব বলিয়াই ডাকিয়াছিলাম; কিন্তু সাহস হয় না। যুবক, যাহা বলিব তাহা কি তুমি করিতে পারিবে?"

"আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

"তুমি চারুচন্দ্রকে জান?"

যুবক স্তম্ভিত। শিরায় শিরায় শোণিত ছুটিয়া উঠিল।

—"আপনি কি দেবী? দেবতা নহিলে এ সমস্ত গূঢ় কথা জানিলেন কেমন করিয়া?"

"না যুবক, আমি দেবী নহি—আমি রাক্ষসী। যুবক তুমি কি রাক্ষসীর কার্য্যে সাহায্য করিবে?"

যুবক দেখিলেন তাঁহার হস্তে এক টোপ জল—জল উষ্ণ। নিস্তব্ধভাবে আবার শুনিলেন—

"আমি যথার্থই রাক্ষসী। রাক্ষসী নহিলে এমন সময়ে ও আজ এখানে আসিব কেন? বনের পশু পক্ষী ও কেহ এখন আপন স্থান হইতে বাহির হয় না, রাক্ষসী যদি না হইব তবে আমিই বা কেন এই ভয়ানক দুর্য্যোগে বাটির বাহির হইব?—সত্যই বলিতেছি আমি রাক্ষসী। কিন্তু রাক্ষসী করিল কে?—চারু?—না, না, তাহার দোষ কি? সুহাসিনী—সুহাসিনীই তো আমার কাল। যুবক, তুমি না সুহাসিনীকে ভালবাস?"

যুবককে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"চুপ করিলে কেন? আমি জানি, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তুমি সেদিন ও কাহার সঙ্গে বলিতেছিলে—তুমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস; কিন্তু সে পাপীয়সী তোমার অতুল ভালবাসার বিন্দুমাত্রও প্রতিদান করে না। যুবক তুমি কি সুহাসিনীকে পাইতে চাও?"

যুবকের মস্তক ঘুরিল। সমস্তই তাহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, ঘোর অন্ধকার স্তরে স্তরে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। এবারেও নিস্তব্ধ দেখিয়া যুবতী বলিল—"তোমার কি বিশ্বাস হইতেছে না—আমি স্ত্রীলোক বলিয়া কি তোমার প্রত্যয় হইল না। কি বলিব তুমি স্ত্রীলোক নও, তাহা হইলে বুঝিতে স্ত্রীজাতির ঈর্ষা কি ভয়নাক বস্তু! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমায় তোমার সুহাসিনী দিব; কিন্তু তুমি আমায় তাহার বিনিময়ে কি দিবে যুবক?"

এবার কথা ফুটিল!—"আপনার কথা যদি সত্য হয়, আমার

পিতার অনেক সঞ্চিত অর্থ আছে, ইচ্ছা করিলে তাহার সমস্তেরই আপনি অধিকারিণী হইবেন।"

ঈষৎ হাসি হাসিয়া যুবতী বলিল—"আমি অর্থের লোভে আজ এই দুর্য্যোগে তোমার নিকট আসি নাই। প্রয়োজন হইলে, বাঙ্গলার সুবেদার কাসিমখাঁকে বলিয়া তোমাকে একটী রাজ্য দেওয়াইয়া দিব। যুবক তুমি কি আমায় আমার চারুচন্দ্রকে দিতে পারিবে?"

সমস্ত তাহার চক্ষে প্রহেলিকা বোধ হইল। অপ্রতিভ হইয়া বিনীত ভাবে যুবক বলিল।—

"আপনাকে চিনিতে পারি নাই, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য অনুমতি করুন"

একটু মুচকি হাসিয়া অথচ গম্ভীর স্বরে যুবতী বলিল—'যুবক তুমি উগ্রচণ্ডা দেবীকে দেখিয়াছ?"

প্রশ্ন শুনিয়া কি জানি কেন শরীর কাঁপিয়া উঠিল। ভীতকণ্ঠে উত্তর করিল—"দেখিয়াছি।"

তখন, অতি ধীরে ধীরে সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে উভয়ে যাইয়া প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিল। অতি চুপে২ অথচ দৃঢ়তা সহকারে যুবকের কানে কানে যুবতী কি বলিয়া দিল। শুনিয়া যুবক শীহরিয়া উঠিল—সে কথা যেই শুনিত, সেই তখনি শীহরিয়া উঠিত। পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় একটা পেচক বসিয়াছিল—গা ঝাড়িয়া পাখা নাড়িয়া বিকৃত-স্বরে বিকটরূপে চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবক একবার চারিদিকে চাহিলেন—ভয়ানক অন্ধকার। ঊর্দ্ধে নিম্নে স্তরে স্তরে অন্ধকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই অন্ধকার মধ্যে আবার সেই করাল মূর্ত্তি। ডাকিনী গণ যেন তাহাকে দেখিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছিন্ন মুণ্ড যেন আরক্ত নয়নে তাহার প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল। ভয়ানক! ভয়ানক! যুবকের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। কড় কড় করিয়া অশনিসম্পাতের ভীষণ শব্দ হইল। যুবতী বলিল:—

"এই ঘোর নিশাকালে—এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের সময় আজ আমাদিগের দুইজনে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা বেহই জানিল না—কেহই শুনিল"

উভয়ের মধ্যে একজনও তাহা প্রকাশ না করিলে পৃথিবীর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। আমি এই উগ্রচণ্ডাদেবীর পায়ে হাত দিয়া শপথ করিতেছি আমাদ্বারা একথা যদি কখনও ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হয়, তখনি যেন এইরূপে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। ইহা অপেক্ষা আর কি দিব্য করিব? যুবক, তুমিও যাহা বলিবার থাকে, বল।"

ধীরে ধীরে যুবক ও ঐরূপ শপথ করিল। তখন যুবতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"আইস আমরা বাহিরে যাই।"

মন্দিরের দ্বার অতিক্রম করিতেই উপরে—আকাশে—ঘনঘোর গভীর আকাশে রূপের ছটায় দিক উজ্জ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়াই যেন সৌদামিনী অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিদ্যুতের আলোকে তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে আর পা নাড়িবার ক্ষমতা রহিলনা। দেখিল, অদূরে অশথ বৃক্ষের তলায় এক উন্মাদিনী। নিবিড় কেশদাম আলুথালু, গায়ে ভস্ম ও কদ্দম, গলায় অস্থির মালা, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারাকারে কুটি কুটি ছিন্ন বস্ত্র আবদ্ধ। শরীর শুষ্ক হইয়াগিয়াছে, তথাপি এখনও রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই বোধ হয় উন্মাদিনী একদিন রমণীকুলের শিরোমণি ছিল। তাহার হস্তে একটা ভীষণ ত্রিশূল ভীষণ ভাবে নড়িতেছে—দুলিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই উন্মাদিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। উভয়ে শীহরিল, নখাগ্র হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। কে জানে কেন উন্মাদিনী ও আর তিষ্ঠিল না। একবার যুবতীর দিকে বিকট কটাক্ষ করিল, একবার ত্রিশূল ভীষণ ভাবে নড়িয়া উঠিল, আবার সেই বিকট হাসি হাসিল। হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ত্রিশূল হস্তে উন্মত্তভাবে দৌড়িয়া চলিল। স্তম্ভিত হইয়া মৃৎপুত্তলীর ন্যায় যুবক যুবতী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগিনী-চক্র।

(হেমকূট পর্ব্বতস্থ পূর্ণকৌমুদী-বিভাসিত বৃক্ষরাজিপরিবেষ্টিত সুন্দর উপত্যকাভূমে স্বচ্ছ শিলাতলে রাজা প্রিয়দর্শন আসীন।)

রাজা।—স্বগত— নিশীথে নিদ্রার বশে শান্ত ধরাতল।
স্বাপদ শার্দ্দূল সিংহ জীব জন্তু যত
মায়াময়ী কুহকীর মোহ মন্ত্র বলে
বিঘোর নিদ্রিত, মরি, লুপ্তচেতঃ যেন।
হাসিছে নীলিমান্তর, গগণ প্রাঙ্গনে
তারাকান্ত ভ্রান্ত হ'য়ে কুমুদী-মিলনে
ছড়াইছে হাসিরাশি। গড়া'য়ে কৌমুদী
সুধার ঝরণা যেন পড়িছে ঝরিয়া।
শ্যামল বিটপী ঘন ঘন-আবরণ
রজত কিরণ মাখি—স্বচ্ছ আভাময়—
দুলিছে বনানীহৃদে মৃদুল হিল্লোলে।
কোথাও ফুটেছে ফুল, ধাইছে চৌদিকে
আকুল ভ্রমরাকুল—ফুলমধুচোর—
পরিমল সহ বায়ু যে দিকে ফিরিছে।
কোথাও সুরভিপূর্ণ মঞ্জুকুঞ্জ হ'তে
পড়িছে কুসুম খসি। সুমৃদু পবনে
নাচাইছে বৃক্ষরাজি, দোলাইছে মরি
শিশির-নীরের বিন্দু বনরাজিগলে;—
উজলিছে দিকচয়। রাজার ঘরণী
মণিহার-গলে যেন ফিরে মত্তপদে
দোলাইয়া কণ্ঠহার, দোলাইয়া বপুঃ।

—আরো কি সুন্দর মরি হিমাংশু মিলনে।
অদূরে খেলিছে কিবা সরসীহৃদয়ে
সুনীল নলিনীদাম, দিক্ শোভা করি
উজলিয়া রূপজ্যোতিঃ পড়েছে সলিলে ;—
একাধারে শত পদ্ম ছুটিয়া বেড়ায়।
শুনেছি কবির মুখে, রবির বিচ্ছেদে
নলিনী মুদয়ে আঁখি, হাসে কুমুদিনী
কৌতুক আবেশে ভাসি হেরি নিশানাথে ;—
পূর্ণ সে ভাবের হেথা হেরি ব্যতিক্রম।
এ হেন মাধুরী, মরি, হেরিলে নয়নে
(দেবতাবাঞ্ছিত হেন রম্য উপবন)
ইচ্ছা করে রাজভোগে দিয়া জলাঞ্জলি
ভুঞ্জি এ অতুল সুখ, প্রেমানন্দ মনে
বিধির বিচিত্র ছবি হেরি দিবানিশি।
রাজকুলোদ্ভব আমি, রাজন্নে পালিত,
অতুল বৈভব মম, রাজরাজেশ্বর,
যক্ষপতি সম যত রতন-ভাণ্ডার।
কিন্তু কোথা এ লাবণ্য (মরি) যার প্রেমবশে
ইচ্ছা হয় যোগী হ'তে তুচ্ছি রাজপদে।

(ক্ষণেক মৌনাবলম্বনের পর ধীরে ধীরে গীত।)

রাগিণী ইমনকল্যাণ।—তাল মধ্যমান।

দেহি তব চরণ দুখানি।
উত্তাল ভবসাগরে একই তরণী।
ত্বংহি আদি ত্বংহি শেষ, ত্বংহি প্রকৃতি পুরুষ,
চৈতন্যরূপ জ্যোতিষ, সাধুজন হৃদি মণি।
কালাদি তুমি সকলি, তুমি জল মরু স্থলী,
তোমার (এ) রচনাবলী, গুণাবলি কিবা গণি।

ঈষৎ নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি। গাহিতে গাহিতে শূন্য হইতে অপ্সরা-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

যোগিনী-চক্র।

রাগিণী ইমনভূপালী।—তাল একতালা।

প্রেম উপবন।

প্রেমিক জন প্রয়াস-রতন।

ফুটিছে কুসমকুল, পরিমল ছুটিছে,
প্রেমমধু আশে ছুট অলিকুল জুটিছে;—
রসিক মনরঞ্জন-কারণ।

প্রথম।—ত্যজিয়া স্বরগ, মরি, যে অবধি মোরা
বসিনু কুহকবলে এ অপূর্ব্ব ভূমি
রোগশোকঅসূয়াবর্জ্জিত, প্রেমময়;
তদবধি না জানি সজনি কোন ক্লেশ।
তবু এ পরাণ কিন্তু কাঁদেলো বিষাদে
অতুল আনন্দময়ী অমরা বিচ্ছেদে।

দ্বিতীয়।—ত্রিলোকবিজয়ী, সখি, দেব পুরন্দর,
শচীর কুশল মোরা মাগি অবিরত
বিধাতায়; কিন্তু কেন যে নিদয় তিনি
এ অধিনীদলে, আমি না পারি বুঝিতে

তৃতীয়।—তাই যেন,—ভুলেছেন তিনি সুরপতি;
ভ্রমেও কি কভু শচী না আনে অন্তরে
দাসীবৃন্দে?

চতুর্থ।— সত্য, কিন্তু ভাবি দেখ মনে
নিয়তি-আদেশে মোরা ফিরি মর্ত্তলোকে;
কি কাজ মোদের সখি স্মরি পূর্ব্বকথা?
বৃথা এবে গঞ্জি মোরা শচী, শচীনাথে।
আইস, সজনি সবে ভ্রমি কুঞ্জবনে
সরস কুসুম তুলি, চিকনিয়া গাঁথি
ফুলমালা; দোলাইয়া প্রমীলার গলে
ঘুচাব মনের জ্বালা আজি মরলোকে।

ক্রমশঃ

সুহাসিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুলহার।

ফুলের শিকলে লাগায়ু কুলুপ।

বিরস রহলি কাহে ?"

বৃন্দাবন দৃশ্যাবলি।

একদিন—বিবৃত ঘটনার বহু দিবস পূর্ব্বে—গণনা করিলে প্রায় পাঁচ বৎসর হইবে, একদিন বৈকাল বেলা বকুলতলায় বসিয়া দুইটী বালিকা ফুল কুড়াইতেছিল। অদূরস্থ করতোয়া-নীরে গাত্র ধৌত করিয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুম পরিমল অঙ্গে বিলেপিত করিয়া মলয়পবন মৃদু মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। শীকরসম্পৃক্ত সেই সুশীতল সমীরণ রহিয়া রহিয়া বালিকাদিগের অযত্ন সংরক্ষিত আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি উড়াইয়া খেলা করিতেছিল। সম্মুখে হরিদ্বর্ণ অনন্ত দুর্ব্বাক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পদপ্রান্ত চুম্বন করিতে করিতে শান্ত-প্রবাহিনী করতোয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অপর পারে অপ্রশস্ত বালুকাতট, তদুপরি শ্যামল বৃক্ষরাজি পশ্চিম সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে মণ্ডিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম পাইয়া নাবিকেরা মনের আনন্দে "কালা কত নাগরালি হে তোমার"—ইত্যাদি সারি গান ধরিয়াছে। সেই সুখ-সঙ্গীতে মোহিত হইয়া পালের বসন উড়াইয়া বায়ুসঙ্গে নাচিতে নাচিতে করতোয়ার সেই শান্তবক্ষে অগণ্য পোত ভাসিয়া যাইতেছে।

মাথার উপর আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া মধুর স্বর-লহরী ছড়াইতে ছড়াইতে পাপিয়া উড়িয়া গেল। নিকটস্থ বকুলবৃক্ষের ঘনপত্রবিন্যস্ত শাখায় বসিয়া পত্রান্তরাল হইতে বসন্তের কোকিল তদধিক মধুরতর একবার জগতকে শুনাইল। সর্ব্বাপেক্ষা মধুরতম রবে বালিকাদুটী ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে একটি শ্লোক বলিতেছিল। সে শ্লোক—সে মধুরাবৃত্তি

—সে গুঞ্জন-গঞ্জন মধুরব্যক্তি যে কেহ শুনিতেছিল না, তাহা নহে। বালিকারা আপনার ভাবেই বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল—

"বকুলফুল কুড়াতে কুড়াতে পেয়ে গেলাম মালা।
সে মালা দংশিল হৃদে একি বিষম জ্বালা॥"

—দূরে দাঁড়াইয়া গোপনভাবে একটী বালক একমনে তাহাই শুনিতেছিল। বালিকারা বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি ক্ষুদ্র সূচে পরাইতেছিল—বালক থাকিয়া থাকিয়া একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

সুহাসিনীর বয়ঃক্রম প্রায় দশবৎসর হইবে। মুখখানি ঢলঢল করিতেছে, তাহার উপর সেই ভাসা ভাসা চক্ষু দুটী, আর সেই নিবিড়কৃষ্ণ তারকাযুগ—বড় সুন্দর, বড় প্রীতিপ্রদ, সারল্যের খনিভূমি। শৈলবালা ও এই তেরোয় পড়িয়াছে। চক্ষু উজ্জ্বল—কিছু চঞ্চল, দেখিলেই বোধ হয় কিছু অভিমানী, উগ্রস্বভাব।

প্রায় আধঘণ্টা হইল, সুহাসিনী এখনও ধীরে ধীরে সেই একছড়া মালা গাঁথিতেছে। শৈলবালা ইহার মধ্যে কত ছড়া গাঁথিল, কত ছড়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, অথচ একছড়া ও সম্পূর্ণ হইল না। ছিন্নপুষ্পে ও ছিন্ন মাল্যদামে তথায় স্তূপাকার হইল। অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে সুহাসের মালা গাঁথা শেষ হইল। মাথা তুলিয়া বলিল—"দিদি, দেখি তোমার কেমন হ'য়েছে।" শৈলবালা দেখিল তাহার অগ্রেই সুহাস গাঁথিয়া ফেলিয়াছে—বড় অভিমান হইল, মনে মনে সুহাসকে গালি দিল, কথা কহিল না। তাড়াতাড়ি গাঁথিবার চেষ্টা করিল, হাত হইতে ফুল পড়িয়া গেল। "এই রকম করিয়া গাঁথনা দিদি।"—সুহাসিনী দেখাইয়া দিতে গেল। অসহ্য হইল—শৈল বলিল "থাক্‌লো থাক্, তোর আর গিন্নেপণা করিতে হ'বেনা; আমি জানি।" অগত্যা সুহাস চুপ করিল। অনেক কষ্টে শৈলবালার মাল্যরচনা শেষ হইল।

এখন বিবাদ উঠিল—কার মালা ভাল। কে বলিবে?—কে মধ্যস্থ হইয়া এ ঘোর দ্বন্দ মিটাইয়া দিবে? হাসিতে হাসিতে গুপ্ত স্থান হইতে চারুচন্দ্র দৌড়িয়া আসিল। চারুর বয়স এই ষোল বৎসর, কিন্তু দেখিবা-

মাত্র আরো কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়। চারু কে, কাহার সন্তান তাহা কেহ জানিত না। সকলে জানিত—চারু নিরাশ্রয় অনাথ দরিদ্রবালক, সতীশচন্দ্র পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাকে পালন করিয়াছেন। গম্ভীর প্রকৃতি, কমনীয়কান্তি, মনোহর দেহযষ্টি, বিশালবক্ষঃ সুপ্রশস্ত ললাট, সেই ললাটে রাজদণ্ডবৎ রেখা—অনেকে বলাবলি করিত, চারু হয়তঃ কোন রাজপুত্র হইবেন। শৈশব হইতেই শস্ত্রবিদ্যার উপর বড় অনুরাগ, এই বয়সেই তাহাতে সুনিপুণ। শৈশবের খেলানা, সঙ্গের সঙ্গী উন্মুক্ত তরবারি কটিতটে ঝুলিতেছে। হাসিতে হাসিতে চারু আসিয়া বলিল—"তোমাদের কিসের ঝগড়া সুহাস?"

বালিকা হাতে স্বর্গ পাইল। আনন্দে করতালি দিয়া বলিল;—"এই চারু এসেছে! হাঁ চারু, আমাদের কার মালা ভাল হ'য়েছে ভাই?"

চারু দেখিল উভয়ের হাতে এক এক ছড়া মালা। উভয়ই সুন্দর; কার ভাল বলিবে ঠিক্ করিতে পারিল না। শৈলবালাকে ডাকিয়া বলিল—"ইহা লইয়া তোমরা কি করিবে শৈল?"

ধীরে ধীরে শৈলবালা বলিল—"তা যাহোক, তুমি কেন বল না কার ভাল হ'য়েছে।" মধ্যস্থ দায়ে পড়িলেন। অন্য কথা পাড়িবার জন্য চারু বলিল—"আগে বল, ইহা তোমরা কি করিবে।"

হাসিতে হাসিতে শৈলবালা বলিল—"যাহা ভাল হইবে তাহা তোমায় পরাইয়া দিব।"

হাসিতে হাসিতে চারুচন্দ্রও বলিলঃ—

"আগে পরাইয়া দাও, দেখি কেমন দেখায় পরে বলিব।"

সে হাসির মধ্যে সকল অপেক্ষা উচ্চ হাসি হাসিয়া সুহাসিনী বলিল—

"তবে আমি আগে পরাইয়া দিব।"

হাসিতে হাসিতে সেই স্বহস্তরচিত সুগন্ধময় বকুলমালা চারুর গলায় পরাইয়া দিল। হাসিতে হাসিতে শৈলবালাকে বলিল—"কৈ, দিদি, তোমার মালা দাও।"

শৈল মালা লইল। কে জানে কেন হাত কাঁপিতে লাগিল। মালা পরাইতে গেল, কোষমুক্ত শাণিত কৃপাণ ফলক ঝক্‌মক্ করিতেছিল, হাত

হইতে খসিয়া তাহার উপর পড়িল, বিবাদের মালা খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিন্ন হইয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া অবনতমস্তকে শৈলবালা সরিয়া গেল। দারুণ অভিমানে তাহার চক্ষে জল আসিল। দূরে গিয়া একবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিল—আপনার মালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর সুহাসিনীর সেই মালা বসন্তানিলের মৃদু আন্দোলনে ধীরে ধীরে চারুর গলায় দুলিতেছে। অসহ্য! একবার চারুর প্রতি চক্ষু চাহিল, একবার সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল—চক্ষু অগ্নিময়, দৃষ্টি গরলপূর্ণ। ধীরে ধীরে আবার মস্তক অবনত করিল। কেহ কিছু জানিল না।

করতোয়াবক্ষে সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া পড়িল। ঘাট হইতে জলপূর্ণকলস-কক্ষে অসংখ্য পুরস্ত্রী গৃহে ফিরিল। নিঃশব্দে শৈলবালা তাহাদিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

আর সুহাসিনী?—সুহাসিনী এ সমস্ত কিছুই দেখে নাই। শৈলবালার মালা ছিঁড়িয়া গেল দেখিয়া তাহার ও বড় কষ্ট হইয়াছিল; দেখিল, শৈল-বালা ধীরে ধীরে অন্যত্র যাইতেছে ভাবিল, বুঝি স্বতন্ত্র মালা গাঁথিবার জন্য ফুল কুড়াইতে যাইতেছে। বালিকা অন্য দিকে চাহিল, এসমস্ত কিছুই দেখিল না।

আকাশে একটি তারা জ্বলিতেছিল। সুহাসিনী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। অবাক্ হইয়া চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া বালিকা বলিলঃ—

"ওখানে অমন কত তারা ফুটে, চারু?"

প্রশ্ন শুনিয়া হাসি আসিল। হাসিতে হাসিতে চারু বলিল—

"অনেক।" "যাওয়া যায়না?"

"কোথায়?" "কেন, ঐ আকাশে।"

"ওখানে যাইতে পারিলে কি করিবে, সুহাস?"

"আমি ঐ তারাগুলি কুড়াইয়া আনিব। এ মালা তোমায় ভাল দেখা-ইতেছেনা, যদি যাইতে পারি তারার মালা গাঁথিয়া তোমাকে পরাইয়া দিব।"

সুহাসিনী বালিকা, চারুচন্দ্রও বালক—সংসারবিরাগী কোন বৃদ্ধ, স্বার্থ-পূর্ণ কোন প্রৌঢ় অথবা প্রণয়বাতুল কোন যুবক এ কথার অর্থ বুঝিত

কি না জানিনা। বালিকার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের কতটুকু উচ্ছ্বাস বালক তাহা বুঝিল। বায়ুবশে উন্মুক্ত কেশ পাশ মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দিয়া তাহা সরাইয়া বালিকা বলিলঃ—

"চারু, তুমি আমাকে ওখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।"—বালিকা-সুলভ ব্যগ্রতার সহিত সুহাসিনী একবার চারুর প্রতি চাহিল। চারুর চক্ষু অশ্রুময়, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে।

"চারু, তুমি কাঁদিতেছ?"

"না। সুহাস, সত্য সত্যই কি তুমি আমার গলায় মালা দিলে।"

বালিকা এ কথার অর্থ বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টা ও করিল না। তাহার সে হাসি হরিয়া গেল। মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বলিলঃ—

"চারু, তুমি কাঁদিতেছ কেন ভাই?"

কোন উত্তর পাইল না। নীরবে চক্ষু হইতে টপ্‌টপ করিয়া জল পড়িতেছিল। নীরবে চক্ষের জল মুছিয়া ভগ্নস্বরে চারুচন্দ্র বলিল—"না।"

"তবে তোমার চক্ষে জল কেন?"

"কৈ না। তুমি ব'স আমি আসিতেছি।"

চারু একবার সুহাসের দিকে চক্ষু ফিরাইল, কি জানি কেন অমনি অশ্রুবেগ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। বরষার স্রোতের ন্যায় দরদরিত অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হতবুদ্ধি হইয়া সুহাস একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সামান্য বস্ত্রাঞ্চলে প্রবল অশ্রুবেগ নিবারণ করিতে করিতে চারুর দক্ষিণ হস্তে হস্ত দিয়া বলিল—

"কোথায় যা'বে ভাই, তোমার কি হইয়াছে?"

"কে ডাকিতেছে—আমি আসি।"

"কৈ, কেহ তো তোমায় ডাকে নাই।"

"তুমি তবে শুনিতে পাও নাই। তুমি বাড়ী যাও, এখন চলিলাম।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে২ চারুচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেল।

—000—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদর্শনে।

"———————এইত তুলিনু
ফুলরাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, সজনি,
ফুলমালা, কিন্তু কোথা পাব সে চরণ
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহা চাহি পূজিবারে।"

মেঘনাদবধ।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণানবমীর চন্দ্র আসিয়া সান্ধ্যগগণে দেখা দিল। সে হাসি দেখিয়া বৃক্ষের শাখায়, গাছের ডালে, লতার শিরে ফুলকুল সুন্দরী একে একে হাসিয়া উঠিল। তখনও ও বৃক্ষ হইতে এক একটী করিয়া ফুল ঝরিতেছিল, তখনও সুহাসিনী অধোমুখে বসিয়া তাহাই কুড়াইতেছিল। কেবল যে ফুল কুড়াইতেছিল, এমন নহে ; যদি কেহ অতি নিকটে গিয়া তাহার মুখের দিকে সে সময় চাহিয়া দেখিত, সে দেখিতে পাইত যে, ফুলেন্দীবরতুল্য সেই আয়তলোচন হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ হইয়াছে চারু উঠিয়া গিয়াছে, এখনও আসিল না কেন? বুঝি আজ আর আসিবে না। কিন্তু চারু আজ কাঁদিল কেন? কতদিন সুহাস তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে—কতদিন একত্রে বসিয়া দুজনে কত কথা কহিয়াছে, কত গল্প করিয়াছে। চারু তো কখনও কাঁদে নাই, তবে আজ তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িল কেন? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? একবার চারিদিকে চাহিল—শৈলবালা নিকটে নাই। আচ্ছা, শৈলইবা গেল কোথায়? সুহাস ভাবিতেছিল, সে বুঝি অন্য মালা গাঁথিবার জন্য অন্যত্র ফুল কুড়াইতে গেল—তাহা তো নয়, তাহা হইলে এখনও আসিল না কেন? আহা! তাহার অমন মালাছড়াটী ছিঁড়িয়া গেল! শৈলবালার জন্য সুহাসিনীর বড় কষ্ট হইল। আবার একবার চারিদিকে চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভাবিল, শৈল বোধ হয় বাড়ী গিয়াছে।

কিন্তু চারু—চারু কোথায় গেল? বলিয়া গেল আমায় কে ডাকিতেছে—মিথ্যা কথা। কেহ তো ডাকে নাই, তবে অমন ছল করিয়া উঠিয়া গেল কেন? অনেক ভাবিল কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চন্দ্রের আলো আসিয়া বকুলতলায় পড়িল। সেই চন্দ্রালোকে—সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত দূর্ব্বাক্ষেত্রে সুহাসিনী সেই ভাবেই বসিয়া রহিল, কেন রহিল তাহা সে জানে না। বসিয়া বসিয়া আবার একটু কাঁদিল, কেন কাঁদিল তাহা ও সে জানে না। অথচ একটু কাঁদিল। চারু কাঁদিয়াছে সুহাসের সম্মুখে চারু কখনও চক্ষের জল ফেলে নাই—এতদিন তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে সুহাস কখন তাহাকে বিমর্ষ দেখে নাই, চারুকে সুহাস প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, বালিকার যতদূর ভালবাসা সম্ভবে ততদূর তাহাকে ভাল বাসিত আজ সেই চারু কাঁদিয়াছে—সুহাস না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। বালিকা আবার একটী একটী করিয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল; ধীরে ধীরে আবার একটী একটী করিয়া সূত্রে পরাইতে লাগিল। আবার একছড়া মালা গাঁথিল। মালা গাঁথিবার আর তাহার ইচ্ছা ছিল না; ইচ্ছা না থাকিলেও মনের অনন্যাসক্তিবশতঃ মালা গ্রথিত হইল। গ্রন্থন শেষ হইলে মালা ছড়াটী লইয়া বালিকা তাহা দেখিতে লাগিল, আর এক একবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ইচ্ছা—চারুকে পাইলে এছড়া ও তাহাকে পরাইয়া দেয়।

দুই একটী গলিতপত্রের পতনশব্দ হইল। ঐ বুঝি চারু আসিতেছে—চমকাইয়া সুহাস সেই দিকে চাহিয়া রহিল। চারু আসিল না। মালা ছড়াটী হাতে করিয়া বালিকা অন্য মনে ২।১ টি করিয়া নক্ষত্র গণিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, সব গণিয়া ঠিক্ করিবে। সুহাস এককালে ২০ অবধি গণিতে পারিত। এক, দুই করিয়া এককুড়ি, দুকুড়ি, পাঁচকুড়ি—যত পারিল গণিল, তবুও ঠিক্ হইল না। অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রের সংখ্যা হইল না। তাহা রাখিয়া সুহাস আবার চারিদিকে চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অন্যমনা হইয়া বালিকা সেই মালা আপনার কবরীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বড় সুন্দর দেখাইল, যেন নীল আকাশ

বেড়িয়া তারকারাজি ফুটিয়া উঠিল। সে শোভা যে দেখিত, সেই ভাবিত সুন্দর। অদূরে কামিনীঝোপের অন্তরাল হইতে একজন যুবক তাহা দেখিতেছিল, সে ও ভাবিল সুন্দর।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুবক তাহা দেখিল। কি ভাবিয়া একটু হাসিল। হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। চমকাইয়া সুহাস বলিল—

"কে ও দিদি—শৈলবালা।"—উত্তর নাই।

"প্রিয়ম্বদা?"—তথাপি হস্ত উঠিল না।

বালিকা তখন আপনার সেই মৃণালগুঞ্জি নবনীতনিন্দি সুকোমল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি বুলাইয়া বলিল—"চারু?"

"ছিঃ সুহাস, চিনিতে পারিলে না!"—চক্ষু ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে যুবক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বালিকার সেই সুন্দর সরল নির্দ্দোষ মুখখানিতে লজ্জার ঈষৎরেখা দেখা দিল। ব্রীড়াবনতমস্তকে ধীরে ধীরে সুহাস বলিল—

"বিনু বাবু! আপনি এখানে কবে আসিলেন?"

হাসিয়া যুবক বলিলঃ—"এই মাত্র আসিতেছি—তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; তোমাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ এদিকে আলো দেখিয়া দৌড়িয়া আসিলাম।"

"আলো কিসের?"

"তোমার ঐ রূপের।"—বিনোদ একটু মুচকিয়া হাসিল। বালিকা তাহা বুঝিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু বিরক্ত হইল। অন্যমনে জিজ্ঞাসা করিলঃ—

"এখন যে এখানে আসিলে?" "আমার যে বিবাহ।"

"কবে?" "বোধ হয়—অতি অল্প দিনের মধ্যে।"

"কার সঙ্গে?" "পূর্ব্ব হইতেই যার সঙ্গে কথা বার্ত্তা।"

"সে কে?" "সতীশ বাবুর কন্যা—সুহাসিনী।"

বালিকা স্তম্ভিত। কিছু না বলিয়া অবনতমস্তকে বসিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি খুঁটিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের জন্য বিনোদ ও নিস্তব্ধ। শূন্য-

দৃষ্টে সুহাসিনী বিনোদের প্রতি চাহিল। হাসিয়া যুবক বলিল—"কি দেখিতেছ? কথা কহিতেছ না যে।" কোন কথা কহিল না, অবাক্ হইয়া বালিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। "রাত্রি হইয়াছে, আমি বাড়ী যাই।" চাহিয়া চাহিয়া ইহা বলিয়াই বালিকা তথা হইতে দৌড়িয়া চলিল। "সুহাস, সুহাস শুন"—বিনোদ এত ডাকিল, শুনিয়াও শুনিল না, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলিল। কুরঙ্গিনী যেমন ব্যাধভয়ে পলাইয়া যায় সেইরূপ দ্রুতপদে দৌড়িয়া চলিল। হতবুদ্ধি হইয়া বিনোদ সেই দিকে শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পৃথিবী হাসিতেছে—সুধাকরের সুধাময় কিরণে বিভূষিত হইয়া পৃথিবী হাসিতেছে। হাসিয়া হাসিয়া আকাশের চাঁদ কে জানে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, হাসিয়া হাসিয়া তারাগণ চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ফুল কুল হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায় ঢলিয়া পড়িতেছে; মাথার উপর সহস্র নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বকুল বৃক্ষ দাড়াইয়া হাসিতেছে। পৃথিবী যেন হাস্যময়ী। বিনোদের মুখে হাসি নাই। হৃদয় দারুণ চিন্তায় আকুল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই বকুলতলায় পাদচারণা করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কত কি চিন্তা করিল। কি ভাবিল, দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসিন।

"কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?"

বিদ্যাপতি।

রাত্রি না পোহাইতেই ত্রস্তভাবে সুহাসিনী আসিয়া ডাকিল—"দিদি শৈল, তুমি কি উঠিয়াছ?"

সমস্ত রাত্রি শৈলবালার নিদ্রা হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছিল তাহা চিন্তাপূর্ণ—অতি অল্পক্ষণের জন্য। কেন সে সুহাসিনীর সঙ্গে বৈকালে ফুল কুড়াইতে গিয়াছিল গিয়াছিল তো কেন মালা গাঁথিয়া চারুকে

পলাইতে গেল? সত্যই কি চারু তাহার অপেক্ষা সুহাসকে ভালবাসে? ভালবাসিলেইবা তাহাতে তাহার কি? তাহার কি, তাহা সে জানে না কিন্তু মন বুঝে কৈ? প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?

সুহাসিনী!—সুহাসিনী নামটাই যেন বিষমাখা। সে তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে,—জ্যেষ্ঠার ন্যায় ভক্তি করে; শৈলবালা তাহাকে ভালবাসে না কেন? তাহার নাম করিলেই এত ঘৃণা—এত ক্রোধের উদ্রেক হয় কি জন্য? সুহাসিনী বালিকা, তাহার দোষ কি? দোষ কি? সে আজ হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে।

সুহাসিনী জমিদারের মেয়ে, আর সে অনাথা নিরাশ্রয়া। তাহাদের মান, সম্ভ্রম, সম্পত্তি জমিদারী সকলি আছে; কিন্তু এ নিরাশ্রয়া অনাথিনীর কি আছে? একটী মাত্র সুখের সামগ্রী আছে তাহাও সুহাসিনী কাড়িয়া লইতেছে, পিতা, মাতা, ধন জন সকলি হারাইয়া অভাগিনী এতদিন ধরিয়া যাহার আশায় বাঁচিয়া আছে, সুহাসিনী আজ সেই আশায় বঞ্চিত করিতেছে। এতদিন ধরিয়া গোপনে গোপনে যে প্রেম হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা উৎপাটন করিলেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় উৎপাটিত হইবে, সুহাসিনী আজ সেই প্রেম উৎপাটিত করিতে উদ্যতা হইয়াছে। এত অত্যা[illegible] অত্যাচার—সবল হইলেই কি দুর্ব্বলের প্রতি[illegible]

শৈলবালা এখানে আর একদণ্ড [illegible] যাইবে? কেন যাইবে? অন্যস্থানে গেলে কি চারুকে পাইবে? কি করিলে চারুকে পাওয়া যায়? সুহাসিনী চারুকে ভালবাসে, বোধ হয় তাহার অপেক্ষাও শৈলবালা তাহাকে ভালবাসে, তবে আর কি করিলে তাহাকে পাওয়া যায়? আচ্ছা, শৈল যদি জমিদারের কন্যা হইত? শৈলবালার একটু একটু মনে পড়ে, সেও যেন সুহাসিনীর ন্যায় একদিন কোন জমিদারের আদরের মেয়ে ছিল, তাহাকেও যেন একদিন কত দাস দাসী সেবা করিত, আর একজন অতুল ধনের অধিকারী তাহার ছিল। কিন্তু কেন অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহা তাহার [illegible] না। আর কখনও কি শৈলবালা তাহার পিতাকে দেখিতে

পাইবে? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, অন্বেষণ করিবে, পিতার দেখা কি মিলিবে না? যদি তাহাকে পায়—যদি আবার তেমনি জমিদারের আদরের মেয়ে হইতে পারে তবুও কি চারু তাহাকে ভালবাসিবেনা? আর তাহা যদি না হয়, যদি সে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তবুও শৈল একবার অর্থের চেষ্টা করিয়া দেখিবে। রাজরাজেশ্বরী হইলেও কি চারুর প্রণয়পাত্রী হইতে পারিবে না? কিন্তু, চারু কি অর্থের দাস? তাহা না হইয়া চারু যদি প্রেমের দাস হয়, অর্থলালসা না হইয়া সত্য সত্যই যদি এ প্রেমপিপাসা হয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে, সুহাসিনি, শৈলবালা যদি এত করিতে পারে, সুযোগমতে পথের কণ্টক সরাইতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।

নিঃশব্দে শৈলবালা গৃহের দ্বার খুলিল। দাস দাসী পরিজন বর্গ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, নিঃশব্দে শৈলবালা তাহাদিগের মধ্য দিয়া নীচে নামিল। নীচের দরজা খুলিল, লৌহময় শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল।

উপরের ঘরে শুইয়া সুহাসিনী একটী স্বপ্ন দেখিতেছিল। যেন সে ও চারু দুইজনে নির্জ্জনে বসিয়া কত গল্প করিতেছিল। সুহাস সে দিন অনেক মালা গাঁথিয়াছিল, একে একে সকল গুলি চারুকে পরাইতেছিল। চারু সে সময়ে কাঁদিল না, হাসিতে হাসিতে সকল গুলি গলায় পরিতেছিল। আজ আর চারুর মালা পরিতে কোন আপত্তি নাই, সুহাসের ও গাঁথিতে কষ্ট নাই, হাসিয়া হাসিয়া মালার পর মালা গাঁথিয়া মহানন্দে চারুকে সাজাইতেছিল। হঠাৎ যেন কে আসিয়া সুহাসিনীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একছড়া মালা চারুর গলায় পরাইয়া দিল। যেন সেই মালা হইতে একটা প্রকাণ্ড সাপ বাহির হইল; সাপ ধীরে ২ চারুকে দংশন করিল; চারু ঢুলিয়া পড়িল। তখনি যেন আবার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া সাপ আসিয়া সুহাসের হাত ধরিল। চাহিয়া দেখিল—সাপ নয়—বিনোদ। ভয়ানক স্বপ্ন! বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল। নীচে দরজা খুলিবার ঝন্ ঝনা শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ত্রস্তভাবে সুহাসিনী আসিয়া শৈলবালাকে ডাকিল।

ঘরের দ্বার খোলা ছিল, সুহাসিনী শৈলবালার গৃহে প্রবেশ করিল

গৃহ অন্ধকারময়, কিছুই দেখিতে পাইল না। "দিদি, এখনও কি তোমার ঘুম ভাঙ্গে নাই?" সুহাসিনী এত ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না। ধীরে ধীরে যাইয়া একটী জানালা খুলিল। ধীরে ধীরে শীতল সমীরণ আসিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিল। কেশপাশ আলুথালু হইয়া রহিয়াছে, সমীরণের মৃদু হিল্লোলে ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। জানালায় মুখ দিয়া বালিকা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

রজনী প্রভাতকল্পা। চন্দ্রের আর সে জ্যোতিঃ নাই, যে দুই একটী নক্ষত্র ছিল তাহা নিভিয়া গিয়াছে। ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট অন্ধকার পুঞ্জে পুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই অন্ধকার মধ্যে সুহাসিনী দেখিল কে এক স্ত্রীলোক প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানভূমির উপর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উদ্যান অতিক্রম করিল, উদ্যান পার হইয়া রাজপথে পড়িল, নক্ষত্রগতিতে রাজপথ বহিয়া চলিল। অন্ধকারে স্ত্রীলোকটী ভালরূপ দেখা গেল না; কিন্তু, মুহূর্ত্তের জন্য বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। যেন—যেন ঐ স্ত্রীলোকটীই সুহাসকে ঠেলিয়া চারুর গলায় সেই বিষময় মালা দিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সভয়ে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল।

পাশের [illegible] গিয়া ডাকিল—"মালতি"। মালতী অকাতরে নি[illegible]

বিরক্ত হইয়া;

"দিদি ঠাকরুণ! তোমার কি ঘুম নাই, এত রাত্রে কি করিতেছ? যাও শোওগে।" মালতী আরো অস্পষ্ট রূপে কত কি বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বালিকা বলিবার অবসর পাইল না। অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল

প্রভাত হইল, কাক ডাকিল; একে একে বাড়ীর সকলে জাগিল। দৌড়িয়া সুহাসিনী শৈলবালার ঘরে গেল। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—ঘর আলোকময়; কিন্তু শৈলবালা কোথায়? এত খুঁজিল, কোথায়ও দেখিতে পাইল না; সকলকে জিজ্ঞাসা করিল কেহই কিছু বলিতে পারিল না। মালতী আসিয়া বলিল—"তাইত! বড়দিদি কোথায় গেলেন? তা, হ্যাঁগা, দিদিঠাকরুণ! অতরাত্রে তুমি কি করিতে

গিয়াছিলে গা ?”—যাহা কবিতে গিয়াছিল সুহাসিনী সমস্ত বলিল। মালতী শীহরিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ দুইজনে দৌড়িয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

আর সে অন্ধকার নাই। সূর্য্য উঠিয়াছে, রাজপথে জনস্রোতঃ বহিয়াছে—অসংখ্য কার্য্যে অসংখ্য লোক চলিয়াছে। একে একে দুইজনে রাজপথবিহারী সেই সমস্ত লোকমণ্ডলী দেখিতে লাগিল। তাহাকে আর দেখা গেল না। শেষ রাত্রির সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে সুহাসিনী যাহাকে দেখিয়াছিল আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। সেই দিন হইতে শৈলবালাকেও আর কেহ কখন সেখানে দেখিতে পাইল না।

কবি ও চিত্রকর।

—000—

কবি আবার তাঁহার কল্পনাপ্রভাবে অসম্ভব সৌন্দর্য্যের ও সৃষ্টি করিতে পারেন। সে সকল সৌন্দর্য্য আমরা কবির কল্পনা ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাই না। ব্যাস ও বাল্মীকির দেবতা অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি, হোমরের এবং সেক্ষপীয়রের পরিমেল অসম্ভব সৌন্দর্য্যের উপমাস্থল। এই সকল সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অতীত হইলেও কবি তাঁহার কল্পনাপ্রভাবে আমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ইহার এমনি মোহিনী শক্তি যে সহজেই আমাদের মন ইহাতে আকৃষ্ট হয়, আমরা ক্ষণকালের জন্য যেন ইহলোক ত্যাগ করিয়া অসম্ভব-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন নূতনলোকে বিচরণ করিয়া বিস্মিত ও চমকিত হই। সৃষ্টির উপাদান হইতে রচিত হইলেও ইহাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যে কবির কাব্যে এইরূপ সৌন্দর্য্য নাই, তাঁহাকে আমরা প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। কবিবর মিলটন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত “প্যারাডাইস্ লষ্ট” কাব্যে এইরূপ অসম্ভব সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি করিয়াছেন

বলিয়া তিনি আজ হোমার ও ভর্জ্জিলের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট। এই সকল সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই হোমরের ইলিয়দ, মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট', ব্যাস ও বাল্মীকির 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণ' আজ মহাকাব্য বলিয়া সমাদৃত। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র আজকাল প্রতিনিয়তঃ যে সকল অজস্র কাব্য উদ্গীরণ করিতেছে তাহার মধ্যে 'বৃত্রসংহার ও 'মেঘনাদ বধের' এত আদর কেন? বাঙ্গালাভাষায় যদি কোন মহাকাব্য থাকে—তাহা বৃত্রসংহার, তাহা মেঘনাদবধ। আমরা যখন দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদিগের অমানুষিক ক্ষমতার বিষয় পাঠ করি, তখন আমাদিগের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, আমরা সাশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া থাকি। কিন্তু একজন চিত্রকরকে এরূপ অসম্ভব সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইলে তাঁহাকে কোনও কবির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার সৌন্দর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

এই পৃথিবী পাপ ও পুণ্য উভয়ের আবাসভূমি। প্রতি দেশে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, প্রতিগৃহে পাপ ও পুণ্য একত্র বিরাজ করিতেছে। অনেক কবি আছেন, তাঁহারা কখন পাপের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখান, কখন বা পুণ্যের শান্তমূর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু যে কবি পাপ ও পুণ্য এক রঙ্গভূমিতে আনিয়া পাপের উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন তিনিই প্রকৃত কবি নামের যোগ্য

পুণ্যের শান্ত উজ্জ্বল

যে কবি তাঁহার কাব্যে এতদুভয়ের চিত্র একত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই পাপ পুণ্য হইতে কত নিম্ন তাহা দেখাইবার কৌশল জানেন। কবি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট পাপমতি দুর্য্যোধনকে আনিয়া কেমন অল্পকথায় যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন: প্রশান্তমূর্ত্তি রামচন্দ্রের চিত্রের পার্শ্বে ঘোর নারকী রাবণের চিত্র আঁকিয়া কেমন সুন্দররূপে প্রথম চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টপরায়ণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এণ্টোনিওর চিত্র হইতে কুটিলতাপূর্ণ অর্থপিশাচ সাইলকের চিত্র কত নিম্নে অবস্থান করে তাহা আমরা সহজেই বোধগম্য করিতে পারি। কবি আমাদিগকে এই সকল চিত্র দেখাইয়া 'ধর্ম্মের সর্ব্বত্র জয়' এই উৎকৃষ্ট

নীতি শিক্ষা দেন। ইহা দ্বারা আমাদিগের সকল মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে। সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কখন ক্রোধে আমাদিগের শিরাশিরা কাঁপিতে থাকে, কখন আমরা সহানুভূতিতে গলিয়া যাই—প্রাণ কাঁদিয়া উঠে. আবার কখন বা কবির আশ্চর্য্য কৌশলে আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, মনে মনে সেই কবিকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি।

চিত্রকর ও এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে কাঁদাইতে ও হাসাইতে পারেন, তাঁহার নিকট ও আমরা অনেক নীতি শিক্ষা করিতে পারি। তিনি যদি সুনিপুণ হন, তাঁহার ও চিত্র দ্বারা আমাদের সকল মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, সমাজ কাহার নিকট অধিক পরিমাণে ঋণী। রাফেলের ন্যায় চিত্রকর যদি পৃথিবীতে না জন্মাইত, তাহা হইলে সমাজের যে কি ক্ষতি হইত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভর্জ্জিল, সেক্ষপীয়র, কালিদাসের ন্যায় কবি জন্ম গ্রহণ না করিলে সমাজ যে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি! ইংলণ্ড ইতালির ন্যায় উৎকৃষ্ট চিত্রকরের জন্মভূমি না হইলেও সেক্ষপীয়র, মিলটন প্রভৃতি [illegible] জন্মভূমি বলিয়া [illegible] ইতালি [illegible]ক। [illegible] চিরস্থায়ী নহে। চিত্র পোকায় কাটে, রং উঠিয়া যায়, তাহা সময়ের অধীন,—কিছুকাল পরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। চিত্রকরের যশঃসৌরভ শতশত বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার চিত্ররূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ কয়দিনের জন্য? কবির সে চিত্র চিরদিনের জন্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত থাকিবে, এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার কাব্যরূপ সেই অনন্ত কীর্ত্তি অনন্তকাল ব্যাপিয়া রহিবে। সময় শতচেষ্টা করিলেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

সাহিত্যের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। যে জাতি যতদূর সাহিত্যের উন্নতি করিতে পারিবে, সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে

ততদূর সম্মানিত হইবে। ইংলণ্ডের সাহিত্যভাণ্ডার তাহার অভ্যুদয়ের প্রধান সহায়। বাঙ্গালীর সাহিত্যভাণ্ডার তদ্রূপ নানা রত্নে উজ্জ্বল নয় বলিয়া পৃথিবীর অনেক জাতির অপেক্ষা তাহারা নিকৃষ্ট। বঙ্গবাসীরা যতই কেন বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করুন না, মাতৃভাষার উন্নতি না করিলে জাতিগত উন্নতি কখনই হইবে না। যতদিন বঙ্গভূমিতে কোন উৎকৃষ্ট কবি কিম্বা লেখক না জন্মিবে ততদিন বঙ্গের উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র!

প্রকৃতির শোভা কবির আদরের ধন। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলেই মোহিত হন এবং তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া জগতকে ও মোহিত করেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যময় দেশই তাঁহার জন্মভূমি। তুষারাবৃত ল্যাপ্‌লণ্ডদেশে বা আফ্‌রিকায় বালুময় মরুভূমিতে কয়জন কবি জন্মিয়াছেন? হইতে পারে, ঐ সকল দেশে কবিত্বপ্রতিভা বিশিষ্ট অনেক লোক জন্মিয়া থাকিবেন, কিন্তু তথায় স্বভাবসৌন্দর্য্য নাই, কে তাঁহাদের সে প্রতিভা উত্তেজিত করিবে? তাহাদের কবিত্বশক্তি তাহাদের হৃদয়ের মধ্যেই বিলীন হইয়াছে, জগত তাহার বিন্দুবিসর্গ ও জানিতে পারে নাই। প্রকৃতির লীলাস্থল ভারতভূমি তাই আজ অসংখ্য কবির জন্মভূমি। এপর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতীয় কবিরা তাঁহাদের অপেক্ষা কোন ও অংশে ন্যূন নহে।

এস্থলে কবির বিষয় যাহা কিছু বলা হইল, চিত্রকরের পক্ষে ও অবিকল সেইরূপ। তাঁহার ও কবির ন্যায় প্রকৃতিগতপ্রাণ, কিন্তু যে ভারতবর্ষ বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস ভবভূতি, মাঘ ভারবী, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি অসংখ্য কবির জন্মভূমি—সে ভারতবর্ষে তাদৃশ সুনিপুণ চিত্রকর একজনও জন্মগ্রহণ করে নাই ইহার কারণ কি? এ কূট প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ের গভীরতা ও ভাবুকতাই ইহার প্রধান কারণ। ভারতবাসীর ন্যায় গম্ভীর চিন্তাশীল জাতি পৃথিবীর কোন ও অংশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

—০:০—

বাল্যে, কৈশোরে গল্পচ্ছলে যে কথা আমরা শুনিয়াছিলাম—কাব্যে, ইতিহাসে, পুরাণে এতদিন ধরিয়া যাহা আমরা পাঠ করিয়া আসিলাম আজ তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। দুরান্ত ক্রূরহৃদয় প্রচণ্ড দৈত্যকুলে ধীর-প্রকৃতি মধুরস্বভাব ধর্ম্মভীরু প্রহ্লাদের জন্ম! যে দৈত্যেরা দেবতার নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে, সেই দৈত্যবংশে জন্মিয়া আজ কি না প্রহ্লাদ দেবতার গুণগানে উন্মত্ত! অমরাবতী আমাদিগের করতলগত—দেবতারা বিজিত, বশীকৃত, স্বর্গচ্যুত, তাহাদিগের আবার অধিকার কি? আমাদিগের পাদুকাবহন করাই তাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত; সন্তুষ্ট হইয়া আমরা যাহা একমুষ্টি খাইতে দিব তাহাতেই তাহাদিগকে উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে। আমরা জেতা—আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, তাহাতে তাহাদিগের কথা কহিবার ক্ষমতা কি? তাহাদিগের অশেষ কষ্ট হইতে পারে, নানা যন্ত্রণা ভোগ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমাদিগের সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদিত হইলেই হইল। যে সুরারিগণের ইহাই একমাত্র সংকল্প—ইহাই যাহাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সেই বংশে জন্মিয়া কি না প্রহ্লাদ আজ দেবগণের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত!—ভয়ানক কথা! অবোধ প্রহ্লাদ, জান না যে তুমি এখনি হস্তিপদতলে বা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। ভরসা করি, সভ্যতালোকসম্পন্ন এই উনবিংশ শতাব্দীতে সে রূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হইবে না। হইলেও, ভরসা করি, প্রহ্লাদ একবার যাহা বলিয়াছে আর সে বাক্য পরিত্যাগ করিবে না। দৈত্যগণ শতচেষ্টা করিলেও তাহাকে সে বুলি ছাড়াইতে পারিবে না।

যাহা হউক, ইংরাজকুলে জন্মিয়া—ইংরাজদিগের মধ্যে বাস করিয়া যে কেহ ভারতবাসীর জন্য কিছু বলে শুনিয়া বড় আহ্লাদ হয়। ফসেট, ব্রাইট, প্রভৃতি মহাত্মাগণ অনেক কথা বলিয়াছেন—চীৎকার করিয়া অনেক

ধার গলা ভাঙ্গিয়াছেন; কিন্তু সে চীৎকারের ফল হইল কি? ফল? অরণ্যে রোদনের আর ফল কি?——

"—বিজন বনে, কাঁদে গো কাতর মনে,
কেবা বল তায় শোনে, বাতাসে ভাসিয়া যায়।"

—সে সমস্ত কথা বাতাসেই বিলীন হইয়াছে। আবার, ইনি কে Nineteenth Century পত্র মধ্যে এ আবার কাহার লেখনী তাড়না? ভারতবাসীরা যে রাজভক্ত এ কথা আমরা এতদিন শুনি নাই, শুনিলেও আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ আবার গভীরনাদে কে একথা শুনাইলেন? ধন্য! মহামতি হাইণ্ডম্যান, তোমায় শত শত ধন্যবাদ। তোমার উদার বাক্যের জন্য ভারত তোমায় সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছে। কিন্তু, কেন এ সকল কথা? তোমার এ কথা কে শুনিবে? শুনিলেই বা তাহা কে গ্রাহ্য করিবে? দুঃখিনী ভারতের জন্য যদি একান্তই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তবে প্রভুত্বমদদৃপ্ত লোলায়িতচক্ষু ভ্রূকুটীকুটিলানন ইংরাজকুল মধ্যে থাকিয়া কেন? জান না কি এখনি তোমার ভারতবিদ্বেষীগণের বিষনয়নে নিপতিত হইবে।

কিন্তু, না। তাই বলিয়া কি তুমি সংযতবাক্ [illegible] অবলম্বন করিবে? যথার্থই যদি ব্যথার ব্যথিত হও, তাই ব[illegible] কথা মনে চাপিয়া রাখিবে? না। ঐ শুন, তোমারই [illegible] করিয়া তোমারই [illegible] প্রসন্নবদনে নর্থব্রুক বলিতেছেন কি বলিতেছেন। ভারতে বাস করিয়া—একাদিক্রমে চারিবৎসর ভারতে থাকিয়া ভারতের রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছেন, ঐ শুন, কেমন প্রফুল্লমুখে—কেমন অকম্পিতস্বরে নর্থব্রুক তাহা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিতেছেন! ধন্য! নর্থব্রুক, তোমায় ও শত শত ধন্যবাদ! তুমি কলঙ্কী বটে, তোমার ভারত শাসন ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত বটে, কিন্তু তথাপি তোমার উদার বাক্যের জন্য ভারত তোমার প্রশংসা করিতেছে। অন্যদেশ হইলে কি করিত জানি না, অন্য জাতি হইলে তোমার আজিকার একথা শুনিয়া কি মনে ভাবিত জানি না—তাহা জানিতেও চাহি না। ভারত সে দেশ নয়, ভরতীয়েরা সে জাতি নহে।——

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।"

—একথা ভারতের কবির। তোমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভারত সন্তুষ্ট হইয়াছে। তোমার গুণগরিমায় ভারত সে দোষ ভুলিয়াছে। আজ তোমায় মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতেছে।

বল, হাইওম্যানের স্বরে স্বর মিশাইয়া বল—ভারত রাজভক্ত। বল, তোমাদের ঐ জলদগম্ভীর শ্রবণবিদারী ভৈরব নিঃস্বনে বল—ভারত রাজভক্ত। আর, ইংরাজ! তুমি ও শুন—পায়োনিয়ারের দল! তোমরা ও কষায়িতলোচন অপাঙ্গভঙ্গী দূরে রাখিয়া একবার ধীরকর্ণে, স্থিরমনে নিবিষ্টচিত্তে শুন—শুন ঐ তোমারই কয়জন স্বদেশীয়—সোদর উন্নতকণ্ঠে স্বরের লহরী তুলিয়া কি বলিতেছেন——ভারত রাজভক্ত! ভারত কৃতজ্ঞ! ভারত প্রভুপরায়ণ!

ইংরাজ! তবুও কি তুমি বুঝিবে না? এতদেও কি বুঝিবে না ভারতবাসীরা কতদূর প্রভুপরায়ণ। পূর্ব্বপিতামহ মনু হইতে যে ভারতবাসীরা বরাবর বলিয়া আসিতেছে—

"সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্"

—তবুও কি বুঝিতে পারিবে না তাহাদিগের রাজভক্তি কিরূপ অচলা! দিনা খাইয়া অতি সামান্য মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে পরিতুষ্ট হইয়া যে ভারত প্রতি বৎসর অকাতরে দূরদ্বীপে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করিতেছে,—বালকের ক্রীড়াকন্দুক দুই একটা উপাধি পাইয়া হাসিতে হাসিতে যে ভারত সে দিন যুবরাজপদে অঞ্জলি পূরিয়া অজস্র রত্ন ঢালিয়া দিল— ছিঃ! সেই ভারতের রাজভক্তির উপর আবার সন্দিহান! দূরে—সাগরপারে বসিয়া তোমরা যখনি যাহা আজ্ঞা করিতেছ, শতকষ্টকে তুচ্ছ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ভারত তাহা প্রতিপালন করিতেছে— ছিঃ! তবুও তাহাকে প্রত্যয় হইল না। ভারতের খাইয়া ভারতে বসিয়া মেকলে অত কটু কাটব্য বলিল—নিঃশব্দে আপনার ভাগ্য ভাবিয়া ভারত তাহা সকলি মস্তকে পাতিয়া লইল, তবু—তবুও তাহাকে অবিশ্বাস!

মাত্র তাহাই নহে। "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি"— একথা বড়

মিছা নয়। একবার একদিকে একটু মন্দ হইলে আর কোনদিকে ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই। কি কুগ্রহেই ক্লাইভ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন! এখন ও ভারতের সে গ্রহশান্তি হইল না। সে অবধি আর তাহার কোন দিকেই ভদ্রস্থতা নাই। এত করিয়াও ভারত প্রভুর মন পাইল না। এখনও তাহাদিগের চক্ষে ভারত অবিশ্বাসী! আবার শুনিতে পাই ভারত নাকি ইংলণ্ডের গলগ্রহ! সে দিবস Contemporary Review নামক মাসিক পত্রে গ্রাণ্ট এ্যালেন অশেষ যুক্তি দেখাইয়া স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন ইংলণ্ডের ভারতরক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। হাসিও পায়, দুঃখে হৃদয়ও ফাটিয়া যায়—যে ভারত বৎসরে ২০ কোটী টাকা গণিয়া দেয় সেই ভারত আজ ইংলণ্ডের গলগ্রহ! বিলাতে এরূপ কূটদর্শী রাজনীতিজ্ঞ কয়জন লোকের বাস? কয়জন এরূপ অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছেন! ইংলণ্ডের ভারত-বাণিজ্য সম্বন্ধে এ্যালেন অনেক কথা বলিয়াছেন—সে বড় হাস্যের কথা। ভালইতো যাহা বলিয়াছেন তাহা হউক না, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব, আশীর্ব্বাদ করিব ভারত তো তাহা হইলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। সে তো ভারতের শুভগ্রহ। কিন্তু, অ্যালেন! একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, সে সময় ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুলে যে দুঃখের স্রোতঃ বহিবে তাহাতে তোমার ঐ অদ্ভুত যুক্তি কোথায় ভাসিয়া যাইবে?—একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, ঐ যে তোমার জন্ ও টমসের দল হতভাগ্য অর্দ্ধপুষ্ট গরিব ভৃত্যকে পদাঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া দম্ভভরে গুম্ফের অন্তরাল হইতে মৃদুমন্দ হাস্যের স্নিগ্ধরশ্মি ছড়াইতে ছড়াইতে ঘর্ঘরচক্র শকটে আরোহণ করিয়া ভজনালয়ে গমন করিতেছেন, আজ যদি ভারত ইংলণ্ডের অনধীন হয় তাহা হইলে উহাদের দুঃখে যখন বনের শৃগাল কুকুর পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকিবে তখন সে রোলের মধ্যে তোমার ঐ অদ্ভুত যুক্তি কোথায় লয় পাইবে?

তোমরা কয়দিন বা এখানে আসিয়াছ? একশত বর্ষ বৈ নয়। কিন্তু ছয় শত বৎসর ধরিয়া যবনেরা যখন এই ভারতে একাধিপত্য করিয়াছিল—সিন্ধুদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত হিমালয় হইতে কুমারিকা অবধি যখন ভারতের সীমান্ত হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল তখন তো

তাহারা ভারতকে এত ভার বোধ করিত না—এত অবিশ্বাস করিত না। মুসলমানদিগকে তোমরা অসভ্য, অত্যাচারী, উৎপীড়ক বলিতে পার, বল—স্বীকার করিব। কিন্তু তাহারা এত সন্দিগ্ধমনা ছিল না। আজ তোমরা ভারতবাসীকে একটী সামান্য পদ দিতে ঈর্ষায় ফাটিয়া যাও, আকাশ পাতাল ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় সমস্ত উচ্চপদে প্রায় ভারতবাসীরই অধিকার ছিল। সুবিস্তীর্ণ মোগল সম্রাজ্যের সেনানায়ক—অম্বরাধিপতি মানসিংহ। রাজস্বমন্ত্রী—রাজা টোডরমল্ল। মোগল তো নামে রাজা মাত্র। আর আজ তোমরা সহস্র শিক্ষিত হইলে ও আইনের সাহায্যে সে সমস্ত উচ্চপদ হইতে ভারতবাসিকে দূরে রাখিয়া দিয়াছ। মুসলমানরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবেতনভোগ ভারতভাগ্য হইতে তিরস্কৃত হইয়াছে। নীলকর, চা-কর ন্যায় তোমরা বেতন-কর হইয়া উঠিয়াছ. একজন এণ্ডরুর প্রপৌত্রের বেতন বৃদ্ধির জন্য সহস্র ভারতবাসীর অন্ন মারিতেছ। Bombay Gazette সে দিন অমন করিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলে ও তোমরা ভারতের সাশ্রয় করিবার ভাণ করিয়া ত্রিংশৎ-মুদ্রাজীবী চাকরিগতপ্রাণ দুর্বল ভারতবাসির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছ; আর ডেভিড্ মাসান্তে প্রণয়িণী মিসেস্ ডিভিডের হস্তে হাসিতে হাসিতে তিন সহস্র মুদ্রা গণিয়া দিতেছেন। আইনের বলে একজন সামান্য ফিরিঙ্গীর স্বার্থমন্দিরে সহস্র ভারতবাসীর ধন প্রাণ অবহেলে বলি দিতেছ। কিন্তু কে এত যে করিতেছ তাহাতে কি তোমাদিগকে কেহ কিছু বলিয়াছে? যাহা যখন করিতেছ, তাহাই তখন শোভা পাইতেছে। তবু ও ভারত মন্দ! তবু ও তাহাকে অবিশ্বাস!

কিন্তু, আর ও কি বলিতেছিলাম?—ভারতের সেই রাজভক্তির কথা। মুসলমানরাজত্বের সময় তাহার তো চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়াছ। ইতিহাস এখন ও তাঁ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মোগলরাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, ক্ষত্রিয়কুলের দুর্গস্বরূপ বৃদ্ধ জয়সিংহ দুর্মতি আরঙ্গজেবের কুটিল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ও কিরূপে হাসিতে হাসিতে প্রভুর কার্য্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা তো কাহার ও অবিদিত নাই। দেখিয়াছ তো, অসভ্য অত্যাচারী যবনের অধীনে থাকিয়াও ভারত কিরূপ রাজভক্ত।

আর এই যে সে দিন তোমরা একটীবার তর্জ্জনী হেলাইবা মাত্র বরদায় হাহাকার পড়িয়া গেল —কৈ কয়জনে তাহা লইয়া আন্দোলন করিল? কয়জনে কটা কথা বলিল? আর ইহা যদি অন্যত্র হইত—তোমাদিগের সুসভ্য ইয়ুরোপে যদি এই ঘটনা সংঘটিত হইত!—হরি হরি হরি! নিহিলিষ্ট গণের ভয়ে রুষরাজ আজ সশঙ্কিত! আয়র্লণ্ডে আজ থরহরিকম্প!—যাউক। কিন্তু ভারত তেমন নয়, সে জানে তোমরা তাহার রাজা। জানে, "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।"—রাজা যাহা করিয়াছেন তাহা দেবকার্য্য। বলিতে পার, ভারতীয়েরা ভীরু, কাপুরুষ——উত্তম কথা। কিন্তু তাহারা বিশ্বাসঘাতক নয়—রাজবিরোধী নয়। রাজার বিপক্ষ হইয়া কি করিবে? আজ তোমরা চলিয়া যাও কাল অন্য একজন আসিবে। যবনেরা চলিয়া গিয়াছে তোমরা আসিয়াছ, আর কালে অধিকতর পরাক্রান্ত অন্য একজন তোমাদিগের স্থলে আসিবে। ভারত এখন চিরকালের জন্য পরাধীন—পরভোগ্য। ভারতবাসীদিগকে এখন চিরকালের জন্য পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হইবে—পরের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে। ভারতবাসীরা রাজবিরোধী নয়।

ভারতের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাহা নহিলে এতদিনেও তোমরা ইহা বুঝিলেনা কেন? যে জাতি এখন জগতে বুদ্ধিজীবী বলিয়া খ্যাত তাহা নহিলে এততেও এই সামান্য কথা তাহাদিগের বোধগম্য হইল না কিজন্য হায়! কবে বুঝিবে? কে বুঝাইয়া দিবে? ভারতের হইয়া হাইওম্যান নর্থব্রুকের ন্যায় আবার সে সকল কথা কে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে জানি না, তাহা হইলে ও বুঝিতে পারিবে কি না।

তাহা না হইলে—এখন ও না বুঝিলে ভারতের আর মঙ্গল নাই। তোমাদের কি? সন্দেহ জন্মিল, অবিশ্বাস হইল——হাতে না মার ভাতে মারিলে। টেক্সের উপর টেক্স বসাইলে, দণ্ডবিধি আইনের যত কিছু ধারা থাকিতে পারে সকলি তাহার উপর চাপাইলে, একটীবার ভ্রূভঙ্গী করিবামাত্র তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিলে——গরিব বেচারী প্রজা জন্মের মত উৎসন্ন গেল। কিন্তু, রাজনীতিশাস্ত্রের এরূপ নিয়ম নয়। তোমরা সুসভ্য বলিয়া অভিমান কর, সাম্যতত্ত্ব তোমাদিগের অবিদিত নাই।—শ্বেত কৃষ্ণে

এক প্রভেদ তোমাদের চক্ষে ভাল দেখায় না। রাজায় প্রজায় এরূপ অসদ্ভাব—বড় দোষের কথা। অধিক বলি না, বলিবার আকাঙ্খা ও করি না তোমাদের নীতিশাস্ত্র যাহা বলে তাহাই কর। দেখিবে, ভারত কত দূর রাজভক্ত। দেখিবে, ভারতবাসী প্রাণ দিয়া ও কিরূপে প্রভুর কার্য্য সাধন করে। তখন বুঝিতে পারিবে, দৈত্যকুলে জন্মিয়া প্রহ্লাদ বৃথায় দেবগণের গুণগান করে নাই। হাইওম্যান ও নর্থব্রুক যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ কথা—তাহা অভ্রান্ত সত্য।

ভারতোন্নতি বিপ্লব।

—000—

এই উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে শীর্ষ-সন্নিবেশিত প্রস্তাবাবতরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে তিনি কোন নূতন বিষয় লিখিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিবেন অথবা চর্ব্বিতচর্ব্বণভোজী উপাধি সম্মানিত হইয়া নবাবিষ্কৃত পন্থাবলম্বন করিয়া কৃতবিদ্যসমাজে সুলেখক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। যেহেতু আজ কাল বঙ্গীয় লেখকের অভাব নাই। ইঁহারা দিবানিশি বঙ্গ-সাহিত্য-সাগর মন্থন করিতেছেন। সুধা বিষ দুই পান করিতেছেন—মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই গুলি উদ্গীরণ করিয়া সাধারণে প্রসাদ দিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল লেখকই সমাজ-সংস্করণ-প্রবণ-হৃদয় অথবা স্বাধীনতা-লালসাসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বে

সকল যুবার উষ্ণ মস্তিষ্ক অদ্যাপি সংসার-বায়ু-হিল্লোলে সুশীতল হয় নাই ; যাঁহাদের চিন্তা-সরোবরে আশা উৎস প্রস্ফুরিত হইয়া সমাজকে সংস্কৃত, উন্নত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে চান ; যাঁহারা কল্পনা-কাননে বিচরণ করিতে করিতে সংসার অতি মনোহর বস্তু বলিয়া অনুমান করেন ; যাঁহার কল্পনাচক্ষে আপনাদিগকে হানিবল অথবা ওয়াসিংটন, আলেকজেণ্ডর অথবা নেপোলিয়ানের মত বীর, ম্যাট্‌সিনি অথবা ফিলানিভ্রাতৃদ্বয়-সদৃশ স্বদেশানুরাগী, থিমিষ্ট ক্লিস্ অথবা অ্যারিসটাইডিসের ন্যায় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ, শাক্যমুনি অথবা মাহম্মদ, খ্রীষ্ট অথবা নানকের তুল্য সমাজ সংস্কারক মনে করেন ; যাঁহারা কল্পনাবলে যশঃসৌধের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণাভিলাষী হন তাঁহারাই এই অবলম্বনশূন্য ভারতগগণে স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে কৃত সংকল্প, তাঁহারাই দৈবদুর্ব্বিপাকসঙ্কুল মহাকালের প্রবল বাত্যায় ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত শিথিলবন্ধন ভারতসমাজকে সুদৃঢ় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহারাই সমাজসংস্কারণ অথবা স্বাধীনতাউদ্দীপক প্রবন্ধ লেখক। যত দিন তাঁহাদের কার্য্যসাধন প্রণালী অনুমান খণ্ডের সূত্র সমূহকে অতিক্রম না করে, যত দিন তাঁহাদের পুস্তকাধিত নিয়মাবলী কার্য্যে প্রযুক্ত না হয়, ততদিনই তাঁহাদের অধ্যবসায়, ততদিনই তাঁহাদেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু যে হইতে তাঁহারা সংসার নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া জীবন নাটকের অঙ্কে অঙ্কে দ্বেষপূর্ণ, হিংসা সমন্বিত, স্বার্থপরতামিশ্রিত জটিল অংশ সকল অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি তাঁহাদেব জীবন্ত অধ্যবসায়, অটল ধৈর্য্য, অজেয় বীরত্ব সকলই ক্ষীণপ্রাণ হইয়া আসিতে লাগিল। যে সংস্কারবলে তাঁহারা এত দিন দুঃসাধ্য সাধন সুসাধ্য জ্ঞান করিতেন, যে সংস্কারবলে তাঁহারা জন সাধারণের শুভানুধ্যান করিতে কৃতনিশ্চয় হইতেন এত দিনে তাঁহাদের সেই সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া উপলব্ধি হইল। সমাজসংস্করণ, জাতীয় জীবনের উন্নতি, স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা প্রভৃতি সকল আশা সকল বাসনা সংসার স্রোতের প্রতিকূলপ্রবাহে ভাসমান হইল।

আর যাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে, সৌভাগ্য বলে এরূপে সংসারে লিপ্ত হইয়াও সকল প্রকার বিপদের দুর্নিবার্য্য আক্রমণেও অটল ভাবে অবস্থিতি করেন ;

স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশীয়দিগের মঙ্গলসাধন যাঁহাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য তাঁহাদের প্রদর্শিত কার্য্যসূত্রের অনুবর্ত্তন করাই আমাদের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য। দেশের উন্নতি সাধন, সমাজ সংস্করণ অথবা স্বতন্ত্রতাবলম্বন সম্বন্ধে কত মহাপুরুষ কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ কেহ জলদগম্ভীর স্বরে কৃতবিদ্যগণের কঠিন হৃদয় আর্দ্র করিলেন—স্বকীয় তেজস্বিতা, সুবাগ্মিতা ও সদযুক্তিবলে বিবিধোপায় অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন—একতাসূত্রে আবদ্ধ, আত্ম নির্ভর, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি সমাজ সংস্করণের ও দেশের উন্নতি সাধনের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ গুলিকে সাবধান করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইলেন। কেহ কেহ বা নিশার্দ্ধভাগ জাগিয়া, স্বীয় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া, কত বিজ্ঞান ও কত দর্শন মন্থনের পর তন্নিহিত তথ্য সাধারণ্যে প্রচার করিলেন—"জ্ঞানই মনুষ্যের প্রকৃত বল, বাণিজ্যই লক্ষ্মীর আবাসস্থল, কৃষি ও শিল্প সৌভাগ্যের নিকেতন, প্রতিযোগিতাই উন্নতির ভিত্তিভূমি।"

যিনি যে প্রকার উপদেশ দিন না, মূলে উৎসাহ ও উদ্দীপনা না থাকিলে কোন কার্য্যেরই অভ্যুদয় নাই। ত্যাগস্বীকারকৃপণ হইয়া কে, কোন কালে সমাজ সংস্করণ, নূতন সত্যের আবিষ্কার অথবা দেশকে অধীনতা-শৃঙ্খল বিরিতে সমর্থ হইয়াছেন? গ্যালেলিয়োর কঠোর কারা-বাস, সক্রেটিসের বিষপানে প্রাণত্যাগ, জোসেফ ম্যাটসিনির দুর্ব্বিষহ নির্য্যাতন প্রভৃতি ঘটনাবলী এরূপ বিষয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতের উদ্দীপন-হীনতা—একপ্রাণতার অন্তরায়, ধর্ম্ম বিষয়ে মতপার্থক্য সহানুভূতিপ্রকাশের অপ্রতিপোষক, জাতিগত বিদ্বেষ ভাব অনৈক্যের অমোঘ বীজ এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন বৃথা গর্ব্ব জাতীয়জীবনপরিণতিপরিপন্থী। যত দিন ভারতে জীবন্ত উদ্দীপনা, ধর্ম্মৈকমততা, জাতিগতসৌহৃদ্য এবং সমাজ সংস্কারের বিমল জ্যোতিঃ প্রতিফলিত না হইবে,—যত দিন এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয়, অপরিহার্য্য উপকরণ গুলির অভাব থাকিবে ততদিন ভারত! "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" ততদিন তুমি অনুন্নত মস্তকে ভূতলন্যস্তজানু হইয়া "পদধূলি মস্তকে লেপন" করিবে, যৎসামান্যরূপ

জীবনধারণোপযোগী উদরান্নের জন্য লালায়িত হইবে, যথাকথঞ্চিৎরূপে লজ্জানিবারক আচ্ছাদনের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। টাইবর তীরবর্ত্তী রোমনগরী যাহার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, আজ কি না সেই ভারতের এই দুর্দশা—ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়। অভাবোপলব্ধি নূতন সত্যাবিষ্ক্রিয়ার মূলস্বরূপ এই জন্য বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ ফিনিসিয়েরা জ্যোতির্বিদ্যায় এতদূর উন্নত, শীতপ্রপীড়িত শ্বেতদ্বীপবাসীরা এত শিল্পকুশল, তুর্কিলুণ্ঠন ভয়ে, ভীত চীনবাসীরা স্থপতি বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী। ভারতে সকল অভাবই আছে অথচ অভাব মোচনের চেষ্টা নাই। আমেরিকা নূতন বলে বলীয়ান, নবাভ্যুদয়ে উল্লসমান, ইংলণ্ডের অধীনতাশৃঙ্খল ছেদন করিল—প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রতিযোগিতারণে বিজ্ঞানে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিল। ভারত জাতি ভিক্ষুক, ভিক্ষাপাত্রধারী, স্বর্ণ সৌধে হীরক শৃঙ্খলে বদ্ধপদ—তাহার আবার প্রতিযোগিতা কোথায়? ধন্য শ্রমশীল সমুদ্র গর্ভবাসী হল্যাণ্ডাধিবাসিগণ! তোমাদের পরিশ্রম, তোমাদের অধ্যবসায়-ইন্দ্রজালের নিকট প্রকৃতি স্বয়ং পরাজিতা, সমুদ্র ভয়ে দূরে অবস্থিত, তত্তীরস্থ বালুকারাশিও স্বকীয় সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া ফল শস্য প্রদানে নিরত। আর ভারত। সমস্ত রত্নের ভাণ্ডার—সমস্ত সুখের আগার—সমস্ত জীবের আহার দাতা হইয়াও না। তুমি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত তোমার সন্তানগণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত।

ভারতের অবনতির আর একটী প্রধান কারণ দেদীপ্যমান, যতদিন এই প্রধান উন্নতি-অন্তরায়ের মূলোচ্ছেদ না হইবে ততদিন ভারতের ভাগ্য বিপ্লব তিরোহিত হইবে না। এই উনবিংশ শতাব্দিতে যে জাতি সভ্যতা সোপানারূঢ়—যাহাদের বীরত্বে, যাহাদের পরাক্রমে সমস্ত পৃথিবী টলমল করিতেছে সেই জাতির শিক্ষা প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমাদের দেশে আদৌ উচ্চ শিক্ষার অভাব রহিয়াছে অধিকন্তু সাধারণের শিক্ষার পথ নিতান্ত অপ্রশস্ত, অথবা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠতম কবি—যাঁহার কবিতাবল্লরীর মধুময় প্রসূন বিকসিত হইয়া সৌরভে জগত আমোদিত করিয়াছে, যিনি কবিত্ব বলে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই কাব্যোদ্যানের বসন্তপিক সেক্স

পিয়রের কুল পরিচয় দিলে কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে নিম্নশ্রেণী—শিক্ষাপ্রদানে কোন ফল নাই। কেবল ইংলণ্ড কেন—জর্ম্মেনি, প্রুসিয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্যতম দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে এই সকল দেশের শিক্ষা প্রণালী কেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। একজন বিখ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা বলেন যে "নিতান্ত জড়বুদ্ধি অথবা চিরকাল মুর্খ হইয়া থাকিবে বলিয়া দৃঢপ্রতিজ্ঞ না হইলে জন্মনিতে অপর সাধারণ সকলেই অন্ততঃ একরূপ লিখন, পঠন ও অঙ্ক শিক্ষা করিতে পারে।"

প্রুসিয়ারাজ্যে বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও অনুরাগ,—এমন আর কোথাও নাই। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কি ধনী কি নির্ধন সকলকেই রাজনিয়মে বাধ্য হইয়া অস্ত্র ও বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতে অদ্যাপি একটী ও অবৈতনিক কিম্বা দরিদ্র সন্তানদিগের শিক্ষোপযোগী একটী ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় নাই। লর্ড বেকনের মত——"জ্ঞানই প্রকৃত বল"——যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতের প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোকের মানসিক বৃত্তি পরিচালনের সুবিধা করান আবশ্যক। সুতরাং ভারতের প্রতি পল্লীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের ভাবি বংশাবলীর মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে প্রাণপণে দৃঢ় যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হুক্কা।

"হুক্কেয়ং নবকামিনীব কলং ক্রুতে চুম্বিতা"।

——০◯০——

হে হুক্কে! হে তম্রানলবিভূষণে স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষিণি নবজলদপটল-দাম্রভধমরাশিসমদ্গারিণি হুক্কে! তুমি কে? দেবী না মানবী, অপ্সরী

না কিন্নরী? তুমি কে? তুমি সচলা না অচলা?—বিজ্ঞানবিদ্ হয়ত তোমাকে নিশ্চেষ্ট জড়পদার্থ স্থির করিবেন, তাঁহার বিজ্ঞানের মুখে ছাই প'ড়ুক। তুমি যদি জড় তবে অজড় কে? জড় হইলে তো তোমার ঐ সুন্দর কলধ্বনি আসিল কোথা হইতে? জড়পদার্থের কি এমন বাক্‌শক্তি সম্ভবে? তা তো নয়, তুমি কে আমায় বলিয়া দাও—আমরা মূঢ় নর তোমারও মহিমা কি বুঝিব? তুমি পুরুষ না প্রকৃতি, নর না নারী? বৈয়াকরণ এখনি আর্কফলা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিবেন—"আকারং স্ত্রীত্ববাচকম্" সে কথা কি সত্য? আমার টোলে পড়া নাই, পাণিনি কি মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়াইতে আওড়াইতে কখনও আমার মুখ কেশ-পুঞ্জসম্ভূষিত হয় নাই; ব্যাকরণের 'ক' জানি না——সত্যই কি তুমি স্ত্রী? আকার দেখিলেই যদি স্ত্রী বলা যায় তবে তোমার আকার দেখিয়া বোধ হয় বটে, তুমি স্ত্রীলোক---তুমি আমাদের বঙ্গসুন্দরী।

তোমার ঝালরঝলমলিত আনলপাত কলিকাকীরিট দেখিলেই গৃহিণীর সেই সজিজিরহেয়ারপিণপরিশোভিত ফিরিঙ্গি খোঁপার কথা মনে পড়ে, তোমার ঐ অমলধবল রৌপ্যবিজড়িত মুখনল দেখিলেই তাহার অধরপ্রান্তস্থ দোদুল্যমান নলকের কথা মনে জাগিয়া উঠে। আর সে দিন মধুবাবুর বাড়ী কীর্ত্তনের সময় দলবলে স... সভামধ্যে গিয়া বৈঠকাসনে যখন তোমরা বিরাজ করি... সেই যে চিকের ভিতর সর্ব্বাঙ্গভূষণা কামিনীকুল হাসিয়া হাসিয়া ... লহরী ছড়াইতেছিলেন, সে সময় তোমাদিগের দুই দলকেই তো আমার সমান জ্ঞান হইয়াছিল। বৈয়াকরণ মিথ্যা বলেন নাই—আকারে তুমি স্ত্রীলোক বটে, প্রকারেও ঠিক তাই।

রসিক মহলেই তোমাদিগের আদর। অরসিক ভট্টাচার্য্য দিবারাত্র "ভট্টি" পড়িয়া মারা গেলেন; তাঁহার এমন অবসর নাই যে দুই দণ্ড গৃহিণীর সহিত দুটা কথা কহিয়া উষ্ণমস্তিষ্ক শীতল করিবেন, একবার হুক্কার মধুর চুম্বনে প্রাণটা জুড়াইবেন। অরসিকে তোমাদিগের মর্ম্ম বুঝেনা, তোমরাও তাহাদিগকে 'কেয়ার' কর না। তাহা নহিলে অরসি-কের নিকট তোমার দর্শন এত দুর্ল্লভ কেন? তাহা নহিলেইবা সে দি

যে ঘোষেদের কামিনী হৃদয বাবুর সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া কত কথা কহিল, হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পডিল, সে আজ বৃদ্ধ নব চাটুর্য্যেকে দেখিযা দেড়হাত ঘোমটা দিযা চলিযা গেল কেন? আর একটী লক্ষণ—তোমাব ভিতবে স্নিগ্ধ শীতল অম্বুবাশি, কিন্তু বাহিবেব আবরণ বঁড কঠিন, নবীনা যুবতী ও ঠিক্ সেইরূপ, বুকফাটে তো মুখ ফুটে না, বাহিবে বড কঠিন —কার সাধ্য কিছু বলে? কিন্তু যদি একবার যো বা কবিয়া ভিতবে যাইতে পাব তবেই জানিতে পাবিবে কত কোমল—কত মধুব, যতই প্রবেশ কবিবে ততই লোলবস স্ত্রীলোকেব এই চিবন্তন স্বভাব।

আব, হে শ্রুতিমধুবভুডভুডবুডবড মৃদুমন্দকলনাদিনি! বলিতে পাব, তোমাব ঐ কলধ্বনি শুনিলেই অস্ফুটবাচা প্রণযিণার প্রেমকথা গুলি শুনিতে এত ইচ্ছা কবে কেন? বংশীবব শুনিবামাত্র রাধিকার শীকৃষ্ণকে মনে পডিত, আব তোমাব ঐ রব শুনিলেই বামেব বাপেব বামের মাকে মনে পডে কেন? তোমাব ঐ কলকলধ্বনি কি মন্ত্রে সাধা! নবীনা বসবতীব ন্যায চুম্বনমাত্রই ঐ মৃদুমধুব কলধ্বনি কবিযা কর্ণ পবি-তৃপ্ত কব——এবব কোথায় পাইলে? তুমি কেবল রূপসী নও, কলকণ্ঠী—মধুবভাষিণী। তা নহিলে যুবতী বমণীব মোহন কণ্ঠেব ন্যায অথবা স্বয়ং রূপচাঁদ স্বর্ণকাবেব স্বহস্তরচিত রৌপ্যবিনির্ম্মিত সেই চরণপবিধিত মলের শব্দের ন্যায় তোমাব ঐ মধুর শব্দে মন এত বিচলিত হয় কি ... —হে বমণীরূপানুকাবিণি! তুমি যথার্থই কি আমাদিগেব সেই বঙ্গ- ... তোমায় দেখি বা না দেখি রূপসী যুবতীব নাম শ্রবণেব ন্যায় ...ার নাম শুনিলেই মন এত উৎকলিকাকুল হয় কেন? কখন পাইব কখন পাইব—ভাবিযা প্রাণ কেন এত ব্যাকুল হইয়া উঠে? আবার অনেক কষ্টের পব পাইলে স্পর্শমাত্র এত প্রমোদ জন্মাব কেন? কিন্তু হায়! সংসাবেব কি অসম্পূর্ণ অবস্থা! যাহা কিছু দেখি তাহা ... করিয়া ভোগ কবা যায় না। সকল বিষয়েই বিঘ্ন।—কুসুমে কীট, ... সর্পবাস, অমৃতে গরল, মৃণালে কণ্টক। যদি অনেক ... কবি... অনেক আরা ধনার পব তোমায় পাই তো হব আগুন হ'লোনা নয় নল বুজিয়া গেল —এইরূপ কত ব্যাঘাত আসিযা উপস্থিত হব। শ্যামেব বাপ যখন

শ্যামের মাকে বিবাহ করিয়াছিল তখন ও আজ মুখভার, কাল অভিমান, —ইত্যাকার কত বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। যদি বড় রসগ্রাহী হইলে তো অন্য আগুণ দিয়া অথবা কাটী দিয়া নল পরিষ্কার করিয়া আবার ভাল করিয়া তামাক খাইতে বসিলে। তেমনি যদি রসিক হইলে তো আবার মুখ খানিতে প্রফুল্লতা প্রজ্বলিত করিয়া অথবা —
"স্মর গরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লব মুদারম।"
—বলিয়া চরণে ধরিয়া সাধিয়া মান ভাঙ্গিয়া সুখের আশা করিতে লাগিলে। কিন্তু, মিষ্ট কথায় কি হইয়া থাকে? ভাল কথায় এসংসারে কে কবে আপনার কার্য্য সাধিতে পারিয়াছে? এত করিয়া ও হয় তো হুক্কা ডাকিল না, এততে ও হয় তো শ্যামার মার মন উঠিল না। অবশেষে কাটী দিয়া না হয় উত্তপ্তলৌহশলাকা দিয়া পরিষ্কার করিলে, মিষ্ট কথায় না হয় কড়া কথা ব্যবহার করিলে। আজকালের বাজারে মিষ্ট কথার আদর নাই; ভাল কথায় যাহা না হয় কড়া কথায় তাহা সহজেই সুসিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু, এত করিয়া যাহা করিলে তাহার ফল হইল কি?—দেখিতে না দেখিতে—ভোগ করিতে না করিতে তামাক পুড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শ্যামার মার যৌবন ও ভাসিয়া গেল। এ অসার সংসারে সকলই এমনি অনিত্য—এই আছে এই নাই। মল্লিকা হাসে আবার শুখাইয়া যায়, ফুল ফুটে আবার ঝরিয়া পড়ে, তারা উঠে আবার মেঘে লুকায়, প্রদীপ জ্বলে আবার নিভিয়া যায়, জোয়ার খেলে অবার তখনি ভাঁটা পড়ে। সকলই এই রূপ, তবে যতক্ষণ যাহা থাকে ততক্ষণ তাহার সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শ্যামার মার যখন সময় ছিল, তখন শ্যামার বাপ সদ্ব্যবহার করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করে নাই। তাহার সাক্ষ্য——শ্যামাচরণ। আর, সেই যে সে দিন রাজীব বাবু বৈ-ঠকে বসিবার সময় চৌকির উপর উপবিষ্ট হইয়া উলঙ্গগাত্রে ঈষৎস্ফুরিত বদনে মুদিতকল্পচক্ষে হস্তারূঢ় হুক্কার রৌপ্যমণ্ডিত মুখনল নিজ অধরে মধ্যে রাখিয়া ধীরে ধীরে চুম্বন করিতেছিলেন, থাকিয়া থাকিয়া কখন ধীরে ধীরে একটু শোষ টানিয়া কতক ধুম গলাধঃকরণ করিয়া কত

উড়াইয়া দিতেছিলেন, আর ভুক্তাবশেষপ্রত্যাশিত প্রসাদলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় হালদার, চাটুর্য্যে, বসুজা প্রভৃতি চাটুকারগণ নিকটে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে বাবুর মুখোদ্গীরিত কুণ্ডলাকৃত ধূম্ররাশি দেখিতেছিল। এ-সময়ে কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হয় বাবু সে দিন তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আমরা এ জন্মে তাহা ভুলিব না।

অতএব, হে সুন্দরি! প্রসন্না হও। বরবর্ণিনি! অধমের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, তোমা ভিন্ন বাঙ্গালীর আর গতি নাই। সারাদিন গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রমের পর তোমা ভিন্ন কে আর সেই লাঞ্ছনাভোগী কেরাণীর প্রাণ শীতল করিবে? প্রাণপণে সহস্র খাটুনি খাটিলেও প্রভুর মন না পাইয়া তাঁহার তাড়া খাইলে কে আর তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? ভার্য্যার মৃদু অথচ মর্ম্মান্তিক ভৎর্সনে জ্ঞানহারা হইলেই বা কে আর তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া দিবে? হে দেবি! হে অধমতারিণি দুর্ব্বলবলদায়িনি বাঙ্গালীকুলপরিত্রাণকারিণি দেবি! সুপ্রসন্না হও, চিরযৌবনীর ন্যায় স্বস্বরূপে বাঙ্গালীগৃহে বিরাজ কর। তোমার মহিমা ঘরে ঘরে ঘোষিত হউক। অগতির গতি তুমি, দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি—তোমায় শত শত প্রণাম।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি?

—000—

প্রকৃতি—পুস্তকই প্রকৃত জ্ঞানলাভের মহাগ্রন্থ স্বরূপ। ইহাতে যা আছে তাহাই তথ্য; ইহাতে যাহা নাই, তাহা জানিবারও যো নাই। নরগণ আদিমকাল হইতে পুরুষানুক্রমে এই মহাগ্রন্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ

করিয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে যে জাতি ইহার তাৎপর্য্যগ্রহণে যতদূর সমর্থ হইয়াছে সেই জাতি সেই পরিমাণ জ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছে ও তদনুযায়ী উন্নতিপদেও আরূঢ় রহিয়াছে। কারণ, উন্নতি জ্ঞানগত প্রাণ. প্রাকৃতিক জ্ঞানই মানবোন্নতির প্রধান সাধন। বঙ্গদেশবাসী বুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ চিন্তাশক্তির ভারবহনে অনিচ্ছুক। এই কারণে ইহাদিগের জ্ঞানাজ্জনী স্পৃহা তাদৃশী বলবতী নহে, যথাযথরূপে প্রকৃতিপুস্তক পাঠে ইহারা সযত্ন নহে--সুতরাং প্রাকৃতিক জ্ঞানবিষয়ে ইহাদের অধিকার অল্প; সেই জন্য উন্নতিও ইহাদের যৎকথঞ্চিৎ। বঙ্গের ভাবীআশাস্থল, স্বদেশবৎসল যুবকবৃন্দ! যদি সত্যই স্বদেশের মঙ্গলবিধানবাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাক, যদি বঙ্গের দুর্দ্দশামোচনের সুগম পথ অনুসরণে অভিলাষ থাকে, তবে প্রকৃতি পুস্তক পাঠে কৃতসঙ্কল্প হও। ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে সকল নৈসর্গিক করলেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে বদ্ধপরিকর হও; আবালবৃদ্ধবনিতাকে এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে দীক্ষিত কর এবং এইরূপ নবজীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যকরণোপযোগী প্রণোদনা প্রদানে সতত চেষ্টিত রহ।— দেখিবে, উন্নতিদ্বার আপনিই উন্মুক্ত হইবে—কাঙ্খিত ফল সহজেই করতলস্থ হইবে।

আমরা এই প্রকৃতিপুস্তক হইতে দু একটী চিত্র সন্নিবেশ দ্বারা দের বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা ইহার ... প্রধান তিনটী অধ্যায়ের এক একটী উদাহরণ গ্রহণ করিয়া স্বল্প কথায় প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জগতের যাবতীয় পদার্থ পরমাণুসমষ্টি সংযোগে সমুৎপন্ন। কি গিরিশিরশোভী তুষারখণ্ড, কি নয়নস্নিগ্ধকারী মহান্ বটবৃক্ষ. কি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, ইহাদের প্রত্যেকের নির্ম্মাণ গঠন ও রচনা—মাত্র যন্ত্র নির্ম্মাণকৌশলেই পর্য্যবসিত; উপকরণ—মাত্র পরমাণুসমষ্টি। নৈসর্গিক নিয়মে যেমন জল বাষ্প হয়, বাষ্প জল হয়, সেই জল আবার জমাট বাঁধিয়া বিবিধ নিয়মিত আকার ধারণ করে সেইরূপ অব্যর্থ প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশেই, বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, ভ্রূণ হইতে মনুষ্য জন্মে। সুতরাং মনুষ্য কি? এপ্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে

হইবে যে, ইহা নৈসর্গিক নিয়মসম্বন্ধ-পরমাণুসমষ্টিগঠিত সুকৌশলময় যন্ত্রমাত্র। পৃথিবীতে যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ের বর্ত্তমান পরিণতিফল——মনুষ্য। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুগযুগান্তর, কল্প কল্পান্তর ধরিয়া পৃথিবীবক্ষে যে সকল পরিবর্ত্তনসমূহ সংঘটিত হইয়াছে এক মনুষ্যদেহরচনায় তৎসমস্তই বিরাজমান। অচেতন জড়পদার্থের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি এবং উদ্ভিদসংসারের প্রথম প্রবর্ত্তন—একই কথা; আবার জীব সৃষ্টির সর্ব্ব অধঃসোপান ও উদ্ভিদ সংসারের শেষ সীমা একই কথা। মনুষ্য সেই জীব সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয়। চেতন ও অচেতন এই উভয় শ্রেণী মধ্যে ব্যবধান—উদ্ভিদসংসার। উদ্ভিদে চৈতন্য ও জড়ভাব উভয়ই বর্ত্তমান। খনিজ পদার্থের পরই অচৈতন্যের তিরোভাব, মনুষ্যে সেই চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিকাশ। চৈতন্যের সহিতই মনুষ্যের সম্বন্ধ। চৈতন্যরহিত বা জীবনশূন্য মনুষ্য—মনুষ্যই নহে। আমরা এতক্ষণ মনুষ্য কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে জীবন বা চৈতন্য কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

জ্ঞানচক্ষুতে কল্পনা অঞ্জন মাখিয়া প্রকৃত জ্ঞানে উদ্বোধিত হইয়া, শূন্যপানে একবার চাহিয়া দেখ দেখি—ঐ যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র রাজি অনন্তকাল ধরিয়া গগনের নীল জলে অবিরত ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দেখিবে, ইহারা তেজকণা রূপে আকাশের এই অনন্ত বিস্তারে ঘোর অন্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ ছিল। যে নিয়মবলে রমণীচক্ষের জল মুক্তাফল সদৃশ গোলাকার ধারণ করিয়া অতুল সৌন্দর্য্যের আধার হয়, আবকল সেই নিয়মের বশবর্ত্তিতায় শূন্যে ঐ তেজকণা সমূহ ক্রমশঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় শত শত সৌরজগৎ এইরূপ আকার ধারণ করিয়া গগন-প্রাঙ্গণে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী সেইরূপ একটী সৌর-জগতের এক অংশ মাত্র। ইহা যখন প্রথমে সৌর জগৎ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নিজস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল তখন কিছু ইহা জীবনিবাস যোগ্য ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ইহা প্রাণবন্ত পদার্থ সমূহে সমাকীর্ণ। আবার এই সকল জীব—পৃথিবী যে ধাতুতে গঠিত তাহা হইতে কোন রূপ স্বতন্ত্র উপাদানে নির্ম্মিত নহে বরং তাহারাই ইহার অস্থির অস্থি-

মজ্জার মজ্জা ; প্রাণের প্রাণ। প্রাণ, জীবন বা চৈতন্য আর কিছুই ত পরিবর্ত্ত-প্রবণ-পরমাণু সংহতি-সংযোগ-সমুৎপন্ন কশ্চিৎ অবস্থা-বশেষ মাত্র। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে কেমন করিয়া প্রাণ পৃথিবীতে লব্ধপ্রসর হইল ? আমরা বলি, প্রকৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া এক্ষণে যতদূর বুঝিতে পারা যায়—আবার তাহা অপেক্ষা অধিক বুঝিবার কাহারও অধিকার নাই—তাহাতে দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যে কোন সৃষ্টিকারক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। প্রাণিসমূহে যে তেজ বা ক্ষমতা দৃষ্ট হয় তাহা উদ্ভিদ সংসার হইতে আহরিত হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদসংসার সূর্য্যকিরণ সাহায্যে জড়পদার্থ হইতেই ইহার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জড়পদার্থই প্রাণের অধিষ্ঠানভূত। তিনি হয়ত আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে প্রাণ আসিল কোথা হইতে ? এ মৃৎপুত্তলীতে এ তেজ কেন ? চৈতন্য কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরদানে আমরা অসমর্থ। বিজ্ঞান ইহার উত্তর দিতে পারে না. জড়বাদীকে মূকভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যাহা বুঝিতে পারে না, প্রকৃতিদর্শীরা যাহা জানে না—আর কে সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উদ্বোধিত, কে এই সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম, এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদনে সমর্থ ? কেহই না। তবে আইস দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ধার্ম্মিক, নাস্তিক সকলেই মস্তক নত করিয়া নিজ নিজ ক্ষ...
স্বীকার করি।

ক্রমশঃ

যোগিনী চক্র।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

চল, সখি, ভ্রমি মোরা গাঁথি ফুলহার।
সুরভি ফুলে, চিকণিয়া মালা,
সাজা'ব মনোরমত তনু প্রমীলার।
জিনিবে গলে, গজমতিমালা
চারুমুখে মধুর হাসি হেরিব লো তার।

(পুষ্পাহরণ করিতে করিতে চারিদিকে কুমুদিনী, সুহাসিনী, অনুপমা ও চিত্রাঙ্গদা অপ্সরা-চতুষ্টয়ের গমন। কুমুদিনী রাজা প্রিয়দর্শনকে ঈষন্নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া সুহাসিনীকে সম্বোধন করতঃ)।

কুমু। হ্যাদে দেখলো সজনি, পুরুষরতন
এক বসি তরুমূলে, নিদ্রাচ্ছন্ন, মরি,
কুজ্‌ঝটী—মণ্ডিত যথা হিমানীতে শশী
আবেশে অধীরপ্রাণ ভোর প্রেমরসে

সুহা। কুমুদে কুমুদবাঞ্ছা, কুমুদিনি ধনি,
না মেশে আবেশবশে—এই শঙ্কা করি,
ভালবাসা-ঋণ, মরি, কেমনে শোধিতে?

কুমু। ব্যঙ্গত্যজি, সুহাসিনি, দেখলো আসিয়া
বিমান ত্যজিয়া বুঝি উদিত ভূতলে
পূর্ণশশী—অপরূপ দেখা'তে জগতে।
কিম্বা সে ত্রিদিব ছাড়ি, রতি তেয়াগিয়া
আবির্ভাব মর্ত্তে আজি মদনমূরতি।

সুহা। (সাশ্চর্য্যে অবলোকন করতঃ)

তাইতো, সজনি, হেন অপরূপ রূপ
হেরিনি নয়ন কভু যে অবধি সবে
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠধাম মরলোকে আসি
অতুল ঐশ্বর্য্য পাতি—নিবাসিনু মোরা !
ধন্য সে রমণী মণি ! যার প্রেমপাশে
সদানন্দে গাঁথা, মরি, এ হেন মাধুরী।
আর———

([illegible]ন হইতে পুষ্পহস্তে হাসিতে হাসিতে অনুপমার আগমন)

অনু। (আর) ধন্য সে পুরুষবর ! যাঁর রূপ স্মরি
আবেশে বিহ্বলপ্রাণ স্বর্গের অপ্সরী।

সুহা। (স চকিতে)
কে লো অনুপমা নাকি ? কোথাছিলি এবে ?
একলা পাইয়া তোরে কে শিখালে আজি
এ হেন রসের ঘটা ? শিখিলি তো ভাল।

কুমু। কোথা চিত্রাঙ্গদা ?—

অনু। ওই যে সে কালামুখি।
যতনে তুলিতেছিনু আঁচল ভরিয়া
ফুলরাশি,—সর্ব্বনাশী না দিল তুলিতে।
সে'থায় দেখিল কা'রে—দেখালে আমারে।
কেমনে বলিব, দিদি, না জানি অমনি
কোন্ মন্ত্রবলে হস্ত হইল অবশ,
খসিয়া পড়িল ফুল ;—হাসিল আবাগী।
সে হাসি সহজ নয়—দেখিনু চাহিয়া
অভাগীর যেইদশা তার (ও) সেই দশা।
নারিনু বুঝিতে রোগ, আসিনু দৌড়িয়া
ব্যাধির ওষধ ল'তে তোমাদের ঠাঁই।
(ওমা) যে জ্বরে জরেছে রোগী—হায়রে কপাল !
ঘেরিয়াছে সেই জ্বরে আজি বৈদ্যরাজে।

কুমু। সত্য লো, সজনি, তুমি যা কহিলে আজি
অনুপমা। বল দেখি, এতদিন ধরি
ফিরিলে যে মর্ত্তভূমে দেখেছ কি কভু
এ হেন অতুল রূপ—মদনমোহন।
আমরা যে বিদ্যাধরী—আমরা ও আজি
নিরখি ও রূপরাশি ইচ্ছি রাখিবারে
হৃদয়ে হৃদয়ে করি হৃদিকণ্ঠহার।
(অদূরে চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া)
অই যে ঐ চিত্রাঙ্গদা আসিছে হেথায়।
চিত্রাঙ্গদা! দেখেছ কি ওদিকে চাহিয়া
কি এক সুন্দর মূর্ত্তি বসি তরুতলে?
চিত্র। দেখিয়াছি বহুক্ষণ, শুনিয়াছি এবে
যে সকল কথা সবে কহিলি সজনি।
কিন্তু, কিতাপে মলিন (মরি) হেন চন্দ্রানন?
কি সে দুঃখ—যার পরশনে স্বর্ণলতা
আতপতাপিত হ'য়ে শীর্ণকলেবরে
মাটীর উপরে আজি যায় গড়াগড়ি?
কুমু। সদত বাসনা মনে জিজ্ঞাসি উহারে,
কোন্ অভিপ্রায়ে বলী কিবা মায়াবলে
নরের দুর্গম স্থল—হেথা সমাগত।
বাচালতা ভয়ে, কিন্তু, না পারি কহিতে।
আর ভয় হয়, সখি, নিদ্রিত সুজনে
বল জাগাব কেমনে? নীতিশাস্ত্র মতে
সতত নিন্দিত জানি এ হেন কুপ্রথা।
চিত্র। নীতিশাস্ত্রমতে জানি জাগান নিদ্রিতে
মহাপাপ, কিন্তু দিদি, ভাবি দেখ মনে
কোথা সৌগন্ধ পায় না পিসি চন্দনে?
সে বিতরে ইক্ষু বিনা আক্রন্দনে

রস ? —চললো সজনি সুধাই উহারে
কোন মহাবংশ বলী করেছে উজ্জ্বল।

অনু। ত্রিদিব নিবাসে মোরা সেবিতাম সদা
শচীকান্তে. চিবানন্দময় সে ভুবন,
কেমনে তুষিব কহ, কোন্ মায়াবলে
নিবানন্দ জনে সখি। শোকীশান্ত কথা,
মরি, অজ্ঞাত সে দেশে। তুমি যদিপার
সই এ কৌতুক তবে কহলো আমারে।

সুহা। রাজকুলোদ্ভব কোন হবে রাজেশ্বর
বসিত কনক কান্তি, হেমদ্যুতি আভা,
এত যে মলিন, তবু অলসি নয়ন
মোহন—মধুর তেজ বাহিরিছে যেন।
বাহিরায় উষাকালে, হায়রে যেমতি
যবে সে সহস্র—অংশু কুজ্ঝটী ভেদিয়া
ধীরে ধীরে দেখা দেয় পুবব গগণে।
দীপিছে ললাটে অই দেখ রাজটীকা
ত্র্যম্বকেব ভালে যথা খেলে শশিকলা
(চারুদীপ্তি) রূপ-ছটা দ্বিগুণ উজলি।
কি ভাযে সম্ভাসি, বল হেন ভাগ্যধরে
অবলা অমরী, মরি, অল্পমতি মোরা।

কুমু। কি ভাবনা ? চল যাই প্রমীলা সদনে
(সদত সুমতি তিনি রাজাব নন্দিনী)
জিজ্ঞাসিয়া আসি তাঁরে কি কৌশল বলে
সম্ভাসি সম্ভ্রমে মোরা নর রাজ্যেশ্বরে।

থাম্বাজ—খেমটা।

তবে, যাই চল প্রিয়সখীর সদন।
পলকে হরিল চিত পুরুষরতন।
নেহারি ও রূপরাশি বি[illegible]হিত মন.
বিষম দহিছে হৃদে মদন-পীড়ন।

(গীত গাহিতে গাহিতে সকলের শূন্যমার্গে গমন। রাজা প্রিয়দর্শন আসীন।)

রাজা। (স্বগতঃ)

জাগ্রতে কি আঁখি, মরি, হেরিল সহসা
স্বপ্ন? না এ চারুরুচি বৈজ্ঞানিক খেলা?
সার্থক জনম মম, নরজন্ম লভি
হেরিনু স্বচক্ষে আজি দেবাকৃতি দূতী
লাবণ্যের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি হেন!
কনকমুকুট শিরে, খচিত ভাস্কর-
বিভা বিবিধ রতনে, লম্বিত বিউনী
মরি, চুম্বিত চরণে। মণিময় সিঁথি
শোভিছে সীমন্তপথে দিক্ শোভা করি
নিবিড় জলদে যেন স্থির সৌদামিনী।
উন্নত বিশাল বক্ষে শোভিছে কঞ্চুক-
বিভা, নয়ন ঝলসি, বালার্ক-কিরণ-
সমতেজে;—কুচরুচি দেখা'তে জগতে।
আবরি বতনে, মরি, সুসূক্ষ্ম বসনে
চারুকান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতায় হৃদয়ে
প্রেমরস;—কামক্ষুধা বাড়ায় পলকে।
বরষি অমিয়রাশি শ্রবণবিবরে
বাজিল অমরবাদ্য, গায়িল অমরী
তানলয়ে সপ্তসুরে গাঁথা সুসঙ্গীত।
সে স্বরের সহ মিশি বাজিল ঘুঙ্ঘুর
বেঁকী পাঁজর পঞ্চম, পঞ্চমে তুলিয়া
রাগ মাতা'য়ে মেদিনী। দাপটি চৌদিক
হ'তে বাহিরিলা বেগে শ্বাপদ শার্দ্দূল,
সিংহ, মৃগ মৃগী যত। ঊর্দ্ধকর্ণে শুনি
মুনিমন-মোহময়ী সে মধুর বুলি

ভুলিলা জীবহিংসাব্রত, ফিরিলা সকলে
অতুল আনন্দে মাতি যে যার আবাসে।
নীরবিলা বনপাখী, নীরব অবনী!
নীরবে জাগিলা, মরি, বিটপ বিটপি
মগন হরষে যেন; ফেলিল খুলিয়া
নবসাজ—ফুলকুল বেড়িলা চরণে।
ছুটিলা চৌদিক ভরি সে স্বরলহরী,
সঙ্গে করি তিন গ্রাম ছত্রিশ রাগিণী
ভাসা'য়ে কাননপথ, মাতায়ে মেদিনী
অবিরল, রাগরূপ সাগর সঙ্গমে।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—ooo—

কাব্যকানন। শ্রীহীরালাল ঘোষ প্রণীত। পুস্তকখানি সুপাঠ্য বটে কবিতাগুলি সরল ও মধুর। ঝান্সীর মহারাণীর উক্তির ন্যায় সতেজ সুগম্ভীর ও উদ্দীপনাসূচক কবিতা আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি। লেখকের এই প্রথম উদ্যম, অভ্যাস থাকিলে কালে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

হিন্দুদর্শন—মাসিকপত্র ও সমালোচন। ইহার লেখা মন্দ হইতেছে না অল্পমূল্যে এরূপ সাময়িক পত্র দিন দিন যত বৃদ্ধি পায় ততই সুখের। ইহার উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

বিসূচিকা—অর্থাৎ হোমিওপেথিক মতে ওলাউঠা, উদরাময় প্রভৃতি রোগসমূহের চিকিৎসা নিরূপণ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অন্যান্য চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপেথিক চিকিৎসায় বিসূচিকা রোগে আশু উপকার দেখে। এ সম্বন্ধে আমরা এ চিকিৎসার পক্ষপাতী। পুস্তকখানি সাধারণের উপযোগী হইলে ভাল হইত

সরলা।

আদ্য স্তবক।

একটি নীরব হ্রদের নিকটে
প্রতিধ্বনি-গলে খেলিছে ভাষ,
বাতাসের কাণে আধ-ফোটা কথা
কে যেন কহিছে, চাপিয়া শ্বাস।
সে হ্রদের ধারে প্রকৃতি-রচিত
বেড়াতে বেড়িয়া বনের লতা
একটি একটি ফুটাইছে ফুল,
ফুল কোলে করি দুলিছে পাতা।

সে সব কুসুম হ্রদের সলিলে
আপন আপন সুষমা ছবি
ভাসিতে দেখিয়া [illegible] হাসিছে,
অপার হরিষ-সাগরে ডুবি।
আছিল সেখানে একটি যুবতী
রূপের তুলনা মিলে না তার ;
মানব জগতে যদি রূপ থাকে
দেবতার মত রূপের সার.

তা' হ'লে তা' ছিল তাহারি যেমন,
হ্রদতীরে বালা হেম-নলিনী ;
তেমন তেমন সুচারু মূরতি
সেই হ্রদ বই কেউ দেখিনি।
সে সরলা বালা সারল্যের ছাঁচ,
সরলতা যদি কোথাও থাকে,
তা' হ'লে তা' ছিল তাহারি কেবল,
সরলতা কভু ছাড়েনি তাঁকে।

পাহাড় যেমতি এলো মেলো আর
কারিগরী ছাড়া স্বাধীন হ'য়ে
স্বভাবের শোভা করে গো বি[illegible],
দূরদূরান্তর বিজনে র'য়ে
তেমতি সে বালা প্রকৃতি পুতলী.
সাজগো[illegible] কি যে [illegible]
যখন যেমন তখন তেমন
প্রকৃতির সাজে সুখে।

---

* মার্কিন কবি হামিলটন জি ডুবয় Hamilton G. Dubois বিরচিত 'ভায়োলা' Viola নামক পদ্য-উপন্যাসের ভাব অবলম্বনে রচিত।——শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ছিল সে যুবতী সদাই স্বাধীন,
মুখভরা হাসি ছিল গো তার;
সে মু'খানি, মরি, দেখিলে নয়নে
না রহিত কারো বিষাদভার।
হাসিয়া হাসিয়া যবে সে যুবতী
কোকিল-কূজনে গীত গায়িত,
প্রতিধ্বনি বালা লুকা'য়ে পাহাড়ে
আড়ে আড়ে কত বাহবা দিত।

সে বাহবা-রব যুবতীর কাণে
পশিয়া হাসা'ত অধর তার;
হাসিমাখা রবে এলোমেলো সুরে
পুনঃ সে ঢালিত গীতের ধার।
কভু সে যুবতী সে হ্রদের তীরে
বসিয়া থাকিত আপন মনে;
লহরী-বিহীন হ্রদের হৃদয়
চাহিয়া দেখিত থির নয়নে।

দেখিতে দেখিতে কিছুকাল পরে
মৃদুল সমীরে হ্রদের বুক
কাঁপিয়ে উঠিত, স্বপন ভাঙিয়ে,
তা' দেখি হাসিত বালার মুখ।
লোহিত অধরে মুচকি মুচকি
আ-মরি, কিবে সে হাসির রেখা!
কুঁদফুলসম মাঝ-দাঁতদুটি
কখন কখন যাইত দেখা।

লোহিত অধর—বিদ্রুম দশন
দরপণ সম হ্রদের বুকে
বিম্বিত হইত। শোভিত কেমন
স্থলের মু'খানি জলের মুখে!
ভাসা ভাসা দুটি বড় বড় আঁখি
জলে ভাসা চোখে থাকিত চেয়ে,
বারি-আঁখি-তারা যেন রে থাকিত
অচল হইয়ে সাথীরে পেয়ে।

একদা প্রভাতে হ্রদের নিকটে
দাঁড়াইয়েছিল সরলা বালা;
হ্রদের হৃদয়ে কতই লহরী
আছিল খেলিতে হ'য়ে উতলা।
সরলা—সরলা সে লহরীগুলি
আশ মিটাইয়ে দেখিতেছিল;
কখন' কুড়া'য়ে ছোট ছোট ঢিলি
লহরীর শিরে ফেলিতেছিল।

কত বনফুল চারি দিকে তা'র
রূপের গরবে ছিল গো ফুটে,
সরলারে দেখে হেঁটমুখ হ'য়ে
বিষম শরমে পড়িল লুটে।
এমন সময়ে হ্রদের ও পারে
দেখিতে পাইল সরলা বালা
ফুটেছে একটি 'ভায়োলেট' ফুল,
স্বভাবের ছোট সুনীল ডালা।

তপনের তাপে কচি 'ভায়োলেট'
তাপিত হইয়ে, আনতশিরে

ঝুলে পড়েছিল ও সমীর তাহারে
বীজনিতেছিল দয়ায় ধীরে।
সরলা সে ফুল নেহারি নয়নে,
ভাবিল উহারে আপন ফুল,
আশা কৈল চিতে, বুকেতে রাখিতে
সে কোমল ফুল—শোভা অতুল।

প্রাণ ভ'রে তা'র সুবাস লইতে
বাসনা হইল বালার মনে;
বাসনা হইল, চোকে চোকে তা'রে
রাখিবার তরে যতন সনে।
সে ফুল দেখিয়ে পুলকিত চিতে,
হাসিল সরলা মধুর হাসি,
সে ফুলের চেয়ে তখন তাহার
অধরে শোভিল সুষমা আসি।

নীল পরিচ্ছদে চারু 'ভায়োলেট'
নিশির শিশির মাখিয়া গায়,
উঁকি পেড়ে পেড়ে আছিল দেখিতে
কখন তপন সরিয়া যায়।
সরলা তাহার সে ভাব নেহারি,
ভাবিল কত কি আপন মনে,
কে যেন তাহারে সে রকম ফুল
দিয়েছিল কবে যতন সনে।

মনে হ'লো তা'র, ভাবিতে ভাবিতে,
প্রণয়ী তাহার একদা সুখে
সেরূপ একটি 'ভায়োলেট' ফুল
দিয়েছিল তারে হসিতমুখে।
যামিনী সময়ে সরল প্রণয়ী
দিয়েছিল তাহা সরলা-করে;
আর কেউ তাহা দেখিনি নয়নে,
তা'রা বই নাহি জানিত পরে।

এই 'ভায়োলেট' ফুল নিরখিয়ে,
প্রণয়ীরে তার পড়িল মনে;
প্রতি নিমেষেতে মনের নয়নে
দেখিল তাহারে অগাধ ধ্যানে।
পূর্ব্বকথা ভাবি আকুল হইল,
হৃদয় ফাটিয়ে পড়িল শ্বাস;
বঁধুয়ার তরে কি ভাবি তখন
করিল অন্তরে একটি আশ।

অমনি সে বালা সেখান হইতে,
যে খানে কুসুম, চলিল তথা,
অচল বিজলী সরলা তখন
হইল সচল বিজলী-লতা।
হ্রদের সে তীরে পাহাড়ের চূড়ে
সেই 'ভায়োলেট' ফুটিয়েছিল,
তুলিয়া তাহারে দিতে প্রণয়ীরে
সরলার মনে বাসনা হ'ল।

সাহসিক চিতে লাগিল যাইতে,
নাহি মনে কোন বাধার ভয়;
ঘন পদক্ষেপে চলিল যুবতী,
এ বালা যেন গো সে বালা নয়।

কতক্ষণে তবে পাহাড়ের চূড়ে
আশায় মাতিয়ে উঠিল বালা ;
কাছাকাছি হ'য়ে দেখিল নয়নে
'ভায়োলেট ফুল রূপের ডালা।

নীচে সে হ্রদের বিমল হৃদয়ে
তরল লহরী নাচিতেছিল,
'ভায়োলেট' ফুল লহরীমুকুরে
নিজ চারু শোভা ভাসা'তেছিল।
উপর হইতে নিজ ছবিখানি
ভাসিতে দেখিয়ে হ্রদের জলে,
'ভায়োলেট' ফুল আপনা আপনি
হাসিতেছিল গো বোঁটায় দুলে।

আরো কাছাকাছি হইয়ে তখন
দেখিল সরলা বিষম গোল,
হাত বাড়াইল—না বাড়িল হাত,
মূল ধরি গাছে দিল গো দোল।
তবুও সে ফুল না পড়িল খসি,
তা' দেখি সরলা পাথর ভাঙা
কুড়া'য়ে আনিয়ে সাজাইয়ে থরে
চড়াইল তাহে চরণ রাঙা।

থাকি তদুপরি পুন ধীরি ধীরি
বাড়াইল হাত তুলিতে ফুলে ;
অমনি সহসা পাথর সরিয়া
পড়িল সরলা হ্রদের জলে।
যেমন পড়িল, অমনি ডুবিল—
ভায়োলেট তাহা-দেখিল শুধু,
তুলিতে তাহারে কেহ নাহি ছিল,
নাহি ছিল তার প্রাণের বঁধু।

ডুবিবার কালে একটি কেবল
আর্ত্তনাদ উঠি মিশিল বায়,
ক্ষণেকের তরে কাঁপিল সলিল,
পরে না রহিল কাঁপুনি তায়।
তলায় তলা'য়ে অভাগী সরলা
অনন্ত ঘুমেতে মগন হ'ল,
'ভায়োলেট' ফুল তুলিবার আশা
প্রাণের সহিত মিশিয়ে গেল!

যে হ্রদ ছিল গো সরলার প্রিয়,
এবে তা সমাধি হইল তার ;
সরলার শোকে হ্রদটিও যেন
কাঁদিল ছড়ায়ে লহরীধার।
উপরে লহরী, তার নীচে স্রোত,
তার নীচে সেই অভাগী বালা
মেঘ-কোলে ডোবা তারকার মত
পড়িয়ে রহিল,—ফুরা'ল খেলা।

নীরব গভীর হ্রদ! বল এবে
তব বালিময় গোপন কোলে
জাগন্ত সরলা ঘুমন্ত রহিল,
এ রহস্য-ভেদ হবে কি কালে?
হায়, যে রতন এই কতক্ষণ
তপনের তলে খেলিতেছিল,

নিয়তি তাহারে নির্ম্মম অন্তরে
চিরকাল তরে ডুবা'য়ে দিল!

ওরে হ্রদ! তোর তীরেতে বসিয়া
সরল অন্তরে সরলা বালা
কতই হাসিত, আজি তোর জলে
মিশাইল সেই হাসির খেলা!
যাহারা চিনিত সরলা বালারে,
তারে না দেখিয়ে কাঁদিবে তারা
তোরি তটে বসি উদাস পরাণে
কতই ঢালিবে নয়ন-ধারা।

যে ফুলের তরে প্রাণবৃন্ত হ'তে
খসিয়া পড়িল সরলা-ফুল,
দুই দিন পরে ক্ষীণ বৃন্ত হ'তে
সে ফুল(ও) খসিবে, নাহিক ভুল।
সরলার মত তোরি জলে, হ্রদ,
ওই 'ভায়োলেট' পড়িবে খসি।
সরলা ডুবেছে, কিন্তু 'ভায়োলেট'
স্বচ্ছনীরে তোর থাকিবে ভাসি।

সরলার ওই সাধের কুসুম
ভাসিতে না দিয়ে ডুবায়ে দিস্।
সরলার সেই বুকের উপরে
অশ্রু-জল সহ রাখিয়া দিস্।
আজি হ'তে, হ্রদ, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ব'রে ধীরি ধীরি য'দিন র'বি;
কাঁদুক জগত দিবস রজনী
য'দিন আকাশে রহিবে রবি।

অন্ত্য স্তবক।

সরলার প্রেমমুগ্ধ সতীশ সরল
দাঁড়াইল আসি সেই হ্রদের গোচরে,
যার তলে চিরনিদ্রা ভুঞ্জিছে সরলা,
একাকী সতীশ তথা বিষণ্ণ অন্তরে
এ তট সে তট করি ভ্রমি বহুক্ষণ
অন্বেষিল সরলারে যুবক তথায়;
কিন্তু বৃথা আজি তার দৃঢ় অন্বেষণ,
ফিরিল যুবক পুন, কি জানি, কোথায়।

এক দুই করি ক্রমে কয়টি বছর
মিশা'ল কালের গর্ভে—যুবা নিরুদ্দেশ।
সহসা আবার যুবা আসিল তথায়
একটি বারের তরে ভ্রমি' নানাদেশ।
চাহিয়া দেখিল যুবা সে হ্রদের জল,
চাহিয়া দেখিল সেই হ্রদের পুলিন,
চাহিয়া দেখিল তীরে নানা তরুদল,
দেখিয়া হইল যুবা আরো উদাসীন।

তখন হ্রদের জলে তরঙ্গ যেমন
খেলিত, এখনো খেলে ঠিক্ সেইরূপ,

তখন হ্রদের তট আছিল যেমন,
এখনো তেমন,—কিছু হয়নি বিরূপ।
যে সব তরুর তলে শীতল ছায়ায়
শুইত সরল যুবা সরলার পাশে,
সেই সব তরু ছিল তখন যেমন,
এখনো তেমনি, পাতা খেলিছে বাতাসে।

কিন্তু হায়, যুবা আর নহেরে তেমন
নহেরে তেমন আর অন্তর তাহার ;
কেন যে তেমন নয়—কেন যে এমন
জীবনে মৃতের সম, কি বলিব আর?

যুবক সতীশ ছিল শিশু এক দিন,
ভাবনা চিন্তার লেশ কিছু না জানিত।
তপন-কিরণ-দীপ্ত এ হ্রদের তীরে
শিশু সরলার সনে কতই খেলিত।
অঙ্কুরে যে প্রেম তা'র, গেল রে ভাঙিয়া,
ফুটিয়া যে আশা তা'র শুকাইয়ে গেল,
এ প্রেম, এ আশা, হায়, সেইশি শুকালে
আভাসে আভাসে কত দেখা দিয়েছিল

একটি দিনেরো তরে বনের বাতাস
দীঘল নিঃশ্বাস তার ছোঁয়নি তখন,
একটি দিনের তরে হ্রদের সলিল
একটিও অশ্রুবিন্দু করেনি গ্রহণ,
দীঘল নিঃশ্বাস আজ কত ব'য়ে যায়,
বায়ু সে নিঃশ্বাস ধরি মিশায় আকাশে
বিন্দু বিন্দু কত অশ্রু আজি ব'য়ে যায়,
হ্রদের সলিল তাহা অলক্ষ্যে গরাসে।

হায়, সে সরল যুবা একাকী দাঁড়া'য়ে
অতীত ঘটনা যত লাগিল ভাবিতে!
ভাবিল নির্ম্মূল আশা—ভাবিল আবার
মুকুলে বিনষ্ট প্রেম সরলা সহিতে।
একাকী দাঁড়া'য়ে যুবা অগাধ চিন্তায়
নীরবে হ্রদের জলে চাহিয়া রহিল ;
সে হ্রদের তলে তার প্রেমের প্রতিমা
অনন্ত নিদ্রার কোলে ঘুমা'য়ে পড়িল।

কবিও চিত্রকর।

—o‡o—

চিত্রকর অপেক্ষা কবির হৃদয় কিছু গভীর হওয়া আবশ্যক, কল্পনার সৃষ্টি ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। চিত্রকর অপেক্ষা কবির

ভাবুকতা অধিক হওয়া আবশ্যক, চিত্রকর যেরূপ রঙের সাহায্য পাইয়া থাকেন কবি সেরূপ কোন সাহায্য পান না। ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সাহিত্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে চিত্রের ন্যায় অন্যান্য শিল্প বিষয়ে তত্তদূর উন্নতি করিতে পারে নাই। কিন্তু, ভারতে যে একজন ও চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই, একথা আমরা প্রাণ থাকিতে কখন ও স্বীকার করিতে পারিব না। ভাস্করাচার্য্য একজন পটু চিত্রকর ছিলেন। সীতা, রত্নাবলী প্রভৃতি রমণীগণও অতি উৎকৃষ্ট চিত্র সকল অঙ্কিত করিতে পারিতেন। পুস্তক হস্তলিখিত হইলেও যত্ন করিয়া রাখিলে অধিক দিন থাকিতে পারে; কিন্তু চিত্র বাহিরে রাখিতে হয় সুতরাং কিছু দিন পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুস্তক একখানি জীর্ণ হইলে তাহা দেখিয়া অন্য একখানি রচিত হইতে পারে, কিন্তু একখানি চিত্র জীর্ণ হইলে তাহা দেখিয়া সেই রূপ অন্য একখানি অঙ্কিত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়; অতএব, ইহাও অসম্ভব নয় যে পুরাকালের চিত্রের সহিত চিত্রকরের নাম পর্য্যন্ত ও লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গদ্যেই হউক অথবা পদ্যেই হউক একত্র সমাবেশিত হইলেই আমরা তাহাকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিব। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, কাব্য পদ্যে ভিন্ন গদ্যে রচিত হইতে পারে না। সে বিশ্বাস ভ্রম মাত্র। কাব্য সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, তাহার সহিত ছন্দের বা যতির কোন সংশ্রব নাই। যদি কোন সৌন্দর্য্যময় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হই, তাহা গদ্যে লিখিত হইলে ও কাব্য; আর সৌন্দর্য্যবিহীন অসার গ্রন্থ পদ্যে হইলেও তাহা কাব্যনামের যোগ্য হইতে পারে না। "কাদম্বরী" গদ্যে লিখিত হইলে ও তাহা কাব্য বলিয়া সমাদৃত। আধুনিক বঙ্গ কবিদিগের মধ্যে অনেকে উনবিংশ অঙ্কের ও অধিক অঙ্কে পদ্য লিখিয়া যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহাদিগের মধ্যে কয়খানি কাব্য-নামের যোগ্য বলিতে পারি না; কিন্তু বঙ্কিম বাবু এক ছত্র পদ্য না লিখিলে ও তিনি বঙ্গের পূজনীয় কবি। এক্ষণে, আমরা সংক্ষেপে প্রকৃত কবি কাহাকে বলে এক প্রকার দেখাইয়াছি; চিত্রকর সম্বন্ধে ও ইহা বলিলেই যথেষ্ট

হইবে যে, যে চিত্রকর যত পরিমাণে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহার চিত্র তত উৎকৃষ্ট হইবে এবং সেই পরিমাণে একজন সুপটু চিত্রকর বলিয়া সম্মানিত হইবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবি একজন সমাজসংস্কারক। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা কবিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসন দিতে অভিলাষী। কারণ, সমাজসংস্কারকের যুক্তি অখণ্ডনীয় হইলেও তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না, সময়ে সময়ে তিনি সাধারণের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন। কিন্তু কবি তদ্রূপ কোন যুক্তি দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে যান না; তাঁহার সংস্কার বড় হৃদয়গ্রাহী; প্রীতিপ্রদ, মর্ম্মস্পর্শী। বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্জ্জনে বসিয়া অহোরাত্র বহুশাস্ত্র আলোড়িত করিয়া অশেষ অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলেন; অতি অল্প লোক তাঁহার সে যুক্তি বুঝিল, ক্রমে সাধারণের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কবি "বিধবা" রূপ কাব্যোদ্যানে "কুন্দ" কুসুমকে যিনি একবার দেখিয়াছেন, যাহা ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিতে পায় নাই, মুকুলেই যাহা শুষ্ক হইয়া পড়িল—সেই কুসুমকলিকার জন্য যিনি ক্ষণমাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন বিধবাবিবাহ সমাজের কিরূপ মঙ্গলময় বিধান! সেই বিধবা বালিকার বিবাহের জন্য কোন পাঠক না আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই বিবাহ শেষ হইলে কাহার হৃদয় না আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, সমাজসংস্কারক অপেক্ষা কবি অধিকতর সংস্কারনিপুণ।

আমরা কবি ও চিত্রকরকে লইয়া অনেক কথা বলিয়াছি, এবং বলিবার এখনও অনেক আছে, কিন্তু "কল্পনার" ক্ষুদ্র কলেবরে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম। উপসংহার কালে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা কবি ও চিত্রকরের যে প্রভেদ দেখাইয়াছি তাহাতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, একজন কবি ইচ্ছা করিলে চিত্রকর হইতে পারিবেন কিন্তু একজন চিত্রকর শততুলি ঘসিয়াও কবি হইতে পারিবেন না।

সুহাসিনী।

—ooo—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা।

Affections trampled on, and hopes destroyed,
Tears wrung from very bitterness and sighs
That waste the breath of life,—these all were hers.
Whose image is before us. She had given
Life's hopes to a most fragile bark,—to love!

(*Miss Landon.*)

পূতঃসলিলা ভাগিরথী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে; অদূরেই মুনিসত্তম বাল্মীকির শান্তরসাস্পদ পবিত্র আশ্রম। বিরহকাতরা গুরু-গর্ভভারপীড়িতা জনকনন্দিনী করকপোলসংলগ্না হইয়া অধোমুখে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অবাক্ হইয়া মুনিকন্যারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—কেহবা অশ্রু দেখিয়া অশ্রু ফেলিতেছে, কেহ বা রামচন্দ্রকে নানা রূপে ভর্ৎসনা করিতেছে। অভাগিনী বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন, যাহারা রামচন্দ্রকে দোষ দিতেছে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদিগের নিকট আর্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেছেন,—এ দোষ কাহার ও নয়, তাঁহারই অদৃষ্টের দোষ। আমরি! পবিত্রতা, সরলতা, স্বর্গীয় পাতিব্রত্য একাধারে গুণসমষ্টির এমন সুন্দর, এমন প্রাণারাম, এমন উপদেশ পূর্ণ উদাহরণ আর আছে কি? কবিগুরু বাল্মীকি, তোমার কৌশল অসীম। সে অসীম কৌশল সম্পন্ন তোমার এই কাব্য ভারতের কোহিনূর!

একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া গিরিবালা একমনে সীতার এই দুঃখের ইতিহাস পাঠ করিতেছিল, নিকটে বসিয়া কুসুম একমনে তাহাই শুনিতেছিল। গিরিবালার বয়স কিছু অধিক হয় নাই, এই পনর হইবে। এই বয়সেই অশেষগুণসম্পন্না,—শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীলা, পরদুঃখকাতরা। হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ। এ সংসারে আর কিছুই জানে না, জানিতেও চাহেনা, অনুক্ষণ স্বামীর চরণ ধ্যান করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে। স্বামী সেরূপ নন, প্রণয় কি পদার্থ তাহা সে হৃদয় জানিত না, অথবা জানিলেও জানিতে চাহিত না; সে হৃদয় দারুণ স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষে পূর্ণ। বালিকা এত করিয়া ও কখন সে অতুল ভালবাসার প্রতিদান পায় নাই, অথবা যাহা পাইয়াছিল তাহা তুলনায় অতি যৎসামান্য মাত্র, অতি অল্প দিনের জন্য। কি করিবে? রমণীর পতি ভিন্ন আর গতি নাই। বড় দুঃখের সময় পূর্ব্বের কথা এক একবার স্মরণ করিত, বহুদিন—যাহা এখন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, এতচেষ্টা করিলেও স্মৃতি ভিন্ন যাহার আর কিছু মিলে না যাহার চিন্তায় সুখ সামান্য কিন্তু দুঃখ অনন্ত—বহুদিন হইল, বিনোদ যে দুই একটী ভালবাসার কথা কহিয়াছিল, বিরলে বসিয়া এক একবার সেই সকল কথা স্মরণ করিত, অনন্ত দুঃখেও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিত। ক্বচিৎ বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িত, নিঃশব্দে সে অশ্রু বিন্দু মোচন করিয়া গিরিবালা স্বামীর সেবায় মন দিত।

দুঃখীর দুঃখকথাই ভাল লাগে। একবার, দুইবার যতবার পারিল গিরিবালা সীতার সেই দুঃখময় নির্ব্বাসন কথা পাঠ করিতে লাগিল। বিন্দুর পর বিন্দু আসিয়া অশ্রুতে চক্ষু ভাসিয়া গেল, সে অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া পুস্তকের উপর পড়িল। কুসুম বলিল—"দিদি, তুমি কি পাগল হ'য়েছ; পুস্তকে যাহা লিখা থাকে তাহা কি সত্য?"

"কেন সত্য নয়, কুসুম?

"তা বৈ কি, বিনা দোষে বনবাস দিলেন, আর অন্যে সেই স্বামীর দোষ বলিলে কষ্ট হইবে—ইহা ও কি কথা? এমন মেয়েমানুষ কি আছে?"

অতি কষ্টেও গিরিবালার মুখে একটু হাসি আসিল। বলিল—"কুসুম, ইহাতেই তোমার বিশ্বাস হইতেছে না। স্বামীই স্ত্রীলোকের গতি, স্বামীই মুক্তি; বিধিমতে তাঁহার তুষ্টি সাধন করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। অপরাধেই হউক আর বিনা অপরাধেই হউক স্বামী যদি বনে দিয়া সন্তুষ্ট হ'ন তাহাতে আর দুঃখ কি বোন্? তবে দুঃখ এই যে, তাহার সহিত বিচ্ছেদে সেই পাদপদ্ম আর দেখিতে পাইব না; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নিন্দা সহ্য হইবে কেন?"

কুসুমের একথা বড় ভাল লাগিল না। অসহ্য হইল, বলিল—"হয় কি না জানি না; কিন্তু (ঈশ্বর না করুন) তুমি যদি ভাই, এ অবস্থায় পড় তবে দেখিতে পাই কি কর।"

"অপরাধ হইলে—নিজের দোষে হইলে কষ্ট বটে, কিন্তু যদি বিনা অপরাধে তিনি বিদায় করিয়া সন্তোষ লাভ করেন, হাসিতে হাসিতে দাসী তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। আর ইহাও জানিও——"

অতিভয়ানক রূপে দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল, নিমেষের জন্য সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া বালিকা চারিদিকে চাহিল। শশব্যস্তে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"বাবু আসিয়াছেন।"

আজ কয়েক দিন বিনোদ কোথায় গিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপ তিনি কোথায় যাইতেন, কেন যাইতেন, কি করিতে যাইতেন বালিকা তাহা জানিত না, জানিতে ইচ্ছা হইলে ও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহার কোন ও অধিকার ছিল না। স্বামী আসিয়াছেন, শুনিয়া বলিয়া আহ্লাদে গলিয়া গেল। কেশ পাশ আলুথালু হইয়া রহিয়াছে, কুসুম বলিল—"তবে আয় দিদি, তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

একটু হাসিয়া গিরিবালা বলিল—"না, বোন্, ও সব থাক্, আগে তাঁহার আহারের উদ্যোগ দেখি।"

অদূরে পাচিকা বসিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা করিল না; সত্বর কুসুমের নিকট বিদায় লইয়া গিরিবালা রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সন্ধ্যা আসিল। সন্ধ্যা যাইয়া রাত্রি আসিল; দেখিতে দেখিতে এক প্রহর রাত্রি হইল, এখনও বিনোদ বাড়ীর ভিতর আসিলেন না। অন্ন

ব্যঞ্জন সমস্ত প্রস্তুত; স্বামীর স্বভাব জানিত, ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইতে সাহস হইল না, পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। কতক রাত্রে চাকর আসিয়া বলিল—"বাবুর শরীর অসুখ, আহার করিবেন না আজ বাহিরেই থাকিবেন।"—বিছানা লইয়া চাকর চলিয়া গেল।

দুঃখে বুক ফাটিয়া গেল; যথাকার দ্রব্য তথায় পড়িয়া রহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিয়া গেল। কিছুই খাইল না, দাস দাসী অনেক অনুরোধ করিল, গিরিবালা উঠিল না; বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজিল। ধীরে ধীরে গিরিবালা উঠিল, ধীরে ধীরে যাইয়া দ্বার খুলিল। কাহার ও সাড়াশব্দ নাই, ধীরে ধীরে বাহির বাটীতে গেল; বৈঠকখানার দ্বার খোলা রহিয়াছে—ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। খাটের উপর শুইয়া বিনোদ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রের আলো আসিয়া মুখের উপর পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নখযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট পা দুইখানি চন্দ্রের আলোয় বড় সুন্দর দেখাইতেছে—ইহলোকের সেই সর্ব্বস্ব, পরলোকের সেই মুক্তিধন, জীবনের সেই জীবন স্বামীপদ দুখানি নিঃস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। গৃহে ফিরিতে পারিল না, লোভ সামলাইতে পারিল না—ধীরে ধীরে খাটের একপার্শ্বে বসিয়া সেই পা দুখানির উপর হাত দিল। শরীর কাঁপিতে লাগিল। নীরবে বালিকা কাঁদিতে লাগিল, নীরবে গণ্ড বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু পায়ের উপর পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সবিস্ময়ে বিনোদ বলিল—"কে ও গিরিবালা, এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

"দাসী প্রভুর পদ সেবা করিতে আসিয়াছে।" বালিকার স্বর অস্পষ্ট, হৃদয় কাঁপিতেছে।

"পদ সেবার আবশ্যক নাই, তুমি গৃহে যাও।"

"অন্ন ব্যঞ্জন সমস্ত প্রস্তুত, যদি অনুমতি করেন, লইয়া আসি।"

"আমার শরীর অসুস্থ, আহার করিব না। কেন বিরক্ত করিতেছ?" ভয় পাইল, বলিল—"আমি আর বিরক্ত করিব না, আপনি নিদ্রা যাউন।"

"তুমি গৃহে যাও!"

"আপনি এখানে অসুস্থ শরীরে পড়িয়া থাকিবেন, ঘরে গিয়া ঘুম হইবে কি রূপে?"

"কি করিতে চাও?"

"অনুমতি করুন, দাসী এই পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকুক; আজ কয় দিন ও পদযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে পাই নাই, আপনি নিদ্রা যাউন, আমি বসিয়া বসিয়া উহা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই।"

বিনোদ গিরিবালাকে চিনিত, তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিল; দেখিল, এ বালিকা সহজে যাইবে না। বলিল—"তবে যাও, কিছু লইয়া আইস, আমি আহার করিব।"

আনন্দে হৃদয় গলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ গিরিবালা গৃহে চলিল। অন্ন-ব্যঞ্জন থরে থরে সাজানো ছিল, আবার অগ্নি জ্বালিয়া তাহা উষ্ণ করিয়া বাহিরে আনিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে গেল, দ্বার রুদ্ধ। দরজা ঠেলিল, দুই একবার ডাকিল, উত্তর পাইল না। কান্না আসিল, হাতের থালা ফেলিয়া গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল।

নিদ্রা হইল না। দুঃখে বালিকার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু সে দুঃখ কাহাকে জানাইবে, কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বড় দুঃখের সময় বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। পিতার সেই অসীম স্নেহ, সহোদরের সেই অপার ভালবাসা সে সমস্ত স্মরণ হইল। বালিকা অতি অল্পদিনই তাহার আস্বাদ পাইয়াছিল। অল্পবয়সেই সে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। অভাগিনী আর কি কখন ও তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পাইবে? স্নেহময় সে পিতা কোথায়? প্রাণের সে ভ্রাতা কোথায় রহিলেন? যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এতদিন ধরিয়া কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিলেন তাঁহারাই বা কোথায়? কাশীধামে তাঁহাদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। গিরিবালা ও কেন সেই সঙ্গে সঙ্গে মরিল না? জগদীশ! অভাগীর অদৃষ্টে কত দুঃখ লিখিয়াছ? চক্ষেরজলে বিছানা ভাসিয়া গেল। বাড়ীর সকলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল—কেহই জানিল না, গোপনে বালিকা আপন শয্যায় শুইয়া রোদন করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশায় নৈরাশ্য—নৈরাশ্যে দুষ্প্রবৃত্তি।

"নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভগ্নপ্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিঃশ্বাস ছাড়ি—'না ছাড়িব আশা'।"

পলাশির যুদ্ধ।

আশা কুহকিনী,—কুহকিনী হইলেও আশা মনুষ্যের জীবন, আশা মনুষ্যের প্রাণ। এজগতে আসিয়া কে কবে আশার কুহকে ভুলে নাই? রোগশোকজরাগ্রস্ত দুঃখযন্ত্রণাপূর্ণ বিপদসঙ্কুল এই সংসারে থাকিয়া আশার ছলনে ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যে কখন ভবিষ্যৎসুখ কল্পনা করে নাই, সে সংসারের কিছুই জানেনা, তাহার জীবনে জোয়ার ভাঁটা নাই। কিন্তু আশা কুহকিনী, কার কবে আশা পূরিয়াছে? নৈরাশ্য আশার পার্শ্বসখী, অমল জ্যোৎস্নার কাল মেঘ, উজ্জ্বল আলোকের ঝঞ্ঝাবায়ু। মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে আশার বিমল কিরণ না খেলিতেই নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার আসিয়া তাবৎ হৃদয় ছাইয়া ফেলে। নৈরাশ্যে মন ডুবিয়া যায়; আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাহস, নূতন ভরসা জাগিয়া উঠে। আশা ও নৈরাশ্য, নৈরাশ্য ও নবোৎসাহ—পরস্পর বিরোধীভাবে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে।

এতদিন ধরিয়া যে আশা অতিযতনে হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিল, এতদিন ধরিয়া যে আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সুখে হউক দুঃখে হউক এ জীবন এক প্রকার চলিয়া গেল, বিনোদের সেই আশা আজ ফুরাইয়াছে। এক দিন—তখন অষ্টমীর চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল হাসিতে হাসিতে বাদ্য বাজাইয়া দিনাজপুরের রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া অনেক লোক চলিয়া যাইতেছিল—গৃহের অলিন্দের একপার্শ্বে সতীশচন্দ্র ও বিনোদের পিতা বৃদ্ধ রাজীবলোচন দুইজনে মন্ত্রণাপূর্ণ, সখ্যতাপূর্ণ অনেক কথা হইতেছিল;

অপর পার্শ্বে দুই বৎসরের বালিকা সুহাসিনীকে কোলে করিয়া বিনোদ দাঁড়াইয়াছিল। বাদ্যরব শুনিয়া 'বর বর' করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বালক বালিকা ছুটিতেছে, বালিকা আধ আধ স্বরে 'বল বল' করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর চলিয়া গেল, বালিকা তখন ও হাসিয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল—'বল'। এ কথা সতীশচন্দ্র শুনিলেন, হাসিতে হাসিতে তাঁহার বন্ধুকে শুনাইলেন: বালিকা স্বয়ম্বরা হইয়াছে; স্থির হইল, অতঃপর বিনোদ সুহাসিনীকে বিবাহ করিবে।—এ সমস্ত বিনোদ শুনিল, রাজার জামতা হইবে—আহ্লাদে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সুহাসিনীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশা বাড়িতে লাগিল। বিনোদ আশার ছলনে ভুলিল। আজ সেই আশা টুটিয়াছে, বিনোদ ঘোর নৈরাশ্যে নিমগ্ন।

এক পিতা ভিন্ন কেহ ছিল না, অনেক দিন হইল তাঁহার ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। রাজীবলোচন নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না, তাহার ও অনেক সম্পত্তি ছিল, একটি ছোট খাট জমীদারী ও ছিল। অল্প দিনেই বিনোদ সে সমস্তের অধিকারী হইল। অল্প বয়সে ধনাধিকারী হইলে যাহা হইয়া থাকে একে একে তাহা সকলি হইল, কিছুই বাকি রহিল না। একে একে লক্ষ্মীর বরযাত্রগণ দলে দলে আসিতে লাগিল, শ্লোকের ঘটায়, হাস্যের ছটায়, গীত বাদ্যের তরঙ্গে দিবারাত্রি গৃহমণ্ডলী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহাতে ও বিনোদের হৃদয়ে শান্তি ছিলনা, এক আশার জ্বালা হৃদয়ে জ্বলিতে ছিল। কবে সে সুহাসিনীকে বিবাহ করিয়া আরও অতুল ধনের অধিকারী হইতে পারিবে? দুই দিবসের পথ হইলেও আশায় ভুলিয়া বিনোদ মাসের মধ্যে দুইবার দিনাজপুরে যাইত। অবোধ! জান না যে আশা কুহকিনী, আজ জন্মের মত সকল আশা তিরোহিত হইল।

সতীশচন্দ্র বিনোদকে ভাল বাসিতেন; কিন্তু তাহার ব্যবহারে ইদানীং কিছু রুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই সতীশচন্দ্র বড় ধর্ম্মভীতু লোক, একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। আজ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তিনি

শুনিয়াছিলেন, বিনোদ বিবাহ করিয়াছে; পূর্ব্ব হইতে বিনোদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবার বিনোদ আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করাতেই তিনি স্পষ্ট বলিলেন,—"আমি কৃতদার পাত্রকে কন্যা সমর্পণ করিব, এখন প্রতিজ্ঞা করি নাই।"—আশা টুটিল। মাথা ঘুরিল, বিনোদ উত্তর করিতে পারিল না। আজ দুই বৎসর হইল, বিনোদ কাশীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, দৈবাৎ এক দিন পথে কতকগুলি দস্যু আসিয়া তাহাকে গুরুতর আঘাত করিয়া নিকটে যাহা ছিল সমস্ত লইয়া পলায়ন করিল। বিনোদ দারুণ প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল; কতক ক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিল স্মরণ হয় না, জ্ঞান হইলে দেখিল যে, এক অপরিচিত ভগ্ন গৃহে শুইয়া রহিয়াছে, অঙ্গের স্থানে স্থানে অস্ত্রক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে, আর একটী বালিকা ধীরে ধীরে সেই রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বালিকাকে চিনিতে পারিল না, তখনই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ঘোর বিকার উপস্থিত হইল। এক পক্ষ পরে জ্ঞান হইলে বিনোদ আপনার অবস্থা বুঝিল; দেখিল, সেই বালিকা পূর্ব্ববৎ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রুষা করিতেছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় শীর্ণ বড় মলিন। বুঝিল, তাহার কারণ—অনাহার, অনিদ্রা, চিন্তা; কিন্তু একজন অপরিচিতের জন্য এত কষ্টকেন, তাহা বুঝিল না। প্রত্যহ বালিকা সেই ভাবে বসিয়া বিনোদের সুশ্রুষা করিত। প্রত্যহ বিনোদ তাহাকে দেখিত, এক একবার কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে ও তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। সম্মুখে পারিত না, গোপনে থাকিয়া বালিকা ও তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। একদিন বিনোদ বালিকাকে কাছে ডাকিয়া তাহার পিতামাতার কথা জিজ্ঞাসা করিল বালিকা কিছুই বলিল না, নীরবে চক্ষু হইতে ফোটা ফোটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এক মাস পরে বিনোদ গিরিবালাকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিল। এ বিবাহের কথা এত দিন বিনোদ অনেকের নিকট গোপন রাখিয়াছিল; তাহার ভয়—পাছে সতীশচন্দ্র শুনিতে পান। হঠাৎ তাঁহার মুখে ঐ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, কথা সরিল না। সাহসে ভর করিয়া তথাপি বিনোদ বলিল—

"তাহাকে বিবাহ করি নাই; সে নিরাশ্রয়া, আশ্রয় দিয়াছি মাত্র।"

"প্রতারণা করিও না, আমি জানি সে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

সতীশচন্দ্রের স্বর স্থির, গম্ভীর, অসন্তোষব্যঞ্জক।

"বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন, সে আপনার কন্যার দাসী হইয়া থাকিবে।"

"আমি সপত্নীর ঘরে কন্যা দিব না। বিরক্ত করিও না, চলিয়া যাও।" উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, সতীশচন্দ্র বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। ক্ষুণ্ণমনে ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে বিনোদ চলিয়া গেল। একবার সুহাসিনীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল; অন্বেষণ করিল, বহু অনুসন্ধানের পর বকুলতলায় সাক্ষাৎ মিলিল। কি জানি কেন সুহাসিনী জ্ঞান হওয়া অবধি—যে দিন চারুর সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই বিনোদকে দেখিতে পারিত না। দেখিলে কেমন ভয় হইত, শরীর কাঁপিয়া উঠিত। সে তাহার পিতার কথা শুনে নাই, বালিকাবুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছিল তাহাই করিল, দুই একটী কথা কহিয়াই ভয়ে ভয়ে দৌড়িয়া পলাইল। বিনোদ ভাবিল, সুহাসিনীও ঘৃণা করিয়া চলিয়া গেল। আশা ফুরাইল।

আশার পরিবর্ত্তে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হতাশ হইয়া বিনোদ আপনার বাটী আসিল। অনেক ভাবিল, অনেক তর্ক করিল, কিছুই মীমাংসা করিতে পারিল না। নৈরাশ্যে দুঃসাহস জন্মে, নৈরাশ্যে দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। বিনোদ দেখিল, গিরিবালাই একমাত্র অন্তরায়; স্থির করিল, তাহাকে পথ হইতে সরাইতে হইবে। কিন্তু সেই ভালবাসার কি এই প্রতিদান? সেই শরীরপাত করিয়া সুশ্রূষার কি এই পুরস্কার? সেই প্রাণময় উপকারের কি এই প্রত্যুপকার? মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় আকুলিত হইল। তৎক্ষণাৎ দুষ্প্রবৃত্তি নানা তর্ক আনিয়া উপস্থিত করিল, সে তর্কের স্রোতে কুটীর ন্যায় পূর্ব্বচিন্তা সকল ভাসিয়া গেল। অভাগিনীর কপাল পুড়িল। সে রাত্রি আর গিরিবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না, বাহিরেই শুইয়া রহিল। সহসা দ্বিপ্রহর রাত্রে গিরিবালাকে গৃহমধ্যে দেখিয়া নিমেষের জন্য বিনোদ জ্ঞানহারা হইয়াছিল, ভয়ে, বিস্ময়ে, দুঃসাহসে হৃদয় মথিত হইয়াছিল। ছলনায় ভুলিয়া বালিকা গৃহের বাহির হইবা মাত্র দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পুনরায় অত ডাকিলে ও

উত্তর দিলনা, নিস্তব্ধ ভাবে বিছানায় শুইয়া রহিল। একা পাইয়া দুষ্প্রবৃত্তি আবার উত্তেজনা করিতে লাগিল। কুসুমের কথা কার্য্যে পরিণত হইল; বৈকালে দুইজনে বসিয়া যে অঙ্ক পাঠ করিয়াছিল, যাহা পড়িতে পড়িতে অশ্রুর পর অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিয়া গিয়াছিল, বালিকার এই নবীন জীবনে তাহারই অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। স্থির হইল, সেই কাল রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাও চিরদিনের মত সে নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

আর্য্য-চিকিৎসা।

—০‡০—

ভূমিকা।

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং মারোগ্যং মূল মুত্তমম্।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী লাভের মূল সুস্থতা; অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকিলে এই চারিটীর সকল গুলিই লাভ করা যাইতে পারে। শরীর অসুস্থ থাকিলে ইহাদের কোনটীই লাভ করা যাইতে পারে না। মন সতত এরূপ চঞ্চল ও স্ফূর্ত্তিবিহীন থাকে, যে সেরূপ মন লইয়া কোন শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতে আদৌ সাহস হয় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে এ প্রকার চিন্তা স্থান পায় না, স্বাস্থ রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং সেই জন্যই বঙ্গবাসী প্রায় সকলেই দুর্ব্বল ও রুগ্নকায়। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, ক্ষীণকায় লোক থাকেন তবে তাঁহারা বঙ্গবাসী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক যদিও ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি স্বাধীনদেশবাসীদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে, কিন্তু তাহারা বঙ্গবাসীদিগের অপেক্ষা দেহ সম্বন্ধে যে অনেক অংশে উন্নত তাহার আর সন্দেহ নাই।

যে সকল কারণ বশতঃ বঙ্গদেশস্থ ও অন্যান্য স্থানবাসীলোকদিগের

দৈহিক এত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "আর্য্য চিকিৎসা" শাস্ত্রের প্রতি অনাদর প্রকাশই তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান ও প্রথম কারণ বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশবাসীরা আপনাদের আদি পুরুষ, সেই ঐশ্বর্য্যভোগ বিরত, ফল মূলাশী তপোব্রত তাপসগণের বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষাসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী কোন কার্য্য করিতে সহজে অগ্রসর হন না। শরীর কিঞ্চিন্মাত্র অসুস্থভাবাপন্ন হইলেই তাঁহারা এককালে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতপদে বিদেশীয় ঔষধালয়ে উপস্থিত হন; এবং সত্বর রোগ হইতে মুক্ত হইবার মানসে বিদেশীয় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সকল এরূপ অনুপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করেন যে, তাহা তাঁহাদের দুর্ব্বল ধাতুতে সহ্য হয় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন, বিদেশীয় ঔষধ কোন অলৌকিক স্বর্গীয় পদার্থ হইবে, উহা সেবন মাত্র রোগাক্রমণ-জনিত যাতনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। একবারও ভাবেন না, এদেশের উদ্ভিদ এদেশের প্রকৃতির যেমন উপযোগী, ভিন্ন দেশীয় উদ্ভিদ সেরূপ কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম এই, যে বস্তু যেখানকার প্রয়োজন, তাহা সেই খানে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ দেশীয় ঔষধ এদেশবাসীদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর।

বঙ্গবাসীগণ ইহা বুঝেন না। তাঁহাদের এই দোষে সোণার বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া জ্বর ও নানা প্রকার উৎকট পীড়ার প্রভাবে শ্রীভ্রষ্ট ও মলিন হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গের কোন স্থানে সুখ নাই। যেখানে যাও, হাহাকার রব। কেহ জ্বর, কেহ অজীর্ণ, কেহ রক্তামাশায়, কেহ অম্লপিত্ত, কেহ শিরঃপীড়া, কেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, কেহ বা অন্য আর একটী রোগে আক্রান্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টে কাল হরণ করিতেছেন। যেখানে বিশুদ্ধ জল বায়ু ও বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রাপ্তির সুবিধা আছে, সেখানে রোগের প্রকোপ অনেক কম সত্য, কিন্তু সেখানকার মধ্যে যাঁহারা অবৈধরূপে বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। চোরের ন্যায় সঙ্কুচিত চিত্তে কোন রূপে দেহটী লইয়া আছেন মাত্র। যে দেশের লোক যে পরিমাণে বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করে, সে দেশের লোক সেই পরিমাণে রুগ্ন বা স্বচ্ছন্দ কলেবর। ভারতবর্ষের মধ্যে বেহার

ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক বিদেশীয় ঔষধ সহজে ব্যবহার করেন না; তাহাদিগকে বিলক্ষণ হৃষ্ট, পুষ্ট এবং বীর্য্যশালীও দেখা যায়। বঙ্গবাসীরা ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন না; তাঁহাদের দেহ, মন ও ধাতু সুতরাং নিস্তেজ না হইবে কেন?

অদ্যকার এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে আমরা বিদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির নিন্দা করিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইউরোপীয় জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞান এক্ষণে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। উহা যদিও অদ্যাপি এমন কোন ও একটী ব্যাপার সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে নাই আর্য্যভূমিতে যাহার সূত্রপাত হয় নাই, তথাপি উহাকে এখন আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা হীন বলিতে পারা যায় না। উহা হইতে অনেক সার সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বঙ্গ দেশের যে সকল লোক ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত ও অম্বিকাচরণ রক্ষিত প্রভৃতি সুশিক্ষিত চিকিৎসকদিগের ন্যায় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্বদেশজাত ভৈষজ্যের পরীক্ষা ও তাহার বহুল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বজাতীয় লোকের দুঃখ যন্ত্রণা অনেক নিবারণ হইতে পারে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহপ্রাঙ্গনে না হয় উদ্যানকাননে বিবিধ রোগের অনায়াস-লভ্য অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এবং তাহাদের অনেকগুলি ইউরোপীয় ঔষধের উত্তম প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত ও হইতে পারে। বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ যত দিন এবিষয়ের গবেষণায় অধ্যবসায় সহকারে নিয়োজিত না হয়েন, এবং এদেশবাসীরাও বিদেশীয় ঔষধের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বদেশজাত ঔষধ ব্যবহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতেছেন, ততদিন তাঁহাদের মঙ্গল নাই। তাঁহারা অপটু শরীরের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিবেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

মধ্যে ইংরাজী ভাষাজ্ঞ বঙ্গবাসীগণের ইংরাজি ধর্ম্ম, ইংরাজি বিদ্যা, ইংরাজি আচার ব্যবহারের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা অনেক সময় আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য রীতি নীতির প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষভাব

প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের চক্ষে ভারতের ধর্ম্ম, রীতি, নীতি অতি অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলই মন্দ, তাঁহারা এরূপ বোধ করিতেন। ভারত এক সময়ে পৃথিবীস্থ সকলজাতির পরম পূজনীয় ছিল, এক সময়ে ভারত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আকর বলিয়া আদৃত হইত, এক সময়ে জ্ঞানালোকলাভ জন্য পৃথিবীর সমস্তজাতি দীনভাবে ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত। এক সময়ে ভারতের অক্ষৌহিণী সকল রাজা ললিতাদিত্যের সাহায্যে দুস্তর গিরি কানন অতিক্রম করিয়া তুর্কিস্থান, বোখরা প্রভৃতি দূরস্থ প্রদেশ সকল জয় করিয়াছিল, ইত্যাকার কথা শুনিলে তাঁহারা এরূপ বিকট হাস্য করিতেন যে, তাহা দেখিলে আতঙ্কে অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিত।

কিন্তু এক্ষণে কিয়ৎপরিমাণে স্রোতঃ ফিরিয়াছে। এখন হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু আচার ব্যবহার ও হিন্দু গ্রন্থের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে বঙ্গবাসীদিগের অনেকে তাহা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শ্রবণ করিতে দেখা যায়। ভারতের পূর্ব্ববীর্ত্তিকলাপ অনুসন্ধানে আশুপ্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, ইহা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

এই শুভ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন সুশিক্ষিত কবিরাজ দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। সুখের বিষয়, ক্ষীণকলেবর উদ্যমহীন বঙ্গবাসীদিগের ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাহাদিগের মধ্যে কয়খানি সাধারণোপযোগী হইয়াছে বলিতে পারি না। এক্ষণে এরূপ পুস্তক হওয়া আবশ্যক, যাহার মূল্য অল্প হইবে, অথচ যাহা পাঠ করিয়া সাধারণে চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে সাধারণ চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় যতদূরসম্ভব সরল ভাষায় আমরা আজ প্রত্যেক রোগের লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, দ্রব্যগুণ, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে ক্রমে ক্রমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিষয়টি অতি গুরুতর, আমাদিগের ন্যায় হীনবুদ্ধি অদূরদর্শী ব্যক্তির দ্বারা কতদূর সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে, বলিতে পারি না।

প্রথম অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রচার।

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥"

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, আয়ুর শুভাশুভ, রোগের কারণ ও তাহার নিবারণোপায় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষশ্লোকবিশিষ্ট সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত এক অতি প্রাঞ্জল আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষের নিকট হইতে অমরশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার দ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র, ইন্দ্রের নিকট হইতে ভগবান্ আত্রেয়, আত্রেয়ের নিকট হইতে অগ্নিবেশ, ভেল, হারীত, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি প্রভৃতি মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক একখানি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া দেবলোকে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পর, কথিত আছে, যৎকালে ভূমণ্ডলে বিবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া মনুষ্যাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরমায়ুর বিঘ্ন সম্পাদন করিতে লাগিল, তৎকালে তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় ভরদ্বাজ, নারদ, অঙ্গিরা, গার্গ, মরীচি, বশিষ্ঠ, পরাশর, ভৃগু, ভার্গব, গৌতম, হারীত, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, দেবল, বিশ্বামিত্র, বালখিল্য, গালব, মার্কণ্ডেয়, শৌনক, বামদেব, জমদগ্নি, শরলোমা প্রভৃতি তেজঃপ্রতিম ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ তপোব্রত তাপসগণ হিমালয় পর্ব্বতের এক পার্শ্বে সকলে সমবেত হন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদের সকলের প্রস্তাব ও মতানুসারে ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

ইহাঁর পর অনন্তদেব করুণাপরবশ হইয়া ব্যাধিপীড়িত, শোকব্যাকুল রোদনপরায়ণ মানবগণকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া মুনিপুত্ররূপে পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি চরের ন্যায়

আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে নাই, এই হেতু তিনি একাল পর্য্যন্ত চরক নামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি আত্রেয়শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত তন্ত্র শাস্ত্রের সংস্কার ও সার গ্রহণ করিয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ চরক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

ইহাঁর পর ধন্বন্তরি লোকহিতার্থ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া বারাণসীতে এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূলোকে দিবোদাস নামে বিখ্যাত হন। ব্রহ্মা ইহার বাল্যকালেই নানাবিধ সৎকার্য্যানুষ্ঠান ও কঠোর তপস্যা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইহাকে কাশীর রাজপদ প্রদান করেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি একখানি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋষিবর বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুত—বৈতরণ, ঔরভ্র, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত প্রভৃতি অপর একশত মুনিকুমার সমভিব্যাহারে বারাণসীতে গমন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ কাশীপতি ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তাঁহারা লোকোপকারার্থে প্রত্যেকে এক একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থ সাধারণে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহার বিমল যশকণা সমস্ত সভ্যপ্রদেশ আলোকিত করিয়া আছে। যত দিন মানবজাতির চিকিৎসা শাস্ত্র বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন সুশ্রুতের নাম লোপ হইবার নহে।

সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার কিছুকাল পরে, দ্বিতীয় ধন্বন্তরি-সদৃশ বাভট জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। ইহার প্রণীত "অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা" নামক চিকিৎসা গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

বাভটের পর সিদ্ধ নিত্যনাথ, টুণ্টুনিনাথ, মাধব কর, চক্রপাণি দত্ত, নরসিংহ পণ্ডিত, ভাবমিশ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ যথাক্রমে "রসরত্নাকর", "রসেন্দ্র চিন্তামণি", "নিদান," "চক্রদত্ত," "রাজনির্ঘণ্ট," ও "ভাবপ্রকাশ" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল প্রকাশ করেন। ভাব প্রকাশের পর আর কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই। ভাবমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা বিশেষরূপ হইয়াছিল। ভাবমিশ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ

ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে ইহাঁর অদ্বিতীয় নৈপুণ্য ছিল। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের রাজদণ্ড গ্রহণের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি বারাণসীতে অবতীর্ণ হন।

(ক্রমশঃ) শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

কুসুম উদ্যানে কুসুম চয়নে।

—ooo—

কুসুম উদ্যানে কুসুম চয়নে
কে কে যাবি তোরা আয় লো আয়।
বাগানের শোভা ফুল মনোলোভা
মরি কি সুন্দর দুলিছে বায়!
জাঁতি যুঁথী বেলী গোলাপ শেফালি
ফুটিয়া বাগান করেছে আলো;
ফুল ফুল রাজি তুলি সাজি সাজি
মনোসাধে মালা গাঁথি গে চল।
সুরভি-সুঘ্রাণে তুষিবে লো প্রাণে
ঘুচিবে মনের বিষাদ ভার;
তনু-স্নিগ্ধকর পরশ সুন্দর,
দেবতাবাঞ্ছিত কুসুম-হার।
(কিন্তু) বড়দুখ মনে এমর ভুবনে
স্থির-সুখ-প্রদ কিছুই নহে;
এই আছে এই দেখিতে না পাই,
সেই ক্ষোভে চিত সদাই দহে।
যে কুসুম চয় নিরখি হৃদয়
হ'তেছে প্রফুল্ল আজি এখন,
কালি এ সময়ে ও দেরি হেরিয়ে
সুখ-বিনিময়ে ঝুরিবে প্রাণ।
কেহ বা শুখা'বে, কেহ বা ঝরিবে,
কেহ নতমুখ হইয়ে র'বে;
আঁখি-মুগ্ধকর এ শোভা সুন্দর
দুষ্ট কাল আসি হরিয়ে ল'বে।
কৃতান্তের করে এই রূপ নরে
হইবে করিতে জীবন দান,
হ'বে এই গতি নাহি অব্যাহতি
জানিও নিশ্চয়, না হ'বে আন।
যৌবনের মান, রূপের গুমান,
দুরান্ত কৃতান্ত করিবে চুর;
হ'ক্ বলবান্ কিম্বা ধনবান্
নিমেষে ভাঙিবে সকল ভুর!
অতএব, মন, নিশ্চয় মরণ
আজি কিম্বা দিন দু তিন পরে
জানিয়ে নিশ্চয় থাকিতে সময়
ভাব সে পরম-পুরুষ-বরে।
আর, যতক্ষণ থাকিবে জীবন,
ক্ষুদ্রপ্রাণ এই ফুলের মত,
স্বীয় সদাচারে তোষবে সবারে,
পর-উপকারে হওরে রত;

শ্রীমতী বসুমতী দেবী *

* বসুমতী বালিকা, বালিকার রচনা বলিয়াই আজ আমরা অতি আদরের সহিত ইহা কল্পনায় প্রকাশিত করিলাম। বালিকার কবিতায় হেমচন্দ্রের সে গভীরতা, বিহারিলালের সে পদলালিত্য, ভুবনমোহিনীর সে প্রতিভা না থাকিতে পারে, কিন্তু বালিকার সেই অসংস্কৃত ক্ষুদ্র হৃদয়ের যতটুকু উচ্ছ্বাস তাহা বড় মন্দরূপে পরিব্যক্ত হয় নাই। সম্পাদক।

বঙ্গের বাল বিধবা।

—:০:—

এতদিন নির্জ্জনে বসিয়া যাহার জন্য কাঁদিয়াছি, যাহার বিষয় মনে ভাবিলে শরীরের রক্ত শুখাইয়া যায়—হৃদয়ের স্তরে স্তরে আগুণ জ্বলিয়া উঠে—শোকে ক্ষোভে মনোবেদনায় নখাগ্র হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে—প্রাণের ভিতর একরূপ অনিবার্য্য যাতনা আসিয়া উপস্থিত হয়; আজ সেই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী বঙ্গের বালবিধবার দুঃখময় জীবনের এক অঙ্ক "কল্পনার" পাঠকগণকে দেখাইব। কিন্তু সমাজ যাহাকে চায় না, আত্মীয় স্বজন যাহার অকাল মৃত্যুতে সুখানুভব করেন, স্নেহময়ী জননীর অসীম স্নেহ ও যার প্রতি হ্রাস হইয়া যায়, সেই দুঃখিনী বাল-বিধবার প্রতি কাহার সহানুভূতি হইবে? কে তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া দুই এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিবে? হিন্দু সমাজ আজ ও গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, এই সমাজের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি শোচনীয়! আর্য্যনারীর এতদূর অবনতি ভাবিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বল বলিয়া সমাজ তাহাদের অবনতি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিধবা আবার সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে অধিকতর দুর্ব্বল, তাই আজ তাহার এই অধিকতর শোচনীয় অবস্থা। যাঁহার ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা আছে তিনি ভিন্ন এ শোচনীয় অবস্থা কে উপলব্ধি করিতে পারিবে? মনে ব্যথা পাইয়াছি, হৃদয়ের ভিতর ভয়ানক চিতা জ্বলিতেছে, তাই একবার আজ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব—কাঁদিব আর দেখিব, বাঙ্গালীহৃদয় কত নিষ্ঠুর—কত কঠিন!

বঙ্গের বাল-বিধবা! বজ্রধ্বনির ন্যায় উচ্চারিত হইবা মাত্র হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সর্ব্বশরীর দিয়া তাড়িত প্রবাহ বহিতে থাকে, প্রাণের ভিতর কে যেন আগুণ জ্বালিয়া দেয়; এককালে সহস্র বৃশ্চিক দংশন

করিলে যে জ্বালা জন্মে, সে জ্বালাও ইহার তুলনায় সামান্য মাত্র। কি[illegible]ন এ পোড়া মন তাহাদের জন্য এত কাঁদে জানি না, দিব[illegible] নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? জগদীশ! [illegible] এরূপ কাঁদিতে হইবে? কত কাল পরে বঙ্গের বাল-বিধবার দুঃখ নিবারণ হইবে? তাহাদের যে কোন ক্ষমতাই নাই, প্রভু! দুর্ব্বলের বল তুমি—অগতির গতি তুমি, তুমি কৃপা না করিলে তাহাদের যে আর কোন উপায় নাই।

ভাই সকল! অধিকবয়স্কা বিধবার কথা কিছু বলিতেছি না, একবার বঙ্গের বাল-বিধবার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিয়া দেখ। কুসুম দশবৎসর বয়সে বিধবা হইল, তাহার স্বামীর মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজন সকলে রোদন করিল, কুসুম ও নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিল; কিন্তু কেন কাঁদিল—কাহার জন্য কাঁদিল বালিকা তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিল না। ছয়মাস হইল কুসুমের বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের পর তিন দিবস মাত্র সে শ্বশুরালয়ে ছিল, সে তাহার স্বামীকে একবারও ভাল করিয়া দেখে নাই। বিধবা স্ত্রীলোক যে এ সংসারে কিছুই নয় বালিকা তাহা জানিত না, একজনের মৃত্যুতে (যাহাকে বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দূরসম্পর্কীয় বলিয়া জানিত) তাহার জীবনের সকল সুখ সকল আশা সকল ভরসা যে ফুরাইয়া গেল বালিকা তখন ও তাহা বুঝিতে পারিল না। ক্রমে ৪।৫ বৎসর গত হইল, বালিকা এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিল; এক্ষণে সে নিজের অবস্থা বুঝিল—বুঝিল যে তাহার কপাল অনেক দিন হইল পুড়িয়াছে। একদিন আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিতে দেখিয়া যাহার জন্য নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়াছিল তাহার কথা মনে পড়িল, আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দিবারাত্র কাঁদিয়া কি হৃদয়ের জ্বালা গেল? সে জ্বালা যাইবার নয়, একদিন সেই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি জ্বলন্ত চিতায় শয়ন না করিলে আর এ জ্বালা যাইবে না। কিন্তু ইহাতেও বাঙ্গালির কঠিন হৃদয়ের সাধ মিটিল না, ইহার ও উপর আবার ভয়ঙ্কর অত্যাচার! বিধবা কোনরূপ অলঙ্কার পরিতে পাইবে না, অৎসামান্য বস্ত্র পরিধান

করিয়া একসন্ধ্যা আহার করিয়া সংসারে দাসীর ন্যায় তাহাকে দিন যাপন করিতে হইবে। নিরাভরণা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গের বাল-বিধবার মলিন মূর্ত্তি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পরিবারস্থ এরূপ হতভাগিনীকে দেখিয়া কোন্ আত্মীয়ের হৃদয় ব্যথিত না হয়?

এতদূরে আসিয়া ও দুঃখিনীর দুঃখময় জীবনের শেষ হইল না। ইহা অপেক্ষা আরো হৃদয় বিদারক ভয়ঙ্কর এক অভিনয় আছে। যাহার বিষয় ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে, লেখনী আপনা হইতে স্তব্ধ হইয়া যায় তাহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণের চিরস্থায়ী কলঙ্কস্বরূপ—কাল একাদশী। একাদশী বিধবার কি ভয়ঙ্কর দিন! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে তথাপি এক ফোঁটা জলপান করিতে ও তাহার অধিকার নাই। ঐ দিনে—ঐ ভয়ঙ্কর দিনে কুসুমের সধবা মাতা সমস্তদিন কাঁদিয়া সন্ধ্যার সময় অশ্রুজলের সহিত দুইচারি গ্রাস অন্ন মুখে তুলিতেছে আর তাহার একমাত্র বালিকা কন্যা তখন ও মুখে বিন্দুমাত্র জল দেয় নাই! অনেক দিন হইল বাল-বিধবার দুঃখময় জীবনের যে দৃশ্য দেখিয়াছি এজন্মে তাহা ভুলিতে পারিব না। বৈশাখ মাস—বেলা চারিটার সময় এক দ্বাদশবর্ষীয়া হতভাগিনী বিধবা আসন্নমৃত্যু রোগীর ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, নিকটে শয্যার চারি পাশে বসিয়া জননী প্রভৃতি আত্মীয়গণ নীরবে রোদন করিতেছে; বালিকা অতি ক্ষীণস্বরে বলিতেছে—"মা, তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া যায় একটু জল—আর কিছু চাহি না, মা, একটু জল।" এ অঙ্কের যবনিকা কোথায় শেষ হইল আপনারা ভাবিয়া দেখুন, লেখক ইহার পর লিখিতে অক্ষম; চক্ষের জলে কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে।

শাস্ত্র! শাস্ত্র!! ঐত দোষ, বঙ্গের শাস্ত্র কি এতই কলঙ্কময়? কেবল কি অসহায়া অবলাদিগকে শাসিত করিবার জন্যই শাস্ত্রের জন্ম? হিন্দু-শাস্ত্রকারের শরীরে কি দয়ামায়া ছিল না, তাহার ঘরে কি বিধবা কন্যা জন্মে নাই? এই সকল অত্যাচারের বিষয় যখন আমরা ভাবি তখন বাস্তবিক শাস্ত্রকারদিগের প্রতি আমাদের অভক্তি হয়। তুমি বলিবে, তাঁহাদিগের এই সমস্ত নিয়ম করিবার এক উদ্দেশ্য ছিল—সে উদ্দেশ্য

এত মহৎ যে ভাবিলেও হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। উদ্দেশ্য—আর্য্য-নারীর সতীত্ব রক্ষা। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ কর, যে সকল জাতি সভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে তাহাদের স্ত্রীজাতির সতীত্বের সহিত এই অর্দ্ধসভ্য হিন্দুস্ত্রীলোকের সতীত্বের তুলনা করিয়া দেখ, প্রভেদ এখনি বুঝিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ন্যায় স্ত্রীজাতির সতীত্বের গৌরব কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। আর্য্যনারীর স্বামীই জীবন, স্বামীই সুখ, স্বামীই সর্ব্বস্ব। মানিলাম, সেই স্বামীর প্রতি যাহার যথার্থ ভক্তি আছে, তাঁহার মৃত্যুতে সে এ সকল ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। কিন্তু যে বালিকা স্বামী কাহাকে বলে জানিল না, স্বামীর প্রতি ভালবাসা অথবা ভক্তি জন্মাইবার পূর্ব্বেই যাহার কপাল পুড়িল, যাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাঁহাকে দূরসম্পর্কীয় বলিয়া মনে হইত; তাঁহার মৃত্যুতে বলিকা এরূপ কঠোর যন্ত্রণা সহিবে কি প্রকারে? এক কাল রাত্রের দুর্ঘটনায় এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ হইয়াছিল, বালিকা সেই বালিকাবুদ্ধিতে কেমন করিয়া বুঝিবে?

যে ইংরাজ নরনারীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই উচ্চৈঃস্বরে পৃথিবীর দিক্‌দিগন্তে ঘোষণা করিতেছেন, সেই ইংরাজের রাজত্বে অবলার প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচার! যে ইংরাজ অসভ্যজাতির দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য কত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সেই ইংরাজের রাজত্বে আর্য্যনারী কি হৃদয়বিদারক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ! লর্ড বেণ্টিক! সতীদাহ উঠাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। পতঙ্গের পুড়িয়াই সুখ, কেন তাহাকে সে সুখে বঞ্চিত করিলে? প্রতিদণ্ডে প্রতিপলে, প্রতি মুহূর্ত্তে পুড়িয়া মরা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা সহস্র গুণে ভাল। একান্তই যদি বিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়াছিলে তবে "বিধবা বিবাহ আইন' প্রচলিত করিলে না কেন? হতভাগিনীদিগের প্রকৃত দুঃখ মোচন করা হইত। কিন্তু আর কি কোন উপায় নাই? পুরুষ—বলবৎ পুরুষ! তোমরা যতবার ইচ্ছা বিবাহ কর—সহস্র স্ত্রী বর্ত্তমানে ও বিবাহ কর, কেহ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কথা কহিবে না। আর তাহারা স্ত্রীলোক—অসহায়া অবলা, একবার মাত্র বিবাহ করিতে পারিবে তাহাতে তাহাদের

অদৃষ্টে সুখ থাকে ভালই, নচেৎ চিরকাল—যতকাল বাঁচিবে যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহাদের দুঃখে বলবান্ পুরুষের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই! পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর, অসময়ে এদেশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার ঐ পরাশরোদ্ধৃত———

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

শ্লোকের অর্থ কে বুঝিবে? তোমার ন্যায় উন্নতমনা ও দয়ালুহৃদয় ব্যক্তি যদি বাঙ্গালীর মধ্যে আর দুই চারিজন থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের এরূপ দুরাবস্থা হইত না। শিক্ষিত বঙ্গযুবক! তোমরাই বঙ্গের আশা ভরসা, তোমরা কি তোমাদিগের বিধবা-ভগ্নীর বিষয় একবার ও ভাবিয়াছ? আজ-কাল দেখিতে পাই তোমরা সভা লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু সে সভায় চিরদুঃখিনী বঙ্গের বালবিধবার বিষয় কখন ও আন্দোলন করিয়াছ কি? রাজনৈতিক উন্নতি করিবে কর; কিন্তু যদি প্রকৃত উন্নতি চাও, প্রথমে আপনার সমাজের উন্নতি কর।

সুহাসিনী।

———000———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমর-সঙ্কল্পে।

"কহিলা সম্বরি বেগ—না নিবারি তোমা
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র, রণজয়ী;
পালো বীরধর্ম্ম—ভাগ্যে যা থাকে আমার?
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।"

বৃত্রসংহার।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে

সাজাহান অধিরোহণ করিলেন। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—সম্রাট্‌দিগের অসীম ক্ষমতা, অসীম প্রতাপ। যাহা ইচ্ছা তাহাই কার্য্য—কার সাধ্য তার প্রতিবন্ধকতা করিবে? কাসিম খাঁ সাজাহানের বড় প্রিয়পাত্র; কাসিম খাঁ যাহাতে বাঙ্গালার সুবেদার হন, তাহাই বাদসাহের ইচ্ছা; কিন্তু ফেদে খাঁ তখন বাঙ্গালার গবর্ণর বর্ত্তমান। সাজাহান একমাত্র ভালবাসার অনুরোধে বিনাপরাধে ফেদে খাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কাসিম খাঁকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন।

কাসিম খাঁ সুবেদার হইবার দুই এক বৎসর পরেই বাদসাহকে একপত্র লিখিলেন—যে পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় জাতি বাণিজ্য করণাশয়ে হুগলীতে বসতির স্থান পাইয়াছিল তাহারা এক্ষণে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়াছে; হুগলীর নিম্ন দিয়া যে সমস্ত জাহাজ যাতায়াত করে, তাহারা তাহার মাশুল আদায় করিতেছে; সপ্তগ্রাম হইতে সমুদায় বাণিজ্য আপনাদিগের অধিকারে লইয়া গিয়াছে; কখন কখন বা মগদিগের সহিত যোগ দিয়া দল বাঁধিয়া বোম্বেটিয়াগিরি করিতেছে; ফলতঃ পোর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাজাহান পূর্ব্ব হইতে পোর্ত্তুগীজদিগের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। তিনি যখন বিদ্রোহী হন তখন তাহাদিগের গবর্ণর মাইকেল রড়রিকের নিকট য়ুরোপীয় গোলন্দাজ ও কয়েকখানি রণতরি সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রড়রিক তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। এ অপমানটি সাজাহানের মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ছিল, এক্ষণে সুবেদারের পত্র পাইয়া পূর্ব্ব ক্রোধ স্মরণ করিয়া কাসিম খাঁকে লিখিলেন—"এখনই পোর্ত্তুগীজরা আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হউক।' কাসিম খাঁ বাদসাহের আজ্ঞা পাইয়া ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সে উদ্যোগ এত গুপ্তভাবে হইতে লাগিল যে, পোর্ত্তুগীজরা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। বাঙ্গালার প্রত্যেক রাজা, প্রত্যেক জমীদারের নিকট সহানুভূতির নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনেকেই প্রায় পোর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা উদ্বিজিত, সুতরাং অনেকেই এককালে সুবেদারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

যথাক্রমে দিনাজপুরের জমিদার সতীশচন্দ্রের নিকট একজন দূত প্রেরিত হইল। সতীশচন্দ্রের এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা, এক্ষণকার মধ্যে সতীশচন্দ্র একজন বিখ্যাত জমিদার। তাঁহার বদান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রিয়বাদিত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অনেকের মুখে শুনা যাইত। মিত্রপক্ষের তো কথাই নাই, শত্রুপক্ষেরা ও বলিত 'হাঁ লোকটা দাতা বটে, সতীশচন্দ্র একজন দোষেগুণে মানুষ।' আর যাহারা উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভুভক্ত, সকল কথায়ই প্রায় "জল উঁচু নিচু" বলিয়া যাহারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে, তাহারা সতীশচন্দ্রকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত 'আমাদের জমিদার মহাশয় ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রতুল্য, দানে দ্বিতীয় বলিরাজা, প্রজাপালনে দাশরথি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।' সতীশচন্দ্রের অসাক্ষাতে এ কথা বলিত কি না সন্দেহ। যাক্, অন্যে যাহা বলে বলুক, আমরা সতীশচন্দ্রের বিষয় অনেক জানি। সতীশচন্দ্র অতি সৎ, ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জন। দূত আসিয়া যুদ্ধের বার্ত্তা বলিল, স্থির হইয়া সতীশচন্দ্র সমস্ত শুনিলেন; এত যে বৃদ্ধ তথাপি ও সমরোল্লাসে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আপনা হইতে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, কিন্তু বার্দ্ধক্যের শিথিলতা বশতঃ মুষ্টি ভাল রূপে বদ্ধ হইল না। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র আপনা আপনি একটু হাসিলেন; যে হস্তের বলে একদিন কত শত যোদ্ধা মল্লযুদ্ধে ভূশায়ী হইয়াছে আজ সেই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল না, সতীশচন্দ্র একটু হাসিলেন। সে হাসি দুঃখব্যঞ্জক, আক্ষেপসূচক। কিয়ৎকালের জন্য চিন্তায় বৃদ্ধের ললাটরেখা স্ফীত হইয়া উঠিল। অনন্তর গম্ভীরভাবে সতীশচন্দ্র বলিলেন—"দূতপ্রধান, আপনার সুবেদার সাহেবকে আমার নমস্কার জানাইবেন, ঈশ্বর তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করুন। কিন্তু আপনাদিগের ভ্রম হইয়াছে, আমাকে এ যুদ্ধে কিছু বলা বৃথা। এ বৃদ্ধ বয়সে আমি বাদসাহের কি কার্য্যে আসিব?"

অবনতমস্তকে দূত ইহা শুনিল। "আপনার যাহা অভিরুচি, ইহাই সুবেদার সাহেবের নিকট নিবেদন করিব।" সেলাম করিয়া দূত চলিয়া গেল।

দূত ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, দূর হইতে চারুচন্দ্র তাহা দেখিল,

অতি মাত্র ব্যস্ততা সহকারে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল ?"

"কি হইবে ?"

"কর্ত্তা কি বলিলেন !"

"বাঙ্গালী যুদ্ধ বিষয়ে আর অধিক কি বলিবে ? বাদসাহকে বলিতে বলিলেন, বাঙ্গালীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা বাদসাহের ভ্রম।" শুষ্ক ওষ্ঠে দূত একটু হাসিল।

চারুচন্দ্র সতীশচন্দ্রকে জানিত, দূতের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল, বলিল—"সত্য বলিতেছেন, কর্ত্তা ইহাই বলিলেন।"

"বাঙ্গালীদিগের নিকট যবনেরা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা মিথ্যাবাদী নহে।" আবার দূত বিদ্রূপের হাসি হাসিল। চারুচন্দ্র লজ্জিত হইল; বলিল—"ভাল, মহাশয় সুবেদারকে গিয়া কি বলিবেন ?'

"আমরা দূত, যাহা শুনি তাহাই বলিয়া থাকি ; যাহা শুনিলাম তাহাই বলিব।"

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে চারুর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, বলিল—"একটী প্রার্থনা, অনুগ্রহ করিয়া অদ্যকার দিন অপেক্ষা করুন।"

"অপেক্ষা !—অপেক্ষা করিব কিরূপে ? বাঙ্গালীরা যুদ্ধ বিষয়ে যেমন উদাসীন, যবনেরা তেমন নয় ; এখন ও অনেক কার্য্য করিতে আছে।"

"মিনতি করিতেছি, অদ্যকার দিনটা অপেক্ষা করুন। রজনীতে একবার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব; কল্য প্রত্যুষেই প্রস্থান করিবেন।"

"তাহাই হইবে।" নমস্কার করিয়া দূত চলিয়া গেল। প্রতিনমস্কার করিয়া চারুচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের নিকট গমন করিল।

কি জানি কেন দূত চলিয়া যাওয়া অবধি সতীশচন্দ্র একাকী বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিলেন, প্রণাম করিয়া চারু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চারুচন্দ্র সতীশচন্দ্রের কথায় কখনই কথা কহিত না ; সতীশচন্দ্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আজ সুবাদারের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বার বার

তাঁহাকে চারু অনুযোগ করিতে লাগিল। সতীশচন্দ্র চারুকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন ; চারু যখন যাহা বলিত তখনই তাহা করিতেন, কখনই তাহার কথা খণ্ডন করিতেন না। অনেক ক্ষণ পরে সম্মত হইলেন, বলিলেন— "আচ্ছা, বাপু, তোমার মতে যদি মোগলদিগের সহিত যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে না হয় তাহাই হইবে। আমার যেমন ক্ষমতা, আমি সুবাদার সাহেবকে অর্থ সাহায্য করিব।"

চারু চন্দ্র কিছু বলিল না, একটু হাসিল। সতীশচন্দ্র বলিলেন "কথা কহিতেছ না যে।"

"দিল্লীর সম্রাট্‌কে অর্থ সাহায্য করিবেন, আশ্চর্য্য কথা। ধনেশ্বরকে ধনভিক্ষা!"

"তবে তুমিই না হয় বল, আবার কি রকমে সাহায্য করিতে হইবে।"

"কেন, লোকবলে। আপনার অনেক প্রজা তো অস্ত্রশিক্ষা জানে, তাহাদিগকে কেন পাঠাইয়া দিন না।"

চারুচন্দ্রের শেষ কথা সতীশচন্দ্রের কর্ণে বাজিল, স্থির হইয়া সতীশচন্দ্র শুনিলেন। নিভৃত বহ্নির ন্যায় আবার সেই সমরলালসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের শরীর তাম্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। গম্ভীরস্বরে সতীশচন্দ্র বলিলেন—"কি বলিব, হৃদয় দেখাইবার নয় ; চারু, যথার্থই তুমি আমার হৃদয়ের কথা বলিয়াছ ; আমারও উহাই একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু কে তাহাদিগের নায়ক হইয়া দুর্দ্দান্ত পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে? এ বৃদ্ধ বয়সে হস্ত আর তো অস্ত্রধারণ করিতে পারে না।" বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। চারু তাহা দেখিল, মনে মনে দূতকে সহস্র গালি দিল ; তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসি লইয়া সতীশচন্দ্রের পদতলে রাখিয়া বলিল— "কেন, এ দাস থাকিতে আপনি যুদ্ধে যাইবেন কি জন্য? অনুমতি করুন, এ দাস এখনই আপনার অভিলাষ সাধন করিবে। আজ কতদিন হইল আপনিইত এই অসি আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন ; আজ্ঞা করুন, অসির সম্মাননা করিয়া দাস কৃতার্থ হউক।"

সতীশচন্দ্র শিহরিলেন। যুগপৎ হর্ষবিষাদে হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। "ঈশ্বর তোমায় চিরজীবী করুন। তুমি বালক, কতকগুলি অশিক্ষিত

সৈন্য লইয়া কেমন করিয়া বাদসাহের কার্য্য সাধিবে? আমি কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমায় সেই ভীষণ যুদ্ধে বিদায় দিব? সুহাসিনী ও তুমি তো আমার ভিন্ন নও, আমি তোমায় যুদ্ধে পাঠাইতে পারিব না।" বৃদ্ধের স্বর স্থির, গম্ভীর, স্পষ্ট; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

"বৃথা সঙ্কুচিত হইতেছেন। জানি যে আপনি আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আমি ও আপনাকে পিতা বলিয়া জানি। আজ পিতার নিকট হইতে পুত্র যুদ্ধের জন্য বিদায় চাহিতেছে। আপনি কোন্ না জানেন, তখনকার স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত আপনার ক্রোড়স্থ শিশুকে সাজাইয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন। আজ এই ভিক্ষাটি দিন, প্রশস্তমনে অনুমতি করুন, যুদ্ধে গমন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

সতীশচন্দ্রের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নিস্তব্ধভাবে একবার চারুর প্রতি চাহিলেন। চারুর দৃষ্টি মৃত্তিকাসম্বদ্ধ, নয়ন হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, হস্ত কৃপাণমুষ্টি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; ললাটের সেই রেখা ভীষণভাবে স্ফীত হইয়াছে। বালকের এই বীরলক্ষণ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্ত্রীজনোচিত সে শোক বিস্মৃত হইলেন, মুহূর্ত্তের জন্য আপনার সে বাল্যকাল স্মরণ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধের হৃদয়ে সমরলালসা জন্মিল। গাঢ়ভাবে চারুচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব জানেন এ হৃদয়ে কি হইতেছে। কি বলিব, তুমি বালক; কিন্তু না বালক হইলেও তুমি বীর, বীরপুত্র তাহার সন্দেহ নাই; আমি কেমন করিয়া বীরোচিত কার্য্যে তোমাকে নিষেধ করিব? কেমন করিয়াই বা যুদ্ধে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইব?"

চারু দেখিল সতীশচন্দ্রের চক্ষুঃ জলভারাক্রান্ত, মুক্তাবিন্দুর ন্যায় পক্ষ্মাগ্রে অশ্রুবিন্দু ঝুলিতেছে; বলিল—"আশঙ্কা করিবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, ঐ চরণ প্রসাদে আবার আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের কথা কহিয়া সুখী করিতে পারিব।"

আবার সতীশচন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন, কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন; চারুচন্দ্রের সঙ্কল্প বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া বাষ্পগদগদস্বরে বলিলেন—"তবে যাও বৎস, বীরধর্ম্ম পালন কর। ঈশ্বর সহায় হউন—

বৃদ্ধের অন্য ভরসা নাই, তিনি তোমাকে পদে পদে বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু দেখিও, বৃদ্ধকে যেন—" আর কথা সরিল না, অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। নানারূপে চারুচন্দ্র বুঝাইল, নানারূপে সান্ত্বনা করিল; প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া বিদায় হইল। শূন্যমনে সতীশচন্দ্র বসিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

গচ্ছতিপুরঃশরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতংচেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

সেই রাত্রে চারুচন্দ্র সেই দূতের নিকট গমন করিল। এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া দূত চারুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেখিবামাত্র অভিবাদন করিয়া বলিল—"কি সংবাদ? যবনেরা ভ্রান্ত, ভরসা করি বাঙ্গালীরা আপন কথা ভুলিবে না।"

"ভুলিলে বাঙ্গালী এত রাত্রে আবার এখানে আসিত না। দূতবর, কল্য প্রত্যূষেই কি আপনার গমন করা স্থির হইল?"

"আবার কি কল্য ও অপেক্ষা করিতে বলেন।

"কল্য সমস্ত দিন নয়, অন্ততঃ এক প্রহর পর্য্যন্ত।"

"কেন?"

"এখনও প্রজাদিগের অনেকে শুনে নাই, তাহাদিগকে বলিতে ও সকলের প্রস্তুত হইতে কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।"

"বুঝিলাম না, প্রজারা কি করিবে?"

"আপনার সহিত এ অধম তাহাদিগকে লইয়া দিল্লীশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে গমন করিবে।"

যবনদূত আশ্চর্য্য হইল, ভাবিল—"এ বালক, বালকের কথা কি যথার্থ? যথার্থই কি আমরা ভ্রান্ত?" চারুচন্দ্র দূতের মনোভাব বুঝিল, বলিল—"সত্য বলিতেছি কল্যই আমরা যাত্রা করিব; একসঙ্গে যাইতে পারি

ইহাই আমার প্রার্থনা।"

দূত বলিল—"ভাল, তাহাই হইবে।" মনে মনে বলিল—"কিন্তু বালকের কথা বুঝিতে পারিলাম না।" অভিবাদন করিয়া চারুচন্দ্র চলিয়া গেল।

প্রত্যূষে উঠিয়াই চারুচন্দ্র যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্ত আহরিত হইতে লাগিল, একে একে প্রজাগণ সজ্জীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। চারুচন্দ্র নিজে সাজিল। একবার সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা হইল। অনেক দিন—আজ প্রায় আট মাস হইবে সুহাসিনীর সঙ্গে চারুর সাক্ষাৎ ছিল না। চারু জানিত সুহাসিনীকে সে পাইবে না; বিনোদের নিকট সতীশচন্দ্র প্রতিশ্রুত আছেন তিনি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। সতীশচন্দ্র ও বিনোদে কি কথা হইয়াছিল তাহা সে জানিত না, সে জানিত সুহাসিনীলাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। কিন্তু মন বুঝে না; চারু কত চেষ্টা করিত—কতবার সুহাসিনীকে কেবল ভগিনী বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিত, পারিত না। যে দিন মালা পরিবার সময় চিত্তের ভয়ানক বিকার হইয়াছিল, সেই দিন হইতে চারু স্থির করিল আর সুহাসিনীর সঙ্গে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিবে না। কিন্তু তাহা হইলেই কি মন বুঝে? বিদায় হইবার সময় একবার সেই মুখখানি দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। দেখা করা উচিত কি না অনেক ভাবিল, ইচ্ছার প্রতিকূলাচারী হইতে পারিল না। ধীরে ধীরে অন্তঃপুর মধ্যে সুহাসিনীর গৃহে গমন করিল।

অতি গাঢ়মনঃসংযোগে সুহাসিনী একখানি চিত্র আঁকিতেছিল। হস্তে তুলিকা ধীরে ধীরে নড়িতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে, গুন্ গুন্ করিতে করিতে একাকিনী বসিয়া সুহাসিনী চিত্র আকিতেছে। নিঃশব্দে চারুচন্দ্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। বালিকা দেখিতে পাইল না, চারু ডাকিল—"সুহাস।" স্বরে বালিকার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল, চিত্র ফেলিয়া পশ্চাতে ফিরিল—"কে ও চারু।" আর কথা স্ফুরিল না, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। "সুহাস, চুপ করিলে কেন? কি বলিবে, বল।"

"চারু তুমি কি ভুলিয়া গেলে, এতদিন কোথাছিলে, ভাই? কি কুক্ষণেই যে সে দিন প্রভাত হইয়াছিল বলিতে পারি না। শৈল দিদি

কোথায় চলিয়া গেলেন, তুমিও আর সে দিন হইতে একবারও আসিলে না তোমার তো কোন অসুখ হয় নাই ?"

" না, আমার কোন অসুখ হয় নাই। তুমি একা বসিয়া কি করিতেছ ?

" শৈল দিদি যাওয়া অবধি আমি একাই থাকি। দাঁড়াইয়া রহিলে কেন ? ব'স না "

চারুচন্দ্র উপবেশন করিল। অনেক দিনের পর দুইজনে আবার কত কথা আরম্ভ হইল, আগ্রহ ও আনন্দের সহিত সুহাসিনী কত কথা বলিতে লাগিল। বালিকার আর কি কথা ? কখন শৈলবালার কথা বলিতেছিল, কখন চারুচন্দ্রের সেই দিনকার কথা বলিতেছিল, বলিতে বলিতে বালিকার সেই বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটী জলে পূরিয়া আসিতেছিল। কখন বা কি আঁকিতেছিল অতি আগ্রহে তাহাই দেখাইতেছিল, অতি আগ্রহে চারুচন্দ্র তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিল। বালিকার সে কথা অনন্ত— আগা নাই গোড়া নাই অথচ তাহা অনন্ত ; তেমন কতদিনে বলিলেও তাহা শেষ হয় না। চারুচন্দ্রের সময় নাই, সকলে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে আর বিলম্ব করিতে পারে না। বালিকার সেই মধুমাখা কথা শুনিয়া যে অতুল সুখ—ইচ্ছা করিয়া তাহাও ভঙ্গ করিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে বলিল—" সুহাস, তুমি ব'স, আমি এখন যাই।"

চমকাইয়া বালিকা বলিল—" সে কি, ইহার মধ্যে কোথায় যাবে ? আমি যে পাখীটি পুষিয়াছি তাহাতো তোমায় দেখান হয় নাই। সে কেমন পড়িতে শিখিয়াছে, ব'স আমি তাহাকে লইয়া আসি।"

হাসি আসিল। ঈষৎ হাসিয়া চারু বলিল—" আজ থাক্, এখন যাই অন্য সময়ে আসিয়া দেখিব।"

" না, তুমি আর আসিবে না ; সেই সে দিন ' আসি' বলিয়া গিয়াছিলে আর আজ দেখা পাইলাম। আবার কবে আসিবে চারু ?"

চারুচন্দ্র নিস্তব্ধ। গম্ভীর স্বরে বলিল—" সুহাস ! আর বোধ হয় আসিতে হইবে না, এই বুঝি শেষ দেখা।" বালিকার চক্ষে জল আসিল, " কেন তুমিও কি দিদির মত আর এখানে থাকিবে না ?"

" না।"—চারুর স্বর বাষ্পপীড়িত।

বিস্মিত হইয়া বালিকা চারুর প্রতি চাহিল। এতক্ষণ ভাল করিয়া দেখে নাই, আহ্লাদে আপন কথা লইয়াই উন্মত্ত ছিল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, বলিল—"আজ তোমার এ বেশ কেন, চারু?"

"অদ্যই যুদ্ধে যাত্রা করিব।"

"যুদ্ধে?" "হাঁ।"

"পিতাকে বলিয়াছ, তিনি কি বলিলেন?"

"প্রথমতঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, অবশেষে আমাকে স্থিরসংকল্প দেখিয়া অনুমতি দিয়াছেন। সুহাস! তুমিও বিদায় দাও, যদি বাঁচিয়া থাকি পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, না হয়—" আর কথা বাহির হইল না। স্থির হইয়া বালিকা শুনিল, তাহার সেই আয়ত-ইন্দীবর-সদৃশ চক্ষু দুটি অশ্রুভরে টল টল করিয়া আসিল, চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"যাবে, কবে?"

"এখনই!"

"এখনই!—" স্বর কাতরতাপূর্ণ, তাহা বালিকার অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিল। সে স্বরে চারুর হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল। একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া চারু বলিল—"সুহাস! আমি চলিয়া গেলে কি তোমার কষ্ট হইবে?" বালিকা উত্তর করিল না, এ কথার উত্তর নাই। নীরবে গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কে ডাকিল—"সুহাস!" বালিকা বুঝিল পিতা ডাকিতেছেন। অশ্রু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে পিতার নিকট চলিল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চারু তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। মনে মনে বলিল—"ত্রিকালদর্শিন্! তুমিই জান ভবিষ্যতে কি হইবে? এ রহস্য বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু এ রত্নলাভ কি অদৃষ্টে হইবে না? লীলাময়! তোমার লীলা কেমন করিয়া বুঝিব?"

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি?

—:০:—

এ জগৎশরীরে যে চৈতন্য আছে তাহা কিছু প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, তাহা

ত প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। তবে সেই চৈতন্যের ভৌতিক সংযোগোৎপন্নতার ও তাহার আণবিক গত্যবস্থের অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে পারা যায় না। কথাটা উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিয়া দিতেছি। মনে কর একটী সুরম্য সজ্জিত গৃহে এক পরমাসুন্দরী ষোড়শী সভঙ্গী আসীন রহিয়াছেন। সম্মুখে ভিত্তিগাত্রে দীর্ঘায়তন দর্পণ বিলম্বিত, রমণী স্বীয় অতুলরূপরাশির ভুবনভুলান ক্ষমতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছেন। পশ্চাদ্দিকে যেন তোমাকে দেখিতে পাইয়া বঙ্কিম-গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ চম্পকাঙ্গুলি দিয়া সরাইয়া স্মিতমুখে চটুলনয়নে তোমার পানে চাহিলেন। তোমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চক্ষুকর্ণ দিয়া তাড়িত-প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণশোণিত ছুটিতে থাকিল, বুকের ভিতর শব্দ হইতে লাগিল—দুপ্ দুপ্ দুপ্। হইতে পারে তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব, মাথার মণি, নয়নের তারা, সুখদা, মোক্ষদা। এক্ষণে তোমার ঈদৃশী দশা দেখিয়া, তুমি যে একটী প্রাণবন্ত পদার্থ একটী সচেতন বস্তু, তাহাতে আমার আর দ্বিধা রহিল না। সেই অসামান্য সৌন্দর্য্যতরঙ্গ, সেই প্রণয়ঙ্করী লোচনভঙ্গী কিরূপে তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ে গিয়া আঘাত করিল, তথা হইতে কি উপায়ে তোমার মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় কার্য্য সাধনান্তর এতাদৃশী চঞ্চলতা ও ধৈর্য্যচ্যুতি বিধান করিল তাহা আমি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম। নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে যে গৃহমধ্য আমোদিত রহিয়াছে ইহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু তোমার নাসারন্ধ্র হইতে মস্তিষ্কে নীত হইয়া কিরূপে তোমাকে এরূপ বিভোর করিয়া তুলিল— তাহাও কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইলাম। সহাস্য বদনশশী খানি তোমার দিকে ফিরাইয়া রমণী কি মোহমন্ত্র ছড়াইয়া দিল, তাহা তোমার কর্ণকুহরমধ্যে লব্ধমার্গ হইয়া কি প্রকারে তোমার মস্তিষ্ক মধ্যে বজ্র বিদ্যুৎ মত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কেমন করিয়াই বা তাহা তোমার এরূপ উন্মত্ততায় পরিণত হইল তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এরূপ হইল কেন? এরূপ ঘটে কেন?— ইহা লুপ্তবলবুদ্ধি হইয়া তুমিও যেমন বুঝিতে পারিলে না, আমিও তেমনি তাহা বুঝিবার জন্য শত চেষ্টা করিয়াও বিফল প্রযত্ন হইলাম। আবার দুঃখের উপরে দুঃখ এই যে,

এবিষয়ে তোমার আমার যে দশা, যাঁহারা এ সমস্ত তথ্য আজীবন অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব উদ্ভিন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণ করিতেছেন, সেই বিজ্ঞানগতপ্রাণ হক্সলি, সেই বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিণ্ডেলের ও সেই দশা। তাই বলিতেছিলাম, জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি কিরূপে সংসাধিত হয়, ভৌতিক পদার্থে প্রাণ সম্ভূত হয় কি প্রকারে তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। মস্তিষ্কমধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট রূপ সঞ্চরণ হইতে ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শজ্ঞান, প্রভৃতি এরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুর উদ্ভব মৃত্তিকাগঠিত মনুষ্যদেহে অনুভূতির উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। জলজন, অম্লজন, কার্ব্বণ ইত্যাদি ভৌতিক পদার্থসমূহ যে স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে তাহাই সাহজিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সংঘর্ষে বা সমবায়ে কিম্বা তাহাদের সংযোগে চৈতন্যের প্রস্ফূরণ হইবে তাহা বুদ্ধির অগম্য, কল্পনার অতীত।

কিন্তু জড়পদার্থে যে চৈতন্য আছে, চৈতন্য থাকিতে পারে তাহা স্থির নিশ্চয়। আবার চৈতন্য যে জড় হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু তাহাও ঠিক্। অথচ জড়নিরপেক্ষ চৈতন্য নাই। জড়পদার্থই প্রাণের অধিষ্ঠানভূত। খনিজ পদার্থ হইতে ক্রমবর্দ্ধিতবিকাশ হইয়া মনুষ্যদেহে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐ যে লজ্জাবতী লতাটি স্পর্শজ্ঞানের অধীন হইতে না হইতে ক্ষুদ্র বাহুগুলি নত করিল, ক্ষুদ্রতর পল্লবগুলি সঙ্কুচিত করিল; আর এই যে ব্রীড়াবনত বঙ্গবালিকা পত্যুদ্গ্রীতহস্ত হওয়ায় সঙ্কুচিতভাবে, রক্তিমবদনে মাটি পানে চাহিয়া রহিল এবং লজ্জায় যেন মরিয়া গেল;— এতদুভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে চৈতন্যের ভাব কোন অংশেই পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। আর ঐ যে বনলতা করতালি মাত্র শ্রবণে অভিবাদনচ্ছলে মস্তক হেলাইয়া দোলাইয়া বদ্ধপরিকর হইল, দুইটি পত্র একত্রীকৃত করিল, এবং আমাদের এই মসীজীবী ক্ষুদ্রপ্রাণ কেরাণী মহাশয় ইংরাজ প্রভুর ডাক শুনিতে না শুনিতে সাভিবাদন কৃতাঞ্জলিপুটে হুজুরে গিয়া হাজির হইল— এতদুভয়ের শব্দশাস্ত্রে সমান অধিকার বলিয়া প্রতিভাত হয়। যে চৈতন্য উদ্ভিদসংসারে নিদ্রিত রহিয়াছে জীবজগতে তাহাই জাগরূক রহিয়াছে মাত্র। প্রভেদ—

পরিমাণে, প্রকারে নহে। অথচ এই প্রভেদ হইতেই জীবসংসারের শ্রেষ্ঠত্ব। এই জন্যই জীবনবিবর্জিত জড়জগৎ জীবনসমন্বিত প্রাণিনিচয়ের উপভোগ্য. এই হেতুই একটী ভোগী আর একটী ভোগ্য, একটি খাদক আর একটী খাদ্য। চৈতন্যই ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের শ্রেষ্ঠতা-শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডস্বরূপ। ভৌতিক পদার্থে চৈতন্য নাই, সেইজন্য সুষুপ্তচৈতন্য উদ্ভিদ্‌সংসার ইহার উপভোক্তা। আবার উদ্ভিদ্ অপেক্ষা জীবসংসারে চৈতন্যের বিকাশ কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায়, সেই হেতু উদ্ভিদ্ জীবমাত্রের আহার। জীবমাত্রে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয় তাহা সহজজ্ঞান (Instinct) নামে প্রখ্যাত। মনুষ্যে চৈতন্যস্ফূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং সেই আধিক্য বিচারশক্তি (Reason) রূপে পরিব্যক্ত। এই বিচার-শক্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য তীক্ষ্ণনখদন্তহীন, স্বল্পবল, অনাচ্ছাদিতদেহ, ও সম্পূর্ণ নিঃসহায় হইয়া ও পৃথিবীর রাজা, জীবমণ্ডলীর অধিপতি, সকলের শাসনকর্ত্তা।

আবার অন্য দিকে দেখ, যে ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষ ও সমবায় সূর্য্য-কিরণ কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়া উদ্ভিদ্‌সংসার সৃজন করিয়াছে, সেই ভৌতিক পদার্থের জটিল সংযোগ বিয়োগেই জীবজগৎ রচিত। উদ্ভিদ্ কার্ব্বন গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লজান ত্যাগ করিল, জীব উদ্ভিদ্ আহার করিল এবং নিশ্বাস দ্বারা অম্লজান গ্রহণ করিল। সেই অম্লজান, কার্ব্বন ও জলজান হইতে গৃহিত হইয়া, মনুষ্যদেহে পুনরায় আবার তাহাতেই পরিণত হইতেছে, অস্থি, মজ্জা, মাংস, রুধিরের পরিবর্দ্ধন করিতেছে, শরীরে তেজ ও পুষ্টি আনিয়া যোগাইতেছে। এক অবস্থায় যে কার্ব্বন হইতে অম্লজনের বিশ্লেষ ক্ষুদ্র গুল্মের প্রথম রেখাপাত করিল, ভিন্ন অবস্থায় সেই সংযোগ হইতেই মনুষ্য দেহ রচিত হইতেছে। ভাল, বুঝিলাম যেন, এই যে ক্ষণভঙ্গুর দেহযষ্টি—যাহার জন্য এত আয়াস, এত আহ্লাদ, যাহা লইয়া এত আশা, এত অহঙ্কার, এত আকিঞ্চন, সেই দেহ পরিবর্ত্তন-শীল পঞ্চভূত মাত্রে গঠিত; ঐ যে মৃৎপুত্তলিটী বালকের করে শোভা পাইতেছে, ইহা উহা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ সম্পাদেই বিভূষিত নহে। যে জীবন আছে বলিয়া এ বালকটী হইতে ঐ পুতুলটির প্রভেদ সম্যক্

উপলব্ধি হইতেছে সেই জীবনই জড় পদার্থের অবস্থাভেদ মাত্র। লোক কথায় বলিয়া থাকে "কুটাগাছটীর ভরসা আছে তবু মানুষের ভরসা নাই" সেরূপ এক প্রকার সত্য বটে ; কোন্ সময়ে যে যমরাজ আসিয়া জীবন-সূত্র ছেদন করিয়া যাইবেন কে বলিতে পারে ? কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণবন্ত পদার্থ যে অচেতন পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। প্রাণী আছে বলিয়াই জড় জগতের মহিমা—অচেতন পদার্থের গৌরব। নতুবা কে তাহা উপলব্ধি করিত ? কে তাহার সার্থকতা সম্পাদনে সাক্ষীব স্বরূপ বিদ্যমান রহিত ?

সুন্দর সুরভি পুষ্প কোরকসময়ে কীটদষ্ট হইয়া বৃন্তচ্যুত হউক, যদি ভ্রমর তাহার মধুপান না করিল; যদি বায়ু তাহার গন্ধ বহিয়া আনিয়া ঘরে ঘরে না যোগাইল। জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া চন্দ্রিমা বিলুপ্ত হইয়া যাউক, যদি ক্ষুদ্রপ্রাণ চকোর তাহার সুধাপান না করিল ; দর্শনমুগ্ধকারী দীপ নির্ব্বাপিত হউক, যদি ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাতে উড়িয়া পড়িয়া পুড়িয়া না মরিল ; স্বয়ং পৃথিবী কক্ষভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে যাউক, যদি তাহা মানবজাতির ভোগে না আসিল। তাই বলিতেছি, বুঝিলাম যেন মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব ; বুঝিলাম যেন বিচারশক্তি আছে বলিয়া আমরা সকল প্রাণীর শিরোভূষণ। কিন্তু জীবদেহে যে চৈতন্য জন্মে তাহা কেমন করিয়া ? এবং যে উপায়ে জন্মে তাহা নৈসর্গিক কি অনৈসর্গিক ? সম্মুখস্থ মস্যাধারটি তুমি যে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলে তোমার হস্তের পেশী মধ্যে তদ্ধেতু যে সকল কার্য্যাবলী সংসাধিত হইয়া তেজ উদ্গত করিল, সামান্য ইন্ধনসংযুক্ত অগ্নি হইতে অবিকল সেই পরিমাণ তেজ উদ্ভাবিত করাইয়া অবিকল সেই কার্য্য সহজেই সম্পাদন করিতে পারা যায়। পূর্ণ বন্দুকের ঘোড়াটী টিপিয়া দিলে ধূমরাশি উদ্গত হইয়া শত হাত দূরে গুলি গিয়া পড়িল। লৌহমাত্রগঠিত নির্জ্জীব কলের গাড়ি অগ্নিসাহায্যে ছয় দণ্ডে ছয় দিনের পথ অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে, আমরা অবাক্ হইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় কেবল দেখিতেছি ; কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে নিশ্চেষ্ট। আমাদের পেশী মধ্যে যে তেজরাশি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত

হয় কখন এবং কেন—এবং সেই কার্য্য করিবার প্রণোদনাই বা আসে কোথা হইতে তাহা আমরা চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে অসমর্থ, তাহার কারণ নৈসর্গিক কি অনৈসর্গিক সে বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

(ক্রমশঃ)

শিশির কি পড়ে?

—:০:—

ফোটা, ফোটা, ফোটা। এমন সুখের বাসন্তী প্রভাতে মৃদুমন্দ-মলয়পবন-সেবনাশায় সাধের বকুলকুঞ্জের তলে গিয়া দাঁড়াইলাম, কোথা হইতে ফোটা ফোটা করিয়া জলবিন্দুর পর জলবিন্দু পড়িয়া সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া গেল। বায়ু সেবন হইল না। কিন্তু ঐ যে বৃক্ষের পত্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে উহা কি? উপমাপটু কবি এখনি এতদুত্তরে কোন নায়ক নায়িকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিবেন. পরদুঃখকাতর বৃক্ষগণ তাহাদিগের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু তাহাই কি সত্য? তবে ঐ অনন্ত রৌপ্যময় পদার্থ—যাহা তৃণের উপর পড়িয়া বালারুণ-কিরণ-সম্পাতে হীরকখণ্ডের ন্যায় ঝিক্ মিক্ করিতেছে উহা কি? প্রাতে উঠিয়া ঘাটে বসিয়া বসুদিগের দাসী বাল-বিধবা হাস্যরূপিনী মালতী গুন্ গুন্ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বাসন মাজিতেছে, কোথা হইতে কণার পর কণা আসিয়া রেণুর পর রেণু পড়িয়া তাহার সেই এলায়িত কবরী সমস্ত ভিজাইয়া দিল। প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিবা মাত্র খাবার পাইয়া নাচিতে নাচিতে বালক উন্মুক্তপদে দৌড়িয়া যাইতেছিল তাহার মাতা তাহাকে পাদুকা পরিয়া যাইতে বলিলেন, বালক শুনিল না; একটু পরেই দুরান্ত বালকের পা দুখানি কে আসিয়া জলসিক্ত করিয়া দিল। আবার দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের

তেজ বাড়িল, একে একে তৃণ হইতে এক একটী করিয়া রত্নগণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতের সে শোভা, তৃণের সে মুকুট, বৃক্ষের সে অশ্রু কোথায় অদৃশ্য হইল। এ চমৎকার অদ্ভুত পদার্থ কি? ছিল কোথায় আসিল বা কোথা হইতে এবং গেলই বা কোথায়?

বিজ্ঞানবিদ্ বলিলেন ইহার নাম শিশির। শিশির কবির আদরের ধন। দেশীয় বিদেশীয় সকল কবি অতি আদরে অনেক বিষয়ে ইহার উপমা দিয়া থাকেন, হেমচন্দ্র হইতে বটতলার কাব্যলেখক পর্য্যন্ত আজও ইহার বিষয় দুই এক কলম লিখিয়া অন্ন করিয়া খাইতেছেন। শিশির স্বর্গীয় বস্তু। মোজেস্ জোসেফকে আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিলেন "ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তি! স্বর্গের অমূল্য পদার্থ শিশির তোমার রাজ্যে সর্ব্বদা নিপতিত হউক।" বুঝিলাম, শিশির অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু সত্যই কি শিশির স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে? ভাষার সৃষ্টি হওয়া অবধি সকলে শুনিয়া আসিতেছেন—'শিশিরপতন,' জ্ঞানী মূর্খ সকলেই বলিতেছেন—'হিম পড়িতেছে।' কিন্তু যথার্থই কি হিম পড়ে, উপর হইতে শিশির পতিত হয়?—অমূলক কথা। শিশির উপর হইতে পড়ে না, পৃথিবীতে ইহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাই, ইহার উপরে ইহা কখনই সে অবস্থায় থাকে না। শিশির পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দূরত্ব অনুসারে পৃথিবীর শৈত্যের তারতম্য। সূর্য্যরশ্মিতে পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সেই তাপে শৈত্যভাগ বাষ্পরূপে উপরে উত্থিত হয়। সমস্ত রাত্রিই সূর্য্যের উত্তাপ থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বটে, কিন্তু সেই তাপে ও বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। দিন রাত্রি পৃথিবী হইতে বাষ্প উঠিতেছে। যাহা দিনে উঠে, উঠিবামাত্র বায়ুরতাপে ছড়াইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই শুখাইয়া যায়, আর আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। কিন্তু সূর্য্যের অবর্ত্তমানে যাহা উঠে, তাহা রাত্রির শীতল বায়ুবশে এবং সাধারণ আকর্ষণনিয়মে গোলাকার বিন্দু সকলে পরিণত হয়। ইহাই শিশিরের প্রকৃতি এবং ইহাই তাহার মূল। সূর্য্যকিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইলেই তাহার জলভাগ

ধূমময় বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া থাকে, সেই বাষ্প পরস্পর একীভূত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করে অথবা আধারোপযোগী অন্য কোন পদার্থে সংলগ্ন হয়; কখন কখন কুজ্ঝটিরূপে আকাশের নিম্নস্তরে ঝুলিতে থাকে। আবার উপর হইতে সূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পড়িলেই কোথায় শুখাইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, শিশির উপর হইতে পড়ে না, ইহা পৃথিবী হইতেই জন্মিয়া থাকে।

তাই বলিয়া একেবারে জলের ন্যায় হইয়া শিশির পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় না। বাষ্প জলের অবস্থাভেদ মাত্র। জলে আমার কাপড়খানি ভিজিয়া গেল, ভিজা কাপড় পরিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা, আমি কেমন করিয়া সে কাপড়খানি জলমুক্ত করিব? বাড়ি আসিয়া কাপড়খানি শুখাইতে দিলাম। সূর্য্যের তেজ থাকিলে হয়তঃ শীঘ্রই শুখাইয়া যাইত, কিন্তু সূর্য্যের সে তেজ ছিল না। বায়ু আসিয়া ধীরে ধীরে সে কাপড়খানি নাড়িতে লাগিল, কে জানে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে জলভাগ অন্তরিত হইয়া কাপড়খানি শুখাইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কৈ, কাপড়ে লাগিবার সময় জল যেমন দেখিতে পাইয়াছিলাম, কাপড় হইতে যাইবার সময় তাহাকে তো দেখিতে পাইলাম না। তবে জল কেমন করিয়া গেল? জল গেল—বাষ্পরূপে। বাষ্প জলের অবস্থান্তর বিশেষ। তেমনি পৃথিবী হইতে একেবারে জল উঠিয়া তৃণাদিতে লাগিয়া শিশিরে পরিণত হয় না। বলিয়াছি তো সূর্য্যকিরণে দিনের বেলা জল পৃথিবী হইতে বাষ্পরূপে উঠিয়া থাকে, সেই বাষ্প আবার বায়ুসঙ্গে মিশিয়া সারাদিন শূন্যে অবস্থান করে। বুঝিলাম, কিন্তু জলবিন্দু আসিল কোথা হইতে? শুনিবে, তবে বলিতেছি। একটী জলপূর্ণ কাচের গেলাসে একখণ্ড বরফ ফেলিয়া গৃহের একস্থানে রাখিয়া দাও, একটু পরেই দেখিবে, সেই গেলাসের গায় বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা যাইতেছে; ইচ্ছা হয় হাত বুলাইয়া দেখ, এখনি হাতখানি জলসিক্ত হইয়া যাইবে। কেন? ও জলকণা আসিল কোথা হইতে? গেলাসের গাত্র ভেদ করিয়া কিছু আসে নাই। গেলাস জল ও বরফ সংস্পর্শে এতদূর ঠাণ্ডা হইয়াছে যে তাহার পার্শ্বস্থ বায়ু উহার গায় লাগিবা মাত্র জমিয়া জলবিন্দুর আকার ধারণ করিয়াছে। তেমনি, রাত্রে যখন পৃথিবীর উপরি-

ভাগ হইতে অনবরত উত্তাপ উদ্গত হইয়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়ে, পৃথ্বীতল যখন ঐ বরফস্পৃষ্ট গেলাসের ন্যায় শীতল হইয়া আসে তখন তাহার পার্শ্বস্থ বায়ু অবিকল গেলাসের ন্যায় তৎসংলগ্ন হইবামাত্র শৈত্যাধিক্য বশতঃ সাধারণ নিয়মে জমিয়া জলবিন্দু আকার ধারণ করে। এই জল-বিন্দুর নামান্তর—শিশির। এবং এই জন্যই বলিতেছিলাম, শিশির উপর হইতে পড়ে না।

শিশির যদি বৃষ্টির ন্যায় উপর হইতে পড়িত, তাহা হইলে সেই বৃষ্টির ন্যায় ঘনঘটাচ্ছন্নআকাশময়ী রাত্রেই ইহা অধিক পরিমাণে পড়িবার সম্ভাবনা-থাকিত; কিন্তু তাহা না হইয়া মেঘশূন্য নির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিই শিশির অধিক পরিমাণে জন্মিবার সময়। বৃষ্টির যে প্রধান সহায় মেঘ, সেই মেঘই শিশিরের পরম বিঘ্ন। বহু ঊর্দ্ধে মেঘ থাকিলেও শিশির হইতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের অতি নিকটে থাকিলে শিশির জন্মে না। পৃথিবী হইতে যে তাপ উপরে উঠিতে যায় উপর হইতে মেঘ আবার তাহাকে বাধা দিয়া ফিরাইয়া দেয়, সুতরাং তাপ উঠিতে না পারায় পৃথ্বীতল শীতল হইতে পারে না। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল না হইলে শিশির জন্মিবে কোথা হইতে? সেই জন্যই আবার বলিতেছি, শিশির উপর হইতে পড়ে না।

এসেক্সনগরে ডাক্তার হিল ও লর্ডপিটার উভয়ে এক দিন রজনীর ভিন্ন ভিন্ন যামে কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে শিশির অবস্থান করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সূর্য্য অস্তগত হইলেই বায়ুর উপর স্তরে স্তরে কতকগুলি রুমাল টাঙ্গাইয়া দিলেন; কতক রাত্রে ঐ সকল রুমাল শিশিরে ভিজিয়া উঠিলেই তাহা পাড়িয়া তৌল করিয়া দেখা হইল। ইহাতে প্রত্যক্ষ দেখা গেল, রাত্রির প্রথম ভাগেই বায়ু অধিকতররূপে শিশির-ভারাক্রান্ত থাকে, যতই রাত্রি অবসন্ন হইয়া আসে ততই তাহার পরিমাণ ও কমিয়া যায়। আবার সেই সকল রুমালের মধ্যে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক্ উপরিভাগে বিলম্বিত ছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ভিজিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ কি?—শিশির উপর হইতে পড়ে না, নীচে হইতেই জন্মিয়া থাকে। পরস্পরসম্মুখীন দুইটি বৃক্ষে

রজ্জু বাঁধিয়া একখণ্ড চতুষ্কোণ কাচ সমভাবে ঝুলাইয়া দাও, দেখিবে, উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ শীঘ্রই ভিজিয়া উঠিবে। নিম্নভাগ অগ্রে ভিজিবে কেন না, যাহা দ্বারা ভিজিবে—যাহা সেই কাচখণ্ডকে নীরনিষিক্ত করিয়া তুলিবে—সেই শিশির পৃথিবী হইতেই জন্মিয়া থাকে, তাহা উপর হইতে পড়ে না।

পতির দ্বিতীয়দার গ্রহণে।

সন্তান হীনা রমণী।

রমণী-জীবন পুরুষ-অধীন,
পুরুষে নিয়ত মগন রয়।
পুরুষের মন বড় সে কঠিন
দেখিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।
রমণী-হৃদয় স্নেহের আলয়
স্নেহের সাগরে নিয়ত ভাসে,
দেখিলে পতির বিরস বদন
স্নেহের কথায় অমনি তোষে।
কি কাজ করিব, কি রূপে চলিব,
কিরূপে রাখিব হরিষে তাঁরে,
করি প্রাণপণ যোগাইতে মন
নারীর মতন কেহ কি পারে?
থাকে অনুগত দিবস রজনী
সাথে সাথে সাথে যেমন ছায়া,
এমনি করিয়ে বেড়ায় ঘুরিয়ে
যেন দেহমন একই কায়া।
পতির আদরে আদরিণী নারী
সে আদর-সাধ সদাই প্রাণে,
পতি-অনাদরে কত যে যাতনা
পরে কি জানিবে, নারীই জানে।
(পতি) কথা কহেহেসে প্রাণেপ্রাণমিসে
বোধ হয় হেন জগতে নাই,
কথাতে কেবল করে যে পাগল
মনে হয় যেন স্বরগে যাই।
নূতন মিলনে কতকি যতনে
কহে কত কথা করিয়ে ছলা,
এমন ছলনা বুঝে কোন্ জনা
তাহে যে অবলা সরলা বালা।
কিন্তু সে ক'দিন? জানেনা পুরুষ
প্রণয় কেমন অমূল্য নিধি,
বালিবাঁধসম ভঙ্গুর প্রণয়ে
পুরুষ হৃদয় গ'ঠছে বিধি।
থাকেন থাকেন কথা নাহি কন
পান থেকে চুণ খসিলে পরে,
জ্বালিয়ে রমণী পাগল অমনি
কহা'বে কথা কি উপায় ক'রে।
বিধির বিমুখে পড়িয়া বিপাকে
সন্তান যদি গো নাহিক হয়,—
ছলনা পাইল প্রণয় ভুলিল
অমনি বিবাহ করিতে যায়।
"প্রেয়সিরে আমি তোমারি কেবল
তোমা ছাড়া আর কারে(ও)না জানি।"
কোথা সে প্রতিজ্ঞা? কোথা সে প্রণয়?
অহো ধিক্! সব শঠের বাণি!

নারীর সর্ব্বস্ব স্বামী মহাধন
স্বামী ধ্যান জ্ঞান, স্বামীই গুরু ;
অবলা-লতিকা জড়া'বার তরে
স্বামীর চরণ আশ্রয়-তরু
রোষ ভরে তায় ছিঁড়িলে পাদপ
নিরাশ্রয়ে কভু বাঁচে কি লতা ?
কাঁদিল কাতরে, জড়াইল পায়,
নিষ্ঠুর তবু না মানিল কথা।
না মানিল যদি কি করিবে নারী ?
কি করিবে তার করুণ স্বরে ?
স্বার্থের গোলাম ভারত-পুরুষ,
অবলা তাহারে কেমনে বারে ?
হৃদয়-শোণিতে প্রেমের অঙ্কুর
ছিঁড়িবে হৃদয় ছিড়িলে তাহা ;
নিঠুরহৃদয় বুঝে না বুঝিল
করিল অনা'সে ইচ্ছিল যাহা।
হৃদয়ের আশা হৃদয়ে মিশা'ল,
অভাগী-কপাল পুড়িয়ে গেল,
জীবন জনম ভরসা বাসনা
একে একে সব নিভিয়ে এল।
নিভিয়ে এলরে সুখের প্রদীপ
দুখের আঁধার ঘেরিল ঘোর;
থাকিতে রজনী—এবে দ্বিপ্রহরা—
অকস্মাৎ নিশা হইল ভোর।
বড় ছিল মনে সুখেতে সংসার
স্বামীসনে যেন করিতে পাই,
মিটিল না সাধ, ভাঙিল স্বপন,
বাড়াভাতে এবে পড়িল ছাই।
কত ভালবাসা, কত মন-আশা,
দুদিন পরেই ফুরা'ল সব।
পরাণ বিদরে মনেতে করিলে
এ দুখকাহিনী কারে বা ক'ব ?
কারে বা কহিব হৃদয়ের জ্বালা
কেবা সে বুঝিবে মরম-দুখ ?
স্বার্থদ্বারে পতি দিতেছেন বলি,
জানা'ব কাহারে ?- ফাটিছে বুক।
ফাটিছেরে বুক, ঝরিছে নয়ন,
তা' বিনা উপায় কি আছে আর ?
কাঁদিবার তরে নারীর জনম
কাঁদাই তাহার হইল সার।
দয়াময় নাকি তুমি, জগদীশ,
তুমি নাকি প্রভু অগতি গতি !
কি দোষে হে তবে—কি দোষে ঈশ্বর
বারেক চাহনা অভাগী প্রতি ?
সংসারের সার জীবনবন্ধন
সুচিরবাঞ্ছিত অঞ্চল-নিধি,
হেন পুত্র-ধনে করেছ কাঙালী
পোড়া প্রাণে তাও স'য়েছে, বিধি,
কিন্তু হেন দুখে হানে শেল বুকে,
কহিতে পারিনে রুধিছে গলা,
আর তো সহেনা, কর গো করুণা,
সহিব আরো বা কতেক জ্বালা !

শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী।

---

* শুভক্ষণে অস্মদ্ সমাজ আবার স্ত্রীশিক্ষার অর্থ বুঝিয়াছেন। বামাগণের রচনা আজকাল আমাদিগের অতি আদরের ধন, অতি আদরের সহিত ইহা কল্পনায় সন্নিবেশিত হইল। লেখিকা নাকি প্রকৃতই কোনও আত্মীয়ার দারুণ কষ্ট দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন। রমণীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া পুরুষের নিকট পুরুষের ব্যবহার জানাইতেছেন, পুরুষ—'নিঠুরহৃদয়' পুরুষ স্থির হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে এই কথাটি শুনিলে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারিবে। সম্পাদক।

মনু ও চাতুর্বর্ণের আশ্রম বিভাগ।

আমাদিগের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের এক্ষণে সংস্কার এই, পুরাকালের ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ নিতান্ত অসভ্য, কুসংস্কারাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত-জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ছিলেন। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতা, মার্জ্জিত সংস্কার ও উদার জ্ঞানালোক বলে, সেই আর্য্যসন্তানেরা প্রকৃত সভ্য-পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছেন। আমরা একথা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। কারণ, আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদিগের আর্য্য রীতি নীতির বিন্দু বিসর্গও অবগত না থাকিয়া, সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। এইস্থলে কুক্কুট মিশ্র আমাদের স্মরণ পথে পতিত হইলেন ;— পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাঁহার সহিত আপনাদের পরিচয় করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

"গুরো গিরঃ পঞ্চদিনান্যধীত্য বেদান্ত শাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায়চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুট মিশ্রপাদাঃ॥"

বেদ শাস্ত্র পাঁচ দিন অধ্যয়ন করিয়া ও বেদান্তশাস্ত্র তিনদিন অধ্যয়ন করিয়া এবং তর্কশাস্ত্র আঘ্রাণ মাত্র করিয়া, ঐ মহামহোপাধ্যায় কুক্কুট মিশ্র পাদ উপস্থিত হইলেন।

আমাদের নব্য সুশিক্ষিতের মধ্যে অনেক কুক্কুট মিশ্র দেখা যায়, সেই জন্য ওরূপ অসংবদ্ধ বচনপরম্পরা শুনিতে হইয়া থাকে। নচেৎ যদি তাঁহারা আর্য্য-গণের সামাজিক রীতি নীতির বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এ উন্মত্ত প্রলাপ শুনিতে হইত না। আমাদের প্রাচীন আর্য্য-গণ, বাস্তবিকই কি অসভ্য ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন? আর আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতা-লোকে

বাস্তবিকই কি সভ্য ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন হইয়াছি? চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার এই উত্তর দিবেন, অতি পুরাকালে আমরা যতদূর সুসভ্য ছিলাম, এবং তৎকালে আমাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার যতদূর উৎকৃষ্ট ছিল, এই বর্ত্তমান সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা সে সভ্যতার বায়ু ও স্পর্শ করিতে সমর্থ হই নাই। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার তাহার শতাংশের একাংশও উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা এতদূর শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও পাশ্চাত্য কুসংস্কারবশে মুগ্ধ হইয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কিছুমাত্র মনোযোগী হই না। আমাদিগের পুরাকালের সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ সুন্দর, সুখকর, স্বাস্থ্যকর ও হিতকর ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এই বিবেচনায় অদ্য আমরা মহর্ষি মনুর চাতুর্ব্বর্ণের আশ্রম বিভাগ সংক্রান্ত নিয়ম ও ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমান সভ্যনামধারী আর্য্য-সন্তানগণের ভ্রম ভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আর্য্য-গণ চারি শ্রেণীতে বর্ণবিভাগ করেন; যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই বর্ণবিভাগ সৃষ্টির বহুকাল পরে নির্ণীত হয়। যথা—

ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

চাতুর্বর্ণের কোনও বিশেষ নাই, কারণ একমাত্র পরব্রহ্মই সর্ব্বময়; পরব্রহ্ম সকল দেহে সমভাবেই অবস্থিতি করিয়া জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। মানব-গণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এস্থলে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি ঈশ্বরই চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি না করিলেন, তবে শ্রুতি একথা বলিলেন কেন? যথা:—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু যদস্য তদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

পরব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উপরি উক্ত বচনটির সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে একবার দেখা যাউক, এ বিষয়ে আমাদের মনু কি লিখিয়াছেন। মনু কখনই শ্রুতির বিরুদ্ধ পথে পদক্ষেপ করিবেন না। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ, ইহাদের মধ্যে শ্রুতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক, তদনন্তর স্মৃতি। স্মৃতির মধ্যে আবার মনুর স্মৃতির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি————————॥"

শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ ইহাদের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হইবে, তথায় শ্রুতিবাক্যই প্রামাণিক হইবে।

"প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।"

সকল স্মৃতি অপেক্ষা মনুর স্মৃতির প্রাধান্য রহিয়াছে।

ইহার একমাত্র কারণ এই,—মনু শ্রুতির বিরুদ্ধ পথে পদক্ষেপ করেন নাই। সেই জন্যই মনুস্মৃতির এরূপ প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

যে স্মৃতি মনুর মতের বিপরীত হইবে, সে স্মৃতিই অপ্রশস্ত।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক মনু কি লিখিয়াছেন। তিনি লেখেন,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" মনুঃ। ১ম। ৩১।

সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বর প্রজাবৃদ্ধি মানসে আপন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র, এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন।"

ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইল, মহর্ষি মনু বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াই সরল ভাষায় আমাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন, যখন শ্রুতি ও মনুর স্মৃতি উভয়ের সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে, তখন, একের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

উক্ত শ্রুতি ও মনুর স্মৃতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক প্রথমোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের সমন্বয় করিবার অগ্রে একবার দেখা যাউক, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কি কি ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে; তাহা হইলেই সাধারণ পাঠকবর্গ, বিশেষতঃ সহৃদয় মহোদয়গণ অবগত হইতে পারিবেন, বর্ণ বিভাগ করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, কি সৃষ্টির পর বর্ণ বিভক্ত হইয়াছিল।—এবিষয়ে মনু কহিতেছেন :—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ॥
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥" ৮৮।৮৯।৯০।৯১

ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্ম্ম কল্পনা করিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের প্রজাপ্রতিপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রক্‌চন্দন বনিতাদির অনবরত অসেবন, সংক্ষেপে কল্পনা করিলেন। বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ও জল পথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ কল্পনা করিলেন। এবং শূদ্রদিগের পক্ষে এই কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা অসূয়াবিহীন হইয়া প্রাধান্য রূপে এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবেক।

এই কয়টি মনুবচন পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও মনুবচন, এই দুইটি কেবল রূপক মাত্র। আমাদিগের জাতি-বিভাগ-কর্ত্তা ব্রহ্মা, সমস্ত সৃষ্টি পরিপালন জন্যই বর্ণ চতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দেশের অগ্রে কখনই তাহারা বর্ণ ও আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেনা।

অগ্রে সৃষ্টি, তৎপরে তাহাদিগের কার্য্য ও কর্ম্মবিভাগ কল্পিত হইয়াছে,

সহৃদয় মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। প্রথমে জীব সৃষ্ট হইল, তৎপরে তাহাদিগের কর্ম্মবিভাগ পরিকল্পিত হইল, সেই অনুসারেই তাহারা জাতিতে পরিগণিত হইল; সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মনে কর, ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রথমতঃ কতকগুলি, শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের ধর্ম্ম, শাসন, জীবিকা ও দাস্য—বৃত্তির আবশ্যক। এস্থলে যদি কতকগুলিকে ধর্ম্মসম্বন্ধে, কতক গুলিকে শাসনসম্বন্ধে কতকগুলিকে জীবিকাসম্বন্ধে ও কতকগুলিকে দাস্য-বৃত্তিসম্বন্ধে নিয়োজিত করা না হয় তাহা হইলে সৃষ্টি চলিতে পারে না। এরূপ স্থলে সাধারণের কর্ম্মবন্ধন নিয়মিত করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি ও কর্ম্ম ভেদ সৃষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে কাহারও সংশয় করিবার ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মা, সৃষ্টি করিলেন, লোকস্থিতি সাধনার্থ তাহাদের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম নির্ণয় করিলেন, ক্রমে তাহাদের বর্ণ বিভাগ করিয়া উচ্চ ও নীচরূপে ব্যবস্থাপিত করিলেন; ইহা না করিলে কখনই সৃষ্টি চলিত না। এই জন্যই আমাদের যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক বলিয়া গিয়াছেন,—"কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।" এবং শ্রুতি ও মনুস্মৃতি রূপকে তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন!

(ক্রমশঃ)

চোখ গেল!

—000—

আবার, আবার ঐ রব? উপরে, অনন্তনীল অকাশে পূর্ণিমার চাঁদ নিজ গৌরবে ধীরে ধীরে ভুবনভুলান হাসি হাসিতেছে; চারিপাশ হইতে হাসিভরা মুখে অসংখ্য তারকা অসংখ্য চাটুকারগণের ন্যায় ধীরে ধীরে সে হাসি লুকিয়া লুকিয়া আশে পাশে ছড়াইয়া দিতেছে; নীচে, কুলকুলসুন্দরীয়া সারি সারি রূপের বাজরা খুলিয়া মুচকি মুচকি

হাসিতেছে ; বায়ু আসিয়া কাণে কাণে কত রসের কথা কহিয়া যাইতেছে, হাসিয়া হাসিয়া পুষ্পসুন্দরীরা এ উহার গায় ঢলিয়া পড়িতেছে ;—পৃথিবী হাস্যময়ী। এই হাসির বাজারে—এই চন্দ্রকরলেখাসমন্বিত জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা রজনীতে—এমন সুখশান্তি-সৌন্দর্য্যপ্রীতিপ্রফুল্লতাপরিপূর্ণ আনন্দ-বাসরে আবার, আবার ঐ রব ?

ঐ রাতি পোহাইল, অরুণ উদিল, পূর্ব্বদিক্ হাসিল, কমল বিকসিল, অসংখ্য কার্য্যে অসংখ্য নরনারী প্রবৃত্ত হইল ; কিন্তু ও রব তো থামিল না। মাথার উপর ঐ সূর্য্য, নলিনীসুন্দরীর এই মুখভরা হাসি, সমীরণের ঐ আনন্দ উচ্ছ্বাস, জাহ্নবীর সেই তরঙ্গভঙ্গী, লতার সেই মৃদুদোলনি, বৃক্ষপত্রের সঙ্গে সূর্য্যরশ্মির ঐ মধুর জড়াজড়ি, বালকবৃদ্ধ যুবক প্রৌঢ়, বালিকাবৃদ্ধা যুবতী প্রৌঢ়া সকলের সংসারে এই সুখের ঘরকন্না—তবু, তবুও ঐ এক বুলি ?

চোখ গেল ! দিন নাই, রাত্রি নাই ও কি কথা, পাখি ? শ্রান্তি নাই বিরাম নাই, পরিশ্রম বোধ নাই বিশ্রামেচ্ছা নাই সাধা গলায় একতানে দিবানিশি যাহা বলিতেছ উহার অর্থ কি ? কিসের কষ্ট, কিসের অবসাদ, কিসের জন্য এত নিদারুণ চোখের ব্যথা ? পাখী তুমি, ফলপুষ্পপত্র-শোভিতপ্রকাণ্ডপ্রকাণ্ডমহীরুহসম্বেষ্টিত নিবিড় কানন তোমার বাসস্থান, অনন্ত অসীম দিগন্তবিস্তারি আকাশ তোমার ক্রীড়া ভূমি—স্বাধীন, উন্মুক্তপদ, স্বেচ্ছাচারী। যথা ইচ্ছা উড়িয়া যাও—প্রভুর ভয় করিতে হয় না, টেক্সের জ্বালায় জ্বলিতে হয় না, গৃহিণীর দেহশোভা বর্দ্ধনের জন্য অথবা পেটের দায়ে লালায়িত হইয়া পরের গোলামি করিবার আবশ্যকতা নাই ; আশা নৈরাশ্য, সুখ দুঃখ, মান অপমান, লালসা অতৃপ্তি এ সমস্ত কিছুরই ধার ধার না ; কত পুরাতন রাজ্য উৎসন্ন গেল, কত নূতন রাজ্য তাহার স্থানে উৎপন্ন হইল তাহার কিছুই সংবাদ রাখ না ; কত লোকের শোণিত পাত করিলে, কত পরিবার অনাথ হইলে, কত দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ অন্ন মারিলে, নিজে প্রতিপন্ন হওয়া যায় সে সমস্ত কূটতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে হয় না—নিশ্চিন্ত, সচ্ছন্দপ্রাণ, সদাতুষ্ট, আপনি আপন প্রভু। তবে কিসের জন্য ক্ষোভ, কিসের জন্য দুঃখ, কিসের জন্য এত অসহ্য যন্ত্রণা ? চক্ষুর এ জ্বালা কেন ?

ঘনপত্রবিন্যস্ত শাখায় বসিয়া, নবীন কিসলয়ে দেহার্দ্ধভাগ লুক্কায়িত করিয়া পাখী আবার ডাকিল—চোখ গেল! আ মরি মরি! এত বেদনা তোমার? তুমি পাখী, সুখ দুঃখজ্ঞান কত তোমার, জানি না, মনুষ্যের মনের ভাব বুঝিতে পার কি না জানি না, বনের বিহঙ্গ তুমি—মরি মরি! এত কাতরতা তোমার? ধর্ম্ম জানেন কিসের ব্যথিত তুমি, কিন্তু যখনি তোমার ঐ রব শুনি কে জানে আমার প্রাণের ভিতর রহিয়া রহিয়া কেমন করিয়া উঠে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উছলিয়া উঠে, হৃদয়ের পরতে পরতে কেমন আঘাত লাগিতে থাকে, বহুদিনবিস্মৃত দুই একটী কথা—যাহার স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই মিলেনা, যাহা স্মরণে দুঃখ অনন্ত, অথচ সেই অনন্ত দুঃখেও কত সুখ!—বহুদিনের সেই সুখস্বপ্ন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে; ভূতপূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা কে জানে কোথা হইতে হৃদয়ে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়; দয়া নাই, মায়া নাই—নির্ম্মম মিঠুর স্মৃতি আসিয়া অমনি চক্ষু বিঁধিতে থাকে; আর দেহের ভিতর হইতে প্রাণ অমনি ছট্ ফট্ করিতে করিতে তোমারি ন্যায়, পাখি, বলিয়া উঠে—চোখ গেল।

তবে আয়, পাখি, তোমাতে আমাতে—দুঃখের যে দুঃখী, ব্যথার যে ব্যথিত—তোমাতে আর আমাতে—এ মর্ম্ম পোড়ানিতে যার সহানুভূতি, এ হৃদয়দগ্ধানিতে যার সহৃদয়তা, এ পোড়া চোখের জ্বালায় যে সে-যা-আমি-তাই—তোমাতে আর আমাতে আয়, পাখি, দুজনে মিলিয়া একবার গলা ছাড়িয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকি—চোখ গেল। ডালে বসিয়া পাতার ভিতর থাকিয়া তুমি তোমার ও স্বরলহরী ছড়াও, আর নীচে থাকিয়া আমিও একবার আমার ভাঙা সুরে ডাকি—চোখ গেল। কিন্তু কেন এত ডাকাডাকি? সে ডাক কাহাকে শুনাইব? কে শুনিবে, মনের ব্যথা কে বুঝিবে, এ চক্ষের জ্বালায় কাহার সহানুভূতি হইবে? তাহা যে হবে না তাহা তো জানি, সেই তো দুঃখ, সেই জন্যই তো তোমার ও যে বুলি আমার ও সেই বুলি, সেই দুঃখেই তো বলিতেছি—চোখ গেল! হায় রে কপাল! কোথায় সেই দীপ্তপ্রভাকরসদৃশঅমিতপরাক্রম চন্দ্রসূর্য্যবংশ আর কোথায় তাঁহাদিগের এই পরপদসেবী বাবদূকতামাত্র-

জীবী বংশধরগণ! কোথায় সেই পুণ্যসৌন্দর্য্যশোভিত আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ আর কোথা এই পাপকদর্য্যতাপূর্ণ ম্লেচ্ছনিবাস বৃটিশইণ্ডিয়া! কোথা সেই বলদর্পিত নিজগৌরবগর্ব্বিত আর্য্যসন্তান আর কোথা এই বলহীন প্রভুপ্রসাদকাঙালী ভারতবাসী! কাহাকে বলিব, কে এ ব্যথা বুঝিবে? কেহ যে বুঝিবে না, চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিলেও যে কেহ বুঝিবে না সেই তো দুঃখ, এই ঘোর অধঃপতনের জন্যই তো বলি—চোখ গেল।

চোখ গেল! অতীতের সেই সুখসরোবর আর বর্ত্তমানের এই মরু প্রান্তর; অতীতের সেই শান্তিনিকেতন আর বর্ত্তমানের এই মহা-শ্মশান; অতীতের সেই সাধের মালঞ্চ, সেই প্রমোদ উদ্যান, সেই সুখকুঞ্জ আর বর্ত্তমানের এই কণ্টকারণ্য; অতীতের সেই দুর্গোৎসব, সেই শারদপঞ্চমী আর বর্ত্তমানের এই হাহাকার এই বিজয়াদশমী; অতীতের সেই লক্ষ্মী আর বর্ত্তমানের এই দুর্ভিক্ষ; অতীতের সে বাহুবল, সে রণোন্মাদ আর বর্ত্তমানের এই বাক্‌পটুতা, এই পলায়নতৎপরতা; অতীতের যেই বশিষ্ঠদেব, সেই সংসারবিরাগী ফলমূলাশী সামগায়ী ঋষিবৃন্দ আর বর্ত্তমানের এই ভাণপূর্ণ স্বার্থকীট 'বিষকুম্ভপয়োমুখ' উপাসক সম্প্রদায়; অতীতের সেই সীতা সাবিত্রী লীলাবতী আর বর্ত্তমানের এই ইনি-উনি-তিনি পতিভামিনী ভারতমহিলা; অতীতের সেই কালিদাস, সেই শকুন্তলা আর বর্ত্তমানের এই তুমি-আমি লেখক আর পচা—বস্তাপচা বটতলার ছাইভস্ম; অতীতের সেই রাজাধিরাজ, সেই সামান্য একটী জমিদার আর বর্ত্তমানের এই রাজাবাহাদুর, এই রায়বাহাদুর, এই ছিঃ-এ-ছাই; অতীতের সেই যশোলিপ্সু আর্য্যসন্তান আর বর্ত্তমানের এই প্রসাদভিখারী ভারতবাসী; অতীতের সে আশা বর্ত্তমানের এই নৈরাশ্য; অতীতের সে আলো বর্ত্তমানের এই আঁধার; অতীতের সে হাসি বর্ত্তমানের এই কান্না, অতীতের সে সুখ বর্ত্তমানের এই দুঃখ; অতীতের সেই অতীত আর বর্ত্তমানের এই বর্ত্তমান—পাখিরে, সত্য বটে—চোখ গেল।

আর কি দেখিব? কি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব, কিসে এ পোড়া

চোখের জ্বালা মিটিবে? ঐ যে সুধাকর হাসিতেছে, হাসিতে হাসিতে তর তর করিয়া নীল সমুদ্রে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে—ভাসিয়া ভাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে ও কি সুখের হাসি? উহাতে কি মন ভুলে? ভুলিত, যখন আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য ছিল, যখন ঐ করলেখা যবনের শ্মশ্রুল মুণ্ডে না পড়িয়া আর্য্যের সেই প্রশান্ত বদনের উপর পড়িত, বিলাসিনীর বেণীবন্ধনের উপর না পড়িয়া যখন অগুরুচন্দনসজ্জিত চিতারোহণোন্মুখী ক্ষত্রিয়বালার উপর নিপতিত হইত, আর যখন তাহা হইতে আবার তাহার ক্রোড়স্থ শিশুর উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়া উজ্জ্বল মধুরে মিলন হইত। ভুলিত, এক সময়ে ভুলিত বটে—এখন ভুলে না। কিন্তু কি বলিতেছি—চাঁদ তো কলঙ্কী! আর ঐ যে সরোবরে কমলিনী মৃদুমধুর হাসিতেছে, হাসিয়া হাসিয়া বায়ুহিল্লোলে অমল জলে দুলিতেছে—দুলিয়া দুলিয়া হাসিতেছে—ও হাসি? কিন্তু নলিনীর কোরকে তো কীটের বাসা! তবে কি দেখিব? যাহা দেখি, যাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব মনে করি—একটু ভাল করিয়া দেখিলেই যে আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না, চোখের জ্বালা বাড়ে বৈ যে কমে না। দেখিবার আর কিছু নাই। এক সময়ে ছিল, এখন নাই। যখন ছিল তখন প্রতি তৃণাগ্রভাগ, তাহার উপর প্রতি শিশির বিন্দু, সেই শিশিরে প্রতি বালারুণ-রশ্মির খেলা কত সুন্দর দেখাইত, চক্ষে কত সুধা ঢালিয়া দিত, দেখিয়া মন ভুলিত, চক্ষু জুড়াইত। এখনও সেই তৃণ, তৃণের উপর সেই শিশির, সেই শিশিরে আবার সেই ভানুকিরণ—তবে তেমন দেখায় না কেন? কেমন পোড়া চোখ তাহা দেখিতে চায়না কেন? দেখিলে আবার জ্বলিয়া পুড়িয়া বলে কেন—চোখ গেল?

কেন? কেন, তাহা জানি না। কিন্তু আর আছে কি যে দেখিব? আছে কেবল পূর্ব্বের স্মৃতি আর বর্ত্তমানের ব্যভিচার মাত্র। যশঃ বল, মান বল, বিদ্যা বল বুদ্ধি বল, ঐশ্বর্য্য বল সম্পদ্ বল, যাহা কিছু আছে—পূর্ব্বে যাহা ছিল আর এখন যাহা আছে, তুলনায়—ব্যভিচার মাত্র। হাসি থাকিবে না কেন? হাসি আছে, কিন্তু সে কাষ্ঠ হাসি। না হাসিলে নয় তাই সে হাসি। হাসি থাকিবে না কেন? বৃদ্ধ হাসিতেছে—কিন্তু

তখন যেমন বার্দ্ধক্যে বিষয়সুখে তৃপ্তকাম হইয়া ভোগলালসায় সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া গিরিকন্দরে বসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় মন ঢালিয়া দিয়া ধ্যাননিমীলিতনয়নে শান্ত সুস্নিগ্ধ পবিত্র হাসি হাসিত আর আজ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বার্থসংকুল শেষদিন বিস্মৃত বৃদ্ধ দ্বিতীয়দ্বারপ্রতিবেশীর সম্পত্তিটুকু কৌশলক্রমে আত্মসাৎ করিয়া যে প্রাণামোদে হাসিতেছে—উহা কি সেই হাসি? যুবক হাসিতেছে—কিন্তু একদিন স্বাধীনহৃদয়ে সারাদিন বনবিচরণের পর সন্ধ্যার সময় পর্ণশালায় ফিরিয়া মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যটী প্রিয়তমাকে দেখাইতে দেখাইতে যে সুখের হাসি হাসিত, আজ এই টানাপাখার বায়ু সেবন করিয়া বার কয়েক কাগজ উল্টাইয়া মাসান্তে মুষ্টিপূর্ণ অর্থ লইয়া অট্টালিকায় প্রত্যাগত হইয়া কি সেই সুখের হাসি হাসিতেছে? শিশু আজও মাতৃক্রোড়ে হাসিতেছে—কিন্তু তখন মাতৃস্তনে হাত বুলাইতে বুলাইতে জননীর হস্তস্থিত ধনুমুষ্টিতে হাত দিয়া যে সুখের হাসির লহরী তুলিত আজ গোল হাতে গোল সন্দেশ পাইয়া যে হাসি হাসিতেছে উহা কি সেই হাসি? হিন্দুললনা ও হাসিয়া থাকে—কিন্তু একদিন জ্যাবন্ধনীর নিমিত্ত মস্তকশোভা কেশগুচ্ছ উৎপাটন করিতে করিতে যে মধুর হাসি হাসিত আর আজ যে সুন্দর ফিরিঙ্গি খোঁপায় সুন্দর গোলাপটি বসাইয়া দর্পণ-ফলকে রূপের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে—সেই হাসি আর এই হাসি? হাসি থাকিবে না কেন? হাসি আছে, কিন্তু সে কাষ্ঠ হাসি। না হাসিলে নয় তাই সে হাসি। ও হাসিতে কি মন ভুলে? পোড়া স্মৃতির কি মন ভিজে? যখনই ঐদিকে তাকাই অমনি পাপ স্মৃতি আসিয়া চক্ষে শলা বিঁধিতে থাকে, আর অমনি জ্বালায়—যন্ত্রণায় কাত-রাইতে২ প্রাণ বলিয়া উঠে—চোখ গেল!

হায় রে! আর কি আছে কি দেখিব, কি দেখিয়া পোড়া চোখের জ্বালা জুড়াইব? যাহা একবার দেখিয়াছি আর কি তাহা দেখিতে পাইব? যাহা দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইত না, একবার দেখিলে শতবার দেখিতে ইচ্ছা হইত, যাহা আজও ভুলিতে পারিতেছি না, যাহার স্মৃতিতেই চোখের এই দারুণ ব্যথা—আর কি সে দেখা কখনও দেখিব? যে বসন্ত মনোহর

শোভা ছড়াইতে ২ অসময়ে শীতপীড়িত হইয়া পড়িল সে বসন্ত আর কি ফিরিয়া আসিবে? যে কলকণ্ঠ মধুগীত গাহিতে গাহিতে অকস্মাৎ ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িল সে কণ্ঠ কি আর তেমনি করিয়া ঝঙ্কার করিবে? যে ব্রততী পুষ্পভারে অবনত হইয়া রূপের আভার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানময় সদগন্ধ বিকীর্ণ করিতে করিতে সহসা উৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের আঘাত লাগিয়া শুখাইয়া আসিল সে লতা আর কি দিক্ উজলিয়া মধুহাসি হাসিবে? আর, তাহা দেখিয়া এপোড়া চোখের জ্বালা কি আবার নিভিবে? পাখি, বলিয়াছি তো তুই বনের বিহঙ্গ—তোর কি দুঃখ তা জানি না; কিন্তু আমার কথা তো শুনিলি, তবে আয় দুজনে—যতদিন দুজনের এছার প্রাণ এছার দেহে থাকিবে—দুজনে এমনি করিয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, গিরির কন্দরে, বনের ভিতরে, সংসারের মাঝারে গলা ছাড়িয়া ডাকি—চোখগেল। জগত এ ব্যথা বুঝিবে না, নাই বা বুঝিল—আমি ডাকি তুই শোন, আর তুই ডাক আর আমি শুনি, জগত নাই বা বুঝিল—আয় আমরা আপনাদের মনের কথা আপনাদের কাছে বলি, আপনাদের চোখের ব্যথা আপনাদের কাছে আপনারা জানাই। উভয়ে উভয়ায় ডাকি—চোখ গেল!

সুহাসিনী।

—:০:—

দশম পরিচ্ছেদ।

"চিনিয়াছি।"

"Oh! I do know him————"

Chamberlain—A comedy.

ঢাকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর আজ বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপে আবরিত। চন্দ্রাতপের উপরিভাগে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র পতাকা—কেহ লাল, কেহ নীল, কেহ

পীত; সকলে মৃদুবায়ুসঞ্চালনে ধীরে ধীরে পত্ পত্ রবে উড়িতেছে। যেন উপরে থাকিয়া দূরস্থ লোকদিগের নিকট যবনকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। নিম্নদেশে বহুদূর ব্যাপিয়া একখানি রক্তবর্ণ মক্‌মল বিস্তৃত। ইহা সভা প্রবেশের পথ। পথের দুই পার্শ্বে মাতঙ্গশ্রেণী, তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী, সে অশ্বারোহীর পর পদাতিকের সারি—কাহারো মুখে কথা নাই, নিঃশব্দে নিষ্কোষিত অসি হস্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া সূর্য্যকিরণ সেই সকল শাণিত অস্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া উদ্ভাসিত হইতেছে। তার পর সভাদ্বার। দ্বারে অতি সুন্দর শ্রুতিমধুর নহবৎ তালে তালে, বাজিতেছে, নহবতের সেই মধুর লয়ে মধুর কণ্ঠ মিশাইয়া তাহারই পার্শ্বে বন্দীগণ ধীরে ধীরে তৈমুরলঙ্গ-বংশের স্তুতিগীত গাহিতেছে। সম্মুখে চারুকার্য্যখচিত সুবিস্তৃত গালিচার উপর রত্নপ্রবালভূষিত সিংহাসনের সারি। এক একখানি সিংহাসনে এক একজন রাজা উপবিষ্ট, সকলেই আপনাপন পরিচ্ছদে সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। সেই রাজসিংহাসনমণ্ডলীর মধ্যভাগে একখানি সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন। সেই সিংহাসনে সুবর্ণদণ্ড, সুবর্ণদণ্ডে সুবর্ণছত্র, সেই ছত্রের চারি পার্শ্বে স্তবকে স্তবকে মুক্তার ঝালর দোদুল্যমান। সিংহাসনে বসিয়া—বঙ্গের সুবাদার মীর কাসিম আলি খাঁ বাহাদুর।

সুবাদার কাসিম খাঁ আজ মন্ত্রণার জন্য বার দিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গের ছোট বড় প্রায় তাবৎ রাজা উপস্থিত। নিয়মিত কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন বিগ্রহসচিব ভূপেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ২ উঠিয়া বলিলেন—"জাঁহাপনা! যে দুই দল সৈন্য ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কি অগ্রসর হইতে নিষেধ করা যাইবে?"

সুবাদার কহিলেন—"কি বলিতেছেন?" কাসিম খাঁ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সকল কথা শুনিতে পান নাই।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ আবার অবনতমস্তকে বলিলেন—"যদি অনুমতি হয়, এব্রাহেম খাঁ ও গণপৎ রাওকে সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতে বলা যায়।"

কাসিম খাঁর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাহারই বাম পার্শ্ব হইতে জগৎশেঠ বলিলেন—"তাঁহারা কি বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়াছেন?

"সংবাদ পাইয়াছি, কল্য পৌঁছিবেন।"

দূর হইতে আর একজন বলিল—"এতদূর পাঠাইয়া ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন?"

"প্রকাশ্য যুদ্ধে বিলম্বের সম্ভাবনা, বিপক্ষেরা যেরূপ দুর্দ্দান্ত ঘূণাক্ষরে জানিতে পারিলেই হয়ত কোন দিন গোপনে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সৈন্যবল বৃদ্ধি থাকা ভাল।"

"তবে কি কেবল দুইজন সেনাপতির উপর দিল্লীশ্বরের সৈন্যবলের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে?"

ভূপেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—"সেনাপতি অনেক আছেন, কিন্তু সেরূপ সমরকুশল সেনাপতি অতি অল্পই দেখিয়াছি।"

প্রশ্নকর্ত্তা আবার বলিল—"কেবল কি দুইজন মাত্র দক্ষ সেনাপতি লইয়া সুবাদার সাহেব এ সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন?"

অবজ্ঞাসূচকস্বরে ভূপেন্দ্র বলিলেন "তাহা জানি না, এক্ষণে সুবাদার সাহেবের অনুমতি——" কাসিম খাঁ বিরক্ত হইলেন, তাঁহার প্রতি অসন্তোষ দৃষ্টি করিলেন। লজ্জিত হইয়া ভূপেন্দ্রনারায়ণ আসন গ্রহণ করিলেন। সুবাদার আবার চিন্তায় মন দিলেন।

তখন সেই প্রশ্নকর্ত্তা অতি ধীরে ধীরে সুবাদারকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"গোলামের গোস্তাগি মাফ হউক। যদি মন্ত্রী মহাশয়ের কথা সত্য হয় আর যদি বাঙ্গালি বলিয়া অবজ্ঞা না করেন, এ দাস দিল্লীশ্বরের অধীনে একটি সৈনিকের কর্ম্ম পাইলে চরিতার্থ হইবে।"

বিস্মিত হইয়া কাসিম খাঁ তাহার প্রতি চাঁহিলেন, বীরের মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। যুবকের সে বেশ বীরোচিত। অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় তাহাতে বিভূতি নাই, কুণ্ডল নাই, মুক্তামালা নাই, সুবর্ণ পদক নাই—এ সমস্তের পরিবর্ত্তে কেবল অস্ত্রশস্ত্র, কেবল সমর সজ্জা। অঙ্গ মহার্হ বসনভূষণের পরিবর্ত্তে অস্ত্রজালে বিমণ্ডিত সুদীর্ঘ কার্ম্মুকবদ্ধ কৃপাণফলক কটিতটে ঝুলিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া সকলে এই তরুণ বীরকে দেখিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনারায়ণের একজন তোষামোদী এনায়েত উল্লা বলিল "তুমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালিরা অস্ত্র ধরিতে জানে না, শত্রু-

সমক্ষে যুদ্ধ করিবে কি প্রকারে?"

যুবক গর্ব্বিত হইল, বলিল—"খাঁ সাহেব! বাঙ্গালিরা অস্ত্র ধরিতে জানে কি না এ কথা একজন শত্রু আসিয়া বলিলে ভাল করিয়া দেখাইতাম।" কোষবদ্ধ তরবারি কটিদেশে ঝুলিতেছিল, গর্ব্বভরে যুবক একবার তাহা কোষমুক্ত করিল, ঝন ঝনা শব্দে কোষ হইতে বহির্গত হইয়া সৌরকর প্রতিবিম্বে সে অসি ঝলসিয়া উঠিল: দেখিয়া সকলে চমকিল। এনায়েত আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। পার্শ্ব হইতে অনুপকুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণের কানে কানে বলিল—"ঠিক্ এইরূপে কে অস্ত্র ধরিত, মনে আছে?" ভূপেন্দ্র উত্তর করিল না। কি জানি কেন ক্ষণেকের জন্য তাঁহার বদনমণ্ডল কালিমা ধারণ করিল, মুহূর্ত্তের জন্য বহুদিনের একটী কথা মনে পড়িল, হৃদয়ে বিষম চিন্তার প্রবাহ বহিল। ধীরে ধীরে একবার যুবকের প্রতি চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবকের চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরিত হইতে লাগিল, মুখকান্তি গম্ভীর হইল, ললাটরেখা স্ফীত হইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইল, অলক্ষিত ভাবে হস্ত কৃপাণ মুষ্টি স্পর্শ করিল। যুবকের সে ভাব অন্য কেহ দেখিতে পাইল কি না জানি না, ভূপেন্দ্র তাহা দেখিলেন, অন্তরে শীহরিয়া চক্ষুঃ নত করিলেন। যুবকও আপনা হইতে সে ভাব দমন করিল।

কতক্ষণ পরে কাসিম খাঁ বলিলেন—"যুবক, তোমার সংকল্প শুনিয়া প্রীত হইলাম। আল্লা করুন, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক। আমি বাদসাহকে লিখিব, একজন বাঙ্গালী তাঁহার নূতন সেনাপতি হইয়াছেন, তিনি ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। পঞ্চ হাজারি হইতে চাহিলে এখনি সে পদ প্রদত্ত হইবে।"

শির নামাইয়া করযোড়ে যুবক বলিল—জাঁহাপনা! গোলাম কৃতার্থ হইল। পঞ্চহাজারি হইতে চাহিনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক শত পদাতি প্রদান করিলেই একজন বাঙ্গালির প্রতি যথেষ্ট কৃপা হইবে।"

কাসিম খাঁ একটু হাসিলেন—"আশ্চর্য্য কথা! পোর্ত্তুগীজদিগকে নিতান্ত হীনবল অনুভব করিও না।"

"হীনবল ময় বলিয়াই শতপদাতি ভিক্ষা চাহিতেছি, আমার সৈনেরা অশিক্ষিত।"

"তোমার সৈন্য। কত সৈন্য লইয়া আসিয়াছ?

"প্রায় পঞ্চশত হইবে!"

"পঞ্চশত আর একশত—ছয়শত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবে? বালক, একি ছেলেখেলা!"

যুবক আবার বলিল—"ক্ষমা করিবেন, বাদসাহের অধীনে ছয়শত সৈন্যে পোর্ত্তুগীজদিগের ছয় সহস্র সৈনের সহিত যুদ্ধ ছেলেখেলা ভিন্ন আর কি!"

"অবোধ! কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছ?"

"মৃত্যুই আমার কামনা। যদি মাতৃভূমির জন্য এক বিন্দু শোণিত দিয়া মরিতে পাই সদ্গতি হইবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া কাসিম খাঁ আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন,সে মুখে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নয়ন জ্বলিতেছে রৌদ্র বৃষ্টির ন্যায় সেই নয়নে একবিন্দু অশ্রু শোভা পাইতেছে। কাসিম খাঁ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"অনুমতি করিতেছি আজ হইতে শত অশ্বারোহীর ভার তোমার হস্তে অর্পিত হইল।"

"জাহাপনা! অনুমতি শিরোধার্য্য।" আহ্লাদে শিরনত করিয়া যুবক আসন গ্রহণ করিল।

তারপর সুবাদারের ইঙ্গিতে সভা ভঙ্গসূচক দুন্দুভিধ্বনি হইল। রাজ-সভা ভঙ্গ হইল। একে একে সকল রাজা আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বশেষে ভূপেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে একজন দূত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ও যুবক কে?"

হাসিয়া দূত বলিল—"আপনি বাঙ্গালি, আপনাদের বাঙ্গালিকে জানেন না?"

"জানি, কিন্তু ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। যুবক কে?" দূত বলিল "দিনাজপুরের জমিদারপুত্র চারুচন্দ্র। চিনিতে পারিয়াছেন?"

সর্ব্বশরীর শীহরিয়া উঠিল, স্খলিত কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলিলেন—"চিনিয়াছি।'

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ।

"জ্বলয়তি তনূময়স্তর্দ্দাহঃ———"

উত্তরচরিতম্।

কলিকাতা হইতে যশোহরের পথে একটি ছোট মাঠ, সে মাঠে দুই একজন কৃষকের পর্ণশালা ভিন্ন মনুষ্য বসতি নাই; তাহার অদূরে একটি লুপ্ততোয়া তটিনী—লোকে ইহাকে চন্দ্রপুরের (বা চন্দ্রার) মাঠ বলে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন চন্দ্রপুর বা সুক্ষ্মাবতীর এরূপ অবস্থা ছিল না। চন্দ্রপুর তখন বহুজনপূর্ণ বহুদ্রব্য শোভিত কোলাহল পূরিত সমৃদ্ধিশালী নগর সেই নগরের পদপ্রান্ত প্রক্ষালন করিতে করিতে সম্পূর্ণশরীরা কলনাদিনী সুক্ষ্মাবতী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। অতি যতনে রাজা চন্দ্রনাথ আপনার নামানুকরণে এই নগর স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু বড় অধিক দিন তাঁহাকে এ সাধের বস্তু ভোগ করিতে হয় নাই। কুক্ষণে মোগল পাঠানে যুদ্ধ বাঁধিল, কুক্ষণে সেই যুদ্ধে চন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সেই দিন হইতে প্রজারা আর কেহ আপনাদিগের রাজাকে দেখিতে পাইল না। যাহারা সঙ্গে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এমন বীরত্ব কেহ দেখে নাই, শত্রুর সাধ্য কি সে বীরের অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করে; কিন্তু এ গোপনহত্যা কে করিল?" কেহ কেহ একজনকে সন্দেহ করিত, কিন্তু ভয়ে ফুটিতে পারিত না।

যে মুহূর্ত্তে সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজার মৃত্যু সংবাদ দিল প্রজামণ্ডলে হাহাকার পড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথের অল্পবয়স্কা বিধবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। দূরে চন্দ্রনাথের দ্বাদশবর্ষীয় বালক ও নয় বৎসরের বালিকা মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে খেলা করিতেছিল, সে ক্রন্দন শব্দ শুনিল। ব্যাকুল হইয়া দৌড়িয়া আসিল। বাহিরে, প্রত্যাগত দুই একজন সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল, বালক জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা আসিলে, পিতা

কোথায়?" সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"স্বর্গে, বীর পুরুষ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে।" বালক কাঁদিতে গেল, কাঁদিতে পারিল না, দেখিল, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বালিকা ভগ্নী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে; বালিকার হাত ধরিয়া বাটী প্রবেশ করিতে গেল। দ্বার রুদ্ধ। প্রহরী বসিয়াছিল, বালক বলিল "দ্বার খোল, বাটীর ভিতরে যাইব।" প্রহরী কাঁদিল, বলিল—"ক্ষমা করিবেন, যাইতে নিষেধ।" চন্দ্রনাথের বাটীতে চন্দ্রনাথের পুত্রের যাইতে নিষেধ! বালক কিছুই বুঝিতে পারিল না, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন নিভৃতে আসিয়া প্রহরী কাঁদিতে কাঁদিতে কাণে কাণে কি বলিল—শোকে, ক্ষোভে, ক্রোধে বালকের গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন জ্বলিতে লাগিল। নিঃশব্দে ভগ্নীর হাত ধরিয়া বালক ফিরিল। চন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা পথের কাঙালী হইল।

রাজ্ঞীর বয়স অল্প, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সপত্নীপুত্রকন্যার জন্য দুঃখ না হওয়া বিচিত্র নহে। অতি অল্প দিনে সে স্বামীর শোক ও ভুলিল। 'যাহা রটে তাহাঘটে'—কয়েকমাস পরেই রটিয়াছিল, রাণীর চরিত্র বড় ভাল নয়; একবৎসর না যাইতে ঘটিল, রাণীর গর্ভ উপস্থিত। কে বাদসাহকে লিখিল—'রাজা চন্দ্রনাথ মৃত, তাঁহার পুত্রকন্যা নিরুদ্দিষ্ট, বিধবা কুলটা।' কিন্তু কে লিখিল প্রকাশ হইল না। বাদসাহ বলিলেন—'যতদিন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান পাওয়া না যায়, মন্ত্রী রাজকার্য্য করুন।' যথা নিয়মে মন্ত্রী সিংহাসনে বসিলেন। মন্ত্রী—ভূপেন্দ্রনারায়ণ।

যে সিংহাসনে পূজনীয় চন্দ্রনাথ শোভা পাইতেন আজ তাহাতে ভূপেন্দ্র বসিলেন, প্রজারা ইহা দেখিল। ভূপেন্দ্রের ন্যায় স্বার্থপূর্ণ ক্রূরবুদ্ধি খল-স্বভাব আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে কি না তাহা তাহারা জানিত না। ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় সকলের প্রাণ শুখাইল, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। ভূপেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রীও এক কন্যা ছিল, স্ত্রীকে রাণী রূপে অভিষেক করিবার উদ্যোগ হইল। চন্দ্রনাথের বিধবা আসিয়া বলিল—"আমি রাজ্ঞী, তুমি আমার অধীনে রাজা মাত্র, আমি থাকিতে অন্য রাণী অসম্ভব।" ভূপেন্দ্র বলিলেন—"তুমি কুলটা, অনুগ্রহ করিয়া

বাটীতে স্থান দিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।” হতভাগিনী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নূতন রাণী তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ভূপেন্দ্র এক্ষণে নিষ্কণ্টক। আপন উন্নতির জন্য কিছুই করিতে বাকি রাখেন নাই—প্রভুহত্যা, প্রভুপুত্রকে তাড়াইয়া রাজ্যাপহরণ, প্রভুপত্নীর সতীত্বনাশ—একমাত্র উচ্চ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুই বাকি রাখেন নাই। আজ ভূপেন্দ্র নিষ্কণ্টক। কিন্তু পাপীর সুখ কোথায়? এখনও একটী প্রধান কণ্টক বর্ত্তমান, এই অতুল ধন মানাদির মধ্যে ও এক নিরুদ্দিষ্ট বালকের চিন্তা সর্ব্বদাই আকুল করিয়া তুলিত, তাহার সন্ধানের জন্য নানা স্থানে চর প্রেরণ করিলেন, বহুদিনের পর সন্ধান মিলিল। সুযোগে সেই কণ্টকটী সরাইবার কৌশল করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে পোর্ত্তুগীজদিগের হাঙ্গামা বাড়িয়া উঠিল, ভূপেন্দ্র এক দিন শুনিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পোর্ত্তুগীজদস্যুরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্বেষণের বাকি রহিল না, কিন্তু সন্ধান মিলিল না। ইতি পূর্ব্বেই স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। একমাত্র কন্যা ছিল, সেও অপহৃত, তাহার সন্ধান নাই—পাপীর সুখ কোথায়?

কয়েক বৎসর পরে সুবাদার কাসিম খাঁ পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন, অবসর বুঝিয়া ভূপেন্দ্র আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। ভূপেন্দ্রের অন্যান্য সহস্র দোষ থাকিলে ও অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্বত্র জয়ী। দুই একটি কার্য্যে তাহার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া অতি আহ্লাদে সুবাদার তাঁহাকে বিগ্রহসচিবের পদে নিযুক্ত করিলেন। ভূপেন্দ্র পাপী হইলেও জন্মভূমির গৌরব রক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাঁহারই মন্ত্রণায় সুবাদার এই রাজসভা আহ্বান করেন। সেই দিনের সে রাজসভায় এরূপ ঘটনা হইবে, তাহা জানিলে ভূপেন্দ্র তাহা করিতে পরামর্শ দিতেন কি না সন্দেহ। সভায় যাহা দেখিলেন, সে সভার পর দূতের মুখে যাহা শুনিলেন গৃহে আসিয়া সহস্র চেষ্টা করিলেও ভূপেন্দ্র তাহা ভুলিতে পারিলেন না। সে দিবস স্নানাহার ঘুচিয়া গেল। সদাই সেই কথা। সদাই নানা রূপ চিন্তা, কোন কারণ নাই অথচ দারুণ চিন্তা;

চিন্তা করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন, তবুও পাপ চিন্তা ছাড়ে না। যাহা করিতে যান তাহাতেই চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। রজনীতে শয্যায় শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না। এত চেষ্টা, এত যত্ন সব বিফল হইল—নিদ্রা চক্ষে আসিল না। চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা! গভীর চিন্তা-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অতীত ঘটনা সকল স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপের ভীষণ মূর্ত্তি সকল এক একটি করিয়া চিত্ত ভূমিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ভূপেন্দ্রের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। এককালে যেন শতশত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্র অস্থির হইলেন। জোর করিয়া চক্ষু বুজাইয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু নিদ্রা আসিল। একদণ্ড অতীত না হইতেই ভূপেন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন, চমকিয়া উঠিলেন—দেখিলেন, সেই সভা, সেই রাজন্যবর্গ, সেই কাসিম খাঁ। আর কি?—সেই যুবক, সেই ভয়ঙ্কর যুবক, সেই সাক্ষাৎ রুদ্র অবতার ভয়ঙ্কর যুবক। তৎসঙ্গে সঙ্গে সেই ভ্রূকুটী, সেই নয়নাগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সেই বিজাতীয় মুখভঙ্গী। স্বপ্নাবস্থায় একবার আপনার চারিদিকে চাহিলেন, চন্দ্রনাথের বিধবা যেন আলুলায়িত-কেশে ত্রিশূলহস্তে তাহাকে বধ করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন, চন্দ্রনাথের ছিন্নশিরা যেন বিকটভাবে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল—'পাপী সাবধান, তোর কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।'—ভয়ানক! ভয়ানক! আর না। ভূপেন্দ্র অস্থির হইয়া ভয়ে চক্ষু চাহিলেন। আর নিদ্রা হইল না। গায়ের জ্বালায় বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

মোহিনী।

———000———

১

মোহিনী—মোহিনী মম জীবন তোষিনী,
কিবা মোহজালে মোরে ঘেরেছ মোহিনী!
আপনা বিস্মৃত হ'য়ে তব রূপ চিত্র ল'য়ে
ওই ধ্যান ওই জ্ঞান দিবস রজনী।

২

একাকী রয়েছি যেন মায়ার কানন,
গাঢ় ইন্দ্রজালে যেন ভুবন মগন!
জগত মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
মোহিনী মোহিনী মোহি'—নাহি অন্যমন।

৩

আকাশে মোহিনী হেরি—হেরি নদীতটে,
সর্ব্বত্র মোহিনী যেন আঁকা চিত্র পটে;
যে দিকে নয়ন যায় মোহিনী দেখিতে পায়,
যা দেখি মোহিনী—হায়, মোহিনীই বটে।

৪

বিধি যেন মোর তরে কত কাল তপ ক'রে
ভাঙিয়া জগত আহা, মোহিনীতে গ'ড়েছে,
তাইত মোহিনীময় এ জগত হ'য়েছে।

৫

কোথা যাও—কোথা যাও, শুন লো মোহিনী
চাঁদের আড়ালে কেন লুকাও সজনি?
মোহিনী হৃদয়ে রেখে সর্ব্বাঙ্গে মোহিনী মেখে

তাই কি চাঁদের আলো ছড়ায় মোহিনী?

৬

বিদ্যুতবরণী বামা বিদ্যুত অধরে
নয়নে বিদ্যুত খেলে বিদ্যুত অম্বরে,
ছড়াইয়ে রূপরাশি দশদিক্ পরকাশি
হাসি হাসি ভাসি যায় নয়ন উপরে।

৭

স্থির সৌদামিনী ধনী বরণে তাহার
গমনে—অধরে নেত্রে চঞ্চলা বাহার।
এই আসে এই যায় এই আসে পুনরায়
চঞ্চলা চপলা যেন করিছে বিহার।

৮

চপলা প্রকাশি ডুবে, আর না প্রকাশে,
করাল নীলিম মেঘ তাহারে গরাসে;
মোর মোহি'-সৌদামিনী দ্রুত শতহৃদা জিনি
পুনঃ আসে পুনঃ যায় হৃদয় আকাশে।

৯

অভাগ্য যখন ছিল কতকিই ভেবেছি
সংসারের সুখ আশে কতবার ভেসেছি,
নিজে সুখী হ'ব বলে মনে আছে কতস্থলে
অস্থিমর্ম্ম ভেদি কত যাতনাই পেয়েছি।

১০

মোহিনীরে, তোর তরে সকলি সে ছেড়েছি,
অপর ভাবনা যত উপাড়িয়া ফেলেছি।
বিধাতা কি শুভক্ষণে মিলাইল তোর সনে
তুমিময়—মোহিময় তদবধি হ'য়েছি।

১১

ছেড়েছি—ছেড়েছি যত পুরাতন ভাবনা,
তুমি বিনে বর্ত্তমানে আর কিছু ভাবিনা,
তুমি আমি এক হ'য়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
থাকিব অনন্তকাল এই শুধু কামনা,
তুমি বিনে বর্ত্তমানে আর কিছু চাহিনা।

১২

মোহিনী—মোহিনী মোর হৃদয়ের তোষিণী
প্রেম মোহ মায়া সুখে বিকলিছ পরাণি।
শুনিছে সুখের গান প্রেমেমত্ত মন প্রাণ
"সুখময় প্রেমময় মোহময় মোহিনী!"

১৩

যেন এক সুরাধারা সুধাভাণ্ড হইতে
অজস্র মৃদুল ধারে লাগিয়াছে বহিতে,
পড়িয়া হৃদয় পরে সর্ব্বাঙ্গ অবশ ক'রে
প্রতি লোমকূপ যেন ভরিতেছে অমৃতে।

১৪

বিকল নয়ন মরি কিছু নাহি দেখিছে,
অবশ শ্রবণ হায় কিছু নাহি শুনিছে,
স্পর্শন রসন নাশা ত্যজিয়াছে সব আশা,
হৃদয় সুধুই মাত্র বিকশিত হইছে।

১৫

হৃদয় কমল পূর্ণ বিকসিত হ'য়েছে,
লক্ষ লক্ষ দল যেন রূপ ফেটে পড়েছে।
কোমলতা চমৎকার মরি মরি কি বাহার,
সুখের সাগরে যেন ঢলি ঢলি পড়িছে।

১৬

হৃদয়ের কায যত হৃদয় তা তেজেছে
বুদ্ধি দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ নির্ব্বাসিত হ'য়েছে ;
যতন গিয়াছে তার সুধু সুখ নির্ব্বিকার
প্রবৃত্তি তাহার মাত্র মোহিনীতে রয়েছে।

১৭

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাখা হৃদপদ্ম ঢাকিছে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সুখে মোহিনীতে ভবিছে।
হৃদয় মোহিনীময় মোহিনীই সমুদয়
সুধাধারা মোহিনীরে বারে বারে ঢালিছে।

১৮

প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজিয়ে
গাঢ় যোগ-নিদ্রামত, স্পন্দহীন হইয়ে
থাক থাক হৃদ্ আমার—সুধাধারা শত ধার
অনন্ত অমৃত হ্রদে বায়ু করে ডুবায়ে
প্রেমে সুখে মোহে আর মোহিনীতে মজায়ে।

ভ্রমর ও কেতকী।

—oOo—

একদা কেতকী এক হ'য়ে বিকসিত
সৌরভে করিছে সেই বন আমোদিত,
গন্ধবহ সমীরণ সে গন্ধ করি বহন
চারিদিকে ছড়াইল হ'য়ে হরষিত ;
সমীর সহায়ে ঘ্রাণ সুদূরে বিস্তৃত।

* ন্যায়মতে আত্মার ছয়গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, যত্ন বা প্রবৃত্তি।

পথিক মানবগণে তুষিয়া সৌরভে
পরিমলবাহী বায়ু চলিল গৌরবে,
যথায় সরসী জলে প্রফুল্ল কমলদলে
করিতেছে মধু পান মধুকর সবে
বার্ত্তা দিয়ে তা'সবারে মাতাইল লোভে।

স্বর্গপারিজাত সম কেতকীর ঘ্রাণ
পাইয়ে মধুপকুল আকুলিত প্রাণ,
লোভেতে উন্মত্ত প্রায় প্রাণপণে ধেয়ে যায়
সুরভি কেয়ার মধু করিবারে পান,
না সহে বিলম্ব আর আকুল পরাণ!

নিমেষেতে উতরিল কেতকীর বনে,
দেখিল আবৃত ফুল কণ্টকাবরণে
দারুণ লোভের বশে মধু পাইবার আশে
প্রাণের আশঙ্কা নাহি উপজিল মনে;
ঝাঁপিয়া পড়িল সবে সে কাঁটার বনে।

কণ্টকে ছিঁড়িয়া পাখা হ'লো ছিন্ন ভিন্ন,
রেণুতে হইল অন্ধ দুইটি নয়ন,
ক্লেশেতে অস্থির হ'য়ে ছয় পদ আছাড়িয়ে
ভূমে পড়ে ছট্ ফট্ করি কতক্ষণ
এই উপদেশ দিয়ে ত্যজিল জীবন।

লোভের কুহকে পড়ি হারানু জীবন,
মোদের এ দশা দেখি শিখ নরগণ,
পড়িয়া লোভের মোহে অনলে পতঙ্গ দহে,
আজি আমাদের তেঁই কণ্টকে মরণ;
লোভেতে মাতিলে যাবে এরূপে জীবন।

শ্রীমতী বসুমতী দেবী।

CALCUTTA

আর্য্য চিকিৎসা।

—000—

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ।

অল্পবুদ্ধি মানবগণের শিক্ষা সৌকার্য্যার্থে আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা শল্যশাস্ত্র, শালাক্যশাস্ত্র, কায় চিকিৎসা, ভূত বিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র, ও বাজীকরণ তন্ত্র।

১। শল্য শাস্ত্রে দেহে অস্ত্র, শস্ত্র, অগ্নি ও ক্ষার প্রয়োগ করিবার প্রণালী ও ব্রণ নির্ণয় করিবার নিয়ম সকল লিখিত আছে।

২। শালাক্য শাস্ত্রে চক্ষু, কর্ণ, মুখ, ও নাসিকাদি সংক্রান্ত, দেহের উর্দ্ধভাগ গত সমস্ত রোগের শান্তিকারক উপায় লিখিত আছে।

৩। কায় চিকিৎসায় সর্ব্বশরীর সংশ্রিত পীড়া সমূহের, অর্থাৎ জ্বর, আমাশয়, বহুমূত্র, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, মেহ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের নিবারণোপায় বর্ণিত আছে।

৪। ভূতবিদ্যায় গ্রহ শান্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। কৌমার ভৃত্যে শিশুদিগকে নিরুপদ্রবে রক্ষা করিবার বিধি, ও ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ শোধন করিবার নিয়ম প্রভৃতি লিখিত আছে।

৬। অগদ তন্ত্রে বিষ পরিজ্ঞান ও বিষজাত পীড়া সমূহের প্রশমনোপায় বর্ণিত আছে।

৭। রসায়ন তন্ত্রে যে রূপে রোগ সকল দূরীকৃত হইয়া আয়ু দীর্ঘ, মেধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ আছে।

৮। বাজীকরণ তন্ত্রে কি রূপে ক্ষীণ, দূষিত ও বিশুষ্ক শুক্র উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় বর্ণিত আছে।

আয়ুর্ব্বেদের এই আটভাগ সুচারু রূপে অধ্যয়ন করিলে সকলে

বুঝিতে পারেন, ভারতের পূজ্যপাদ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ নির্ম্মল জ্ঞানবলে রোগ নির্ণয়, ভেষজ ব্যবস্থা, রসায়ন, অস্ত্র চিকিৎসা, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারপ্রয়োগ, বস্তিকর্ম্ম, শারীরতত্ত্ব, প্রভৃতি চিকিৎসকের অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় কি প্রকার সুশৃঙ্খলরূপে এক২ বৃহৎগ্রন্থে বিবৃত করিয়া কি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন!! তাঁহাদের সংগৃহীত উল্লিখিত আট অংশের ছায়া অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের কত সভ্য জাতি স্ব স্ব দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদা সুস্থ থাকিবার উপায়।

যে প্রকার আচরণ করিলে শরীর সর্ব্বদা সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে, এই অধ্যায়ে প্রথমেই অতি সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১। বেগধারণ।—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত। এতদ্বারা অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), আধ্মান (ফাঁপ), ও উদর স্তব্ধীভূত হইতে পারে না। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করা কদাচ উচিত নহে। এবং বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান করিয়া উহাদিগকে নির্গত করিতে চেষ্টা করাও অকর্ত্তব্য। কাম, শোক, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি মনোবেগ ধারণ করা অবশ্য বিধেয়।

২। দন্তমার্জ্জন—মলত্যাগান্তে জিহ্বা নির্লেখন অর্থাৎ জিবছোলা দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার ও কোমল দন্তকাষ্ঠ দ্বারা সতর্কতা সহকারে দন্তধাবন করিয়া দন্তশোধক চূর্ণ দ্বারা এক একটী দন্তমার্জ্জন করা বিধেয়। খড়ি, লবঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বয়েড়া, আমলা, সৈন্ধবলবণ, দগ্ধ

সুপারি, তেজপত্র, বকুলত্বক্, ফটকিরি, দগ্ধ মৃত্তিকা, ইত্যাদি দ্রব্যের চূর্ণ, এবং সর্ষপ তৈল ও মধু দন্তদোষনিবারক।

রোগীর পক্ষে, এবং ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে অনেক সময় বিশেষ অপকার হইয়া থাকে।

৩। ব্যায়াম।—দন্তধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তে ব্যায়াম করা উচিত। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে অগ্নিদীপ্তি, বলবৃদ্ধি, জ্বরার অল্পতা, শরীরের মাংস দৃঢ় ও স্থৌল্য নিবারণ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে নানা প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। ব্যায়াম করিতে করিতে যখন নাসিকা ললাট, কক্ষ ও বক্ষাদি স্থলে ঘর্ম্মোদ্গম বা শীঘ্র ২ শ্বাস নির্গত ও মুখশোষ উপস্থিত হইবে, তখনই উহা হইতে বিরত হওয়া উচিত। ভ্রমণার্ত্ত হইলে, ও যে সকল ব্যক্তি দুর্ব্বল, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ও ক্ষত রোগক্রান্ত তাহাদের পক্ষে ব্যায়াম করা অবিধি। ভোজনান্তে ব্যায়াম করা বিধি নহে।

৪। আহার।—উৎপত্তি, স্থিতি, ও বিনাশের মূল আহার। আহারের বৈষম্য হইলেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। প্রত্যহ নিয়মিতাচারী হইয়া দিবা ও রাত্রিতে আহার করা উচিত। দৈবসিক আহার বেলা ৯টার মধ্যে ও ১২টার পরে করা উচিত নহে। এতদ্দ্বারা রসোৎপত্তি ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ৯টার পূর্ব্বে বা ১২টার পরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তখন আহার করিতে কোন দোষ নাই। স্থূল কথা এই, রস, দোষ ও মলের পরিপাক হইয়া যখনই কেন ক্ষুধা উপস্থিত হউক না, তখনই সুখোপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া ভোজ্য আহার করিবে। ক্ষুধার সময় আহার না করিলে, জঠরাগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হয়, এবং তজ্জন্য অঙ্গমর্দ্দ, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, অরুচি, তন্দ্রা, ধাতুদাহ, ও বলহানি হইয়া থাকে। আবার অক্ষুধা সত্বে আহার করিলে দৌর্ব্বল্য, শিরঃপীড়া, বিসূচিকা, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন হইতে পারে। আহারান্তে দধি ভোজন নিষিদ্ধ; দুগ্ধপান হিতকারক। আহার কালে কটু, অম্ল, লবণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রস ও গুণ বিশিষ্ট

দ্রব্য ভোজন জন্য যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, দুগ্ধপান দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।

আহারীয় দ্রব্য অত্যুষ্ণ, শীতল, শুষ্ক, বিস্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত, এবং অল্প বা অধিক সিদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ঐ রূপ দ্রব্য ভোজন করিলে বল, পুষ্টি, পরিপাকশক্তি, ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়। প্রত্যহ একরূপ রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলেও বিবিধ রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

৫। পান।—ক্ষুধার সময় আহার করা যে রূপ কর্ত্তব্য, পিপাসা উপস্থিত হইলে সেই রূপ পরিমিত রূপে পরিষ্কৃত জলপান করা উচিত। তৃষ্ণার সময় আহার, বা ক্ষুধার সময় জলপান, উভয়ই অহিতকর। প্রত্যহ প্রত্যুষে বাসি জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই রূপ জলপান দ্বারা রক্তপিত্ত, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অর্শ, জ্বর, মূত্রাঘাত, চক্ষু ও কর্ণাদির পীড়া, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত দূষিত বিবিধ পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

৬। নিদ্রা।—সকল প্রাণীর চেতনার স্থান হৃদয়। সেই হৃদয় যখন তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখনই দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। নিদ্রা পরিমিত হইলে আয়ু দীর্ঘ, মন প্রফুল্ল এবং দেহ পুষ্ট, বলবিশিষ্ট ও শ্রীযুক্ত হয়। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি। দিবসে নিদ্রা যাইলে শরীরস্থ দোষ সমূহ (বায়ু, পিত্ত, কফ) প্রকুপিত হইয়া সর্দ্দি, কাস, শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। রাত্রি জাগরণ করিলেও ঐ কারণ বশতঃ এই সকল রোগ উপস্থিত হয়।

রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা উভয়ই অনিষ্টকর। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, বালক ও তৃষ্ণা, শূল, অতিসার, অজীর্ণ, হিক্কা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত; যানারোহণ বা পথভ্রমণ জন্য ক্লান্ত, মদ্যপানে উন্মত্ত, রাত্রিজাগরিত ও উপবাসী ব্যক্তি-দিগের পক্ষে এবং গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা তত অনিষ্টজনক হয় না। বরং অনেক সময় তাহা বিশেষ হিতকরই হইয়া থাকে; বিষার্ত্ত এবং কফ ও মেদবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিজাগরণ অহিতকর নহে।

৭। মৈথুন।—দেহী মাত্রেরই স্বভাবতঃ রতিক্রীড়ার ইচ্ছা হইয়া

থাকে। উহা হইতে এক কালে নিবৃত্ত হইলে মেদ বৃদ্ধি, প্রমেহ প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। আবার উহার অতিশীলন দ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, শূল, জ্বর, দৌর্ব্বল্য, আক্ষেপ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। নিয়মিতাচারী হইলে আয়ুর বৃদ্ধি, দেহের পুষ্টি, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও জরার অল্পতা হয়। অনিয়মে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি হয়, এবং শুক্রক্ষয় ও উপদংশ প্রভৃতি বিবিধ কদর্য্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

চুম্বকরহস্য।

ইংরাজিতে ইহাকে ম্যাগনেট্ (magnet) বলে। ম্যাগনেট্ ইহার নাম কেন হইল, তাহা স্থির করা বড় সহজ নহে। নিকাণ্ডার প্রভৃতি ২।১ জনে বলেন, ইডা পাহাড়ের নিকটে ম্যাগনিশ নামে একটি বালক প্রত্যহ মেষ চরাইতে যাইত; প্রত্যহই যখন সে মেষশাবকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আপনার লৌহনির্ম্মিত ছড়িগাছি পার্শ্বে রাখিয়া পাহাড়ের একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিত, উঠিবার সময় দেখিতে পাইত, তাহার ছড়িগাছি একখানি পাথরে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সে পাথর চুম্বক, এই জন্যই ম্যাগনিশ হইতে চুম্বকের সংজ্ঞা ম্যাগনেট। আবার, কেহ কেহ বলেন, এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ম্যাগনেশিয়া প্রদেশে স্বভাবতঃ প্রচুর পরিমাণে চুম্বক পাওয়া যাইত, সেই কারণে ম্যাগনেশিয়া হইতে উহা ম্যাগনেট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহাই হউক, ম্যাগনেট বা চুম্বকের প্রধান গুণ লৌহ-আকর্ষণী শক্তি। বহুদিন হইতে সকলে ইহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে, পুরাতন আরবে এবং তদাতন গ্রীশে বহুদিন হইতে সকলে চুম্বকের এ

গুণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বহু আয়াসে বহু দিন ধরিয়া চুম্বক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার পর নূতন আবিষ্কার অতি অল্পই হইয়াছে। খৃষ্টশকের পূর্ব্বে প্রায় তিনশত বৎসর হইবে, হিপোক্রেটিস্, প্লেটো এবং আরিষ্টটল প্রভৃতি মনিষীগণ ইহার যে সমস্ত গুণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অতি অল্প পরিমাণেই উন্নতি হইয়াছে মাত্র। তবে, তখনকার পণ্ডিতেরা দ্রব্য-বিশেষের গুণ নিরীক্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অধুনাতন বৈজ্ঞানিকগণ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয় প্রণালীই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং বস্তু বিশেষের পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে সহজেই কার্য্যোপযোগী করিতে শিখিয়াছেন। এই হেতুই দিক্‌দর্শন যন্ত্রের সৃষ্টি। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চুম্বকের দিক্ নির্ণয়িনী শক্তি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌সের অন্তর্গত আমাল্‌ফি নগরে ফ্লাভিও জিয়োয়া এই যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার পর ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নাবিকশ্রেষ্ঠ কলম্বস্; কলম্বসের পর ১৪৯৭ অব্দে সেবাষ্টন ক্যাবট এবং ১৬২৫ অব্দে জন গেলিব্রায়ো প্রভৃতি অনেকে ইহার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত নূতন আবিষ্ক্রিয়া কি না তাহা ও সন্দেহস্থল। কেহ কেহ বলেন, চুম্বক সম্বন্ধে ইহা নূতন আবিষ্ক্রিয়া নহে। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনেরা চুম্বকের এই দিক্‌নির্ণয়িনী শক্তি অবগত ছিল। তাতার দেশ দিয়া যাইতে হইলে তাহারা কি এক প্রকার চুম্বকের রথ ব্যবহার করিত; ঐ রথের উপরে একটি প্রকাণ্ড পুতুল বসান থাকিত, সেই পুতুলের হাত খানি যেমন করিয়া ঘুরাইয়া দাও দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া থাকিত। পলস্ ভেনেটাস্ নামে একজন পরিব্রাজক নাকি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে ঐ রথ দেখিয়া আসিয়া ইটালিতে প্রথম দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

চুম্বক কেবল লৌহ আকর্ষণ করে তাহা নহে; নিকল, কোবল্ট, প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ধাতু ও ইহা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকে। ইহার আকর্ষণী শক্তি এত প্রবল যে, মধ্যে কোন ও ব্যবধান থাকিলেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম জন্মে না। একখণ্ড কাগজের উপর একটি

সূক্ষ্ম সূচ রাখিয়া তাহার নীচে একখণ্ড চুম্বক রাখিয়া দাও কাগজ ব্যবধান সত্ত্বেও চুম্বক বলে সূচটী ইতস্ততঃ নড়িতে থাকিবে। বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি, একটী কাচের হাঁস কিনিয়া জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দিতাম আর বিক্রেতা যে একগাছি ছোট ছড়ি দিয়া যাইত ধীরে ধীরে সেই গাছি তাহার সম্মুখে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতাম, হাঁস অমনি হেলিতে দুলিতে সেই ছড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিত। তখন বালক, কিছুই বুঝিতাম না; কাচ নির্ম্মিত হাঁসের তামাসা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইতাম, আমোদে উচ্চ হাসি হাসিতাম। কিন্তু কেন অমন হইত? মনিহারি কি গুণ জানে, তাহার ছড়ি গাছটি ধরিলেই হাঁস আসিত কিন্তু আর অত ভাল ভাল ছড়ি দেখাইলেও আসিত না কেন? ইহা মনিহারি বা তাহার হাঁস কি ছড়ির গুণ নয়; হাঁসের ঠোঁটের ভিতর যে লৌহখণ্ড থাকিত আর সেই ছড়ির অগ্রভাগে যে চুম্বক টুকু প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকিত ইহা তাহারই গুণ। লৌহ কাচ মধ্যে আবরিত থাকিলেও চুম্বকের আকর্ষণের ব্যতিক্রম হইত না।

চুম্বক আবার দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক—যাহারা স্বতই ঐ সমস্ত গুণবিশিষ্ট, আর কৃত্রিম—যাহারা (লৌহাদি) চুম্বক হইতে ঐ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। চুম্বক বাস্তবিক্ পাথর নয়। চারিভাগ অম্লজান বাষ্প ও তিনভাগ লৌহরাসায়নিক সংযোগে সমুৎপন্ন। বিজ্ঞানবিদ্ করিওয়ান বলেন, ইহাতে গন্ধক (Sulphur), কৃষ্ণমৃত্তিকা (Argil) এবং কার্ত্তজোপল (Quartz) মিশ্রিত আছে। লৌহও অম্লজন সমুৎপন্ন আর একটী পদার্থ আছে, চুম্বক তাহারই সংমিশ্রণে আপনার গুরুত্ব অপেক্ষা বহুগুণ ভার সম্পন্ন লৌহ খণ্ড আকর্ষণ করিতে পারে। ক্যাভেলো তাঁহার (Treatise on Magnetism.) নামক পুস্তকে লেখেন, ৬॥০ গ্রেণ ভারি একটুকরা স্বাভাবিক চুম্বক ৩০০ গ্রেণ ভারি লৌহখণ্ডকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। সার আইজাক নিউটনের হস্তে ৩ গ্রেণ মাত্র ওজনে একখানি চুম্বকপ্রস্তরবিশিষ্ট একটি অঙ্গুরীয় ছিল, তিনি সচ্ছন্দে উহার আকর্ষণে ৭৫০ গ্রেণ ভারি লৌহখণ্ড সকল উত্তোলন করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক চুম্বক সুইডেন, লাপলাণ্ড, সাইবিরিয়া এবং নিউ ইয়র্ক

প্রভৃতি অনেক স্থানের পর্ব্বত সকলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে নীলগিরি পর্ব্বতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্বাভাবিক চুম্বকে লৌহখণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুতীকৃত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক চুম্বক অপেক্ষা কৃত্রিম চুম্বকের শক্তি ও উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। আবার এই কৃত্রিম চুম্বক হইতে চৌম্বক শক্তি ক্ষণকাল সংঘর্ষণের পর সহজেই অন্য একটী লৌহখণ্ডে চালিত করা যাইতে পারে। কখন কখন আবার চুম্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ মাত্র না হইলেও লৌহ উহার ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। অনেক দিন ধরিয়া একখণ্ড লৌহ সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে উহাতে ঐ শক্তি উপজিয়া থাকে। বহুদিনের পুরাতন জীর্ণ গৃহের গবাক্ষস্থ লৌহদণ্ড সকল চুম্বকশক্তিবিশিষ্ট! অতি সাবধানে কিয়ৎক্ষণ তাহার উপর একখানি ছুরিকা ঘর্ষণ করিলেই ঐ শক্তি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। লৌহখণ্ড মধ্যে তাড়িৎ প্রবিষ্ট হইলে ও তাহা অতি আশ্চর্য্য রূপে চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়।

চুম্বকও লৌহ, লৌহও চুম্বক পরস্পর পরস্পরকে সমানরূপে আকর্ষণ করে। একটি তুলাদণ্ডের এক দিকে একখণ্ড লৌহ রাখিয়া বিপরীত দিকে ঠিক্ সেই ওজন অন্যদ্রব্য রাখিয়া দাও, আর ঐ লৌহ বিশিষ্ট পাত্রের নিম্নে একখণ্ড চুম্বক রাখিয়া দাও, দেখিবে সমান ওজন থাকিলে ও চুম্বক লৌহকে ধীরে ধীরে নীচে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে। আবার ঠিক্ বিপরীত করিয়া যদি লৌহের স্থানে চুম্বক রাখিয়া চুম্বকের স্থানে লৌহ রাখিয়া দাও, লৌহও ঠিক্ সেইরূপে শনৈঃ শনৈঃ চুম্বককে আপনার কাছে টানিয়া লইবে। ভিন্ন ভিন্ন রজ্জুতে লৌহও চুম্বক বাঁধিয়া পরস্পর সম্মুখীন ভাবে ঝুলাইয়া রাখ, পরস্পরের প্রতি এত প্রণয়, দেখিবে দুইদিক হইতে দুইজনে আসিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর আলিঙ্গনে নিবদ্ধ হইবে।

চুম্বকের আর একটি বিশেষ গুণ আছে, সেই গুণের আবিষ্কারেই দিক্‌দর্শন প্রভৃতির আবিষ্কার। উহার এক প্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণদিকে ফিরিয়া থাকে। যে প্রান্ত উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকে তাহার নাম উত্তর মেরু (Pole), আর যে

প্রান্ত দক্ষিণমুখে অবস্থিতি করে তাহার নাম দক্ষিণ মেরু। আবার চুম্বকের ন্যায় অন্য কোনও পদার্থ চৌম্বকশক্তিবিশিষ্ট হইলেই তাহাতে ঐ গুণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একখানি চুম্বকপাথরে একটি লৌহশলাকা ঘর্ষণ করিয়া জলের উপর ছাড়িয়া দাও, ইহা উত্তর-দক্ষিণাস্যে স্থির হইয়া থাকিবে। কতকগুলি শলাকা ঐরূপে একেবারে চুম্বকে ঘসিয়া কতকগুলি কাকে (Cork) বিদ্ধ করিয়া জলের উপর ভাসাইয়া রাখ, দেখিবে, সকলগুলিই উত্তর দক্ষিণে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইবে। তাহাদিগের একপ্রান্তই নিরবচ্ছিন্ন একদিকে মুখ করিয়া থাকিবে। চুম্বক আবার আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপ এ উভয়বিধগুণ বিশিষ্ট। পরস্পর বিষম মেরুতে আকর্ষণ হয়, আর সমমেরুতে প্রতিক্ষেপ জন্মে। দুইখানি চুম্বক লইয়া যদি একখানির উত্তর মেরু অপরখানির দক্ষিণ মেরুর নিকটে লইয়া যাও পরস্পরে আকৃষ্ট হইবে, আর যদি উভয়েরই উত্তরমেরু কি দক্ষিণমেরু একত্রীকৃত কর, আকর্ষণ না করিয়া পরস্পরে পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করিবে। একটি শলাকা পূর্ব্বের ন্যায় চুম্বকে ঘসিয়া কার্কে বিদ্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া রাখ, তাহার পর একখণ্ড চুম্বক লইয়া তাহার উত্তরমেরু উহার উত্তরমেরুর নিকটে লইয়া যাও, কর্কসমারূঢ় লৌহশলাকা লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে পলাইয়া যাইবে; কিন্তু চুম্বকের দক্ষিণমেরু তাহার উত্তর-মেরুর নিকট লইয়া যাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উভয়ে উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে সংশ্লিষ্ট হইবে।

ইহা তো গেল উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অর্থাৎ চুম্বকের দুই প্রান্তভাগের কথা; কিন্তু আশ্চর্য্য, ইহার ঠিক্ মধ্যভাগে ঐ শক্তির কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাকে (Neutral line) অর্থাৎ অশক্ত রেখা বলে। একখণ্ড কাচের নীচে চুম্বক রাখিয়া সেই কাঁচের উপর কতক লৌহচূর্ণ ছড়াইয়া দাও, বড় আশ্চর্য্য রূপে সেই চূর্ণগুলি আপনা আপনি সজ্জীভূত হইবে। একটু পরেই দেখিবে, প্রতিমেরুতে অর্থাৎ উভয় প্রান্তে চূর্ণগুলি রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং যতই ঐ প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়াছে ততই ঐ চূর্ণগুলি বিরলবিনিবেশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অবশেষে ঠিক্ মধ্যভাগে একেবারে শূন্যময়, তথায় লৌহচূর্ণের চিহ্নমাত্রও নাই। মেরু-

দ্বয় মধ্যবর্ত্তী অশক্ত রেখার ঠিক্ উপরিভাগে একটি লৌহ শলাকা সংস্থাপিত হইলে উহা কোনও দিকেই নড়িবে না, স্থির হইয়া একস্থানে পড়িয়া রহিবে। যে ক্ষেত্রে এই অশক্ত রেখা অবস্থিতি করে, তাহাকে চুম্বকের বিষুবক্ষেত্র (Equinox) বলে।

সুহাসিনী।

—:০:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কে?

"কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিং বা মদভাগ্যম কারণং তে।"

রঘুবংশম্।

এ সংসার সুখের না দুঃখের? একই সময়ে একই স্থানে পরস্পরে এত প্রভেদ এত পার্থক্য এত বৈষম্য কেন? একদিকে তানপূরিত ললিত খাম্বাজের শ্রুতিমধুর মৃদুল ঝঙ্কার, অন্যদিকে শোকমিশ্রিত শ্রবণবিদারী করুণ হাহাকারধ্বনি; একদিকে ভাবাসাগরমন্থনকারী বিদ্বজ্জনগোষ্ঠীর গভীর শাস্ত্রালাপ, অন্যদিকে উন্মত্ত সুরাপায়ীগণের অশ্রাব্য জঘন্য কলহ; একদিকে নবসন্তোদ্গত নবপল্লবশোভিত দলমলাময়ী মাধবীলতার ন্যায় নবীনা ষোড়শীর ভুবনভুলান সৌকুমার্য্য, অন্যদিকে হিমানী—পীড়িত কীটদষ্ট বল্লরীর কাণ্ডাবশেষতুল্য জরাগ্রস্ত গলৎকুষ্ঠবপুর রোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর দৃশ্য; একদিকে ভোগসুখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াও প্রবল অতৃপ্ত তৃষা, অন্যদিকে মুষ্টিমাত্র উদরান্নের জন্য দারুণ ব্যাকুলতা—প্রকাশ; একদিকে সুখদ শয্যায় শয়নে সুখস্বপ্ন, অন্যদিকে অনিদ্রায় গাত্রদাহে দারুণ ছট্‌ফটানি—এ সংসার সুখের না দুঃখের?

যে রাত্রে ভূপেন্দ্রনারায়ণ নানা চিন্তায় নানা যন্ত্রণায় বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, সেই রাত্রেই চারুচন্দ্র আপন শিবিরে সুখশয্যায়

শয়ন করিয়া একটি সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্ন সুহাসিনীময়। তাহার প্রতি কথা, প্রতি বিষয়, প্রতি ভাবনা সুহাসিনীপূর্ণ। যেন কত বিপদ্ অতিক্রম করিয়া বহুদিনের পর আবার সুহাসিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আর সে বিনোদের ভয় নাই, সুহাসিনী এখন তাহারই। হাসিতে হাসিতে সুহাসিনী যেন আবার তাহার গলায় একছড়া মালা দিল, হাসিতে হাসিতে চারু তাহা কণ্ঠে ধারণ করিল। আবার, কতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন পূর্ব্বের কথা স্মরণ হওয়াতে সুহাসিনী চারুর বক্ষে মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, সে অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল! অনেক দিনের পর হৃদয়ের সামগ্রীকে হৃদয়ে পাইয়া চারু গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। যথার্থই সে হস্ত যাইয়া কাহার অঙ্গ স্পর্শিল। স্বপ্ন পলাইল, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিবামাত্র চারু দেখিল, যথার্থই তাহার বক্ষঃ অশ্রুতে ভাসিতেছে, তাহার হস্তদ্বয় একটি স্ত্রীলোকের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ স্ত্রীলোক কে?—অবগুণ্ঠন ছিল, চারু চিনিতে পারিল না। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে? এত রাত্রে এমত স্থানে আপনি কে?" রমণী উত্তর করিল না, চারুচন্দ্রকে জাগরিত দেখিয়া লজ্জিতা হইল। লজ্জায় উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ইচ্ছা করিয়া ও সে স্পর্শসুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিল না। অবনতমস্তকে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। চারু আবার চাহিল, দেখিল, তাহার বেশ যবনীর ন্যায়; সে পরিচ্ছদ সামান্য ঘরে মিলে না, তাহা অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী যবন সম্রাটদিগের গৃহেই শোভা পাইয়া থাকে। আশ্চর্য্য হইয়া চারু বলিল—"আপনি কে? কি জন্য আসিয়াছেন? অথবা যিনিই হউন বা যে জন্যই আসুন, আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, এই ঘোর অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না, স্ত্রীলোক হইয়া একাকিনী আসিলেন কেমন করিয়া?"

তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রমণী বলিল, "চারুচন্দ্র, অন্ধকারের কথা কি বলিতেছ? যাহার হৃদয় ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ঘোরতর অন্ধকারে পূর্ণ, সে কি এই বাহিরের সামান্য অন্ধকারে ভীত হয়?"

যে একবার সে কণ্ঠ শুনিয়াছে, সে আর বিস্মৃত হইতে পারে না। বিস্মিত হইয়া চারুচন্দ্র বলিল—"একি, শৈলবালা! তুমি এখানে?"

শৈলবালা বলিল—"আমি এখানে অনেক দিন হইতে আছি। তুমি এখানে?"

চা। আমার কর্ম্ম আছে। তুমি এখানে কবে আসিয়াছ?

শৈ। দিনাজপুর হইতে আসিবার মাস দুই পরে।

চা। সেখান হইতে আসিলে কেন?

শৈ। জানি না।

চা। সুহাসিনী তোমার জন্য কত ভাবে।

শৈ। আমিও ভাবি। (স্বর বিদ্রূপসূচক)

চা। সেখানে যা'বে?

শৈ। সেখানে আমার স্থান নাই।

চা। কেন?

শৈ। থাকিলে, আসিতাম না।

চা। অথবা আসিয়াছ বলিয়া নাই। তোমার এবেশ কেন?

একটু হাসিয়া শৈল বলিল—কি বেশ?

চা। এই যবনীর বেশ।

শৈ। বলিলে বিশ্বাস হইবে? রাগ করিবে না তো?

চা। না, রাগ করিব না। কি, বল।

শৈল আবার হাসিয়া বলিল—আমি যবনী হইযাছি। সুবাদার সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমায় প্রধান বেগম করিয়াছেন। যখন—

তাহার কথায় বাধা দিয়া ঈষৎ-উত্তেজিত স্বরে চারু বলিল—আর বলিতে হইবে না, তুমি অধঃপাতে যাও। ঈশ্বর তোমার মৃত্যু লেখেন নাই কেন?

শৈ। এই যে বলিলে, রাগ করিবে না।

চা। তুমি কালামুখী, তোমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই।

শৈ। লজ্জা থাকিলে, এতরাত্রে তোমার নিকট আসিব কেন?

চা। আমার নিকট আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হয়, আপন স্থানে চলিয়া যাও।

শৈ। যাইতে পারিলে অনেকক্ষণ উঠিয়া যাইতাম। কিন্তু—কিন্তু, চারু, তোমার এ কথা উচিত নয়—শৈলবালার চক্ষু জলে ভাসিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া চারু বলিল—"ইহার আগে একা বসিয়া রোদন করিতেছিলে, আবার এখন ও কাঁদিতেছ; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার এত কষ্ট কি?"

শৈ। এততে ও যে কষ্ট বুঝিলে না, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট।

চা। তোমার কপালে আগুণ! কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সত্য করিয়া বল, তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

শৈ। পৃথিবীতে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে প্রেমের জন্য প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী প্রেমপাত্রের অনুগমন করিতে না চায়?

সে সময়ে যদি এককালে শত সহস্র তাড়িত প্রবাহ কেশান্ত হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত চারুর সর্ব্বশরীরে ছুটিয়া বেড়াইত, তাহাতে চারু এতদূর স্তম্ভিত হইত কি না সন্দেহ। অবাক্ হইয়া চারুচন্দ্র শৈলবালার পানে চাহিল। দুই বিন্দু—দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া শৈলবালা আবার বলিল—"চারু, মনে পড়ে—অনেক দিনের কথা—সেই সুক্ষাবতীর ধারে একটি বালক একটি বালিকার সঙ্গে সর্ব্বদা খেলা করিত। দুজনে কত গল্প করিত, গল্প করিতে করিতে কত ঢেউ গণিত, আবার তাহা রাখিয়া কত কথা—সে কথার মর্ম্ম জানিত না, অর্থ বুঝিত না—অথচ আবোল তাবোল কত কথা কহিত। খেলা ছাড়িয়া একপার্শ্বে যাইয়া কতবার দুইজনে কাণে কাণে কি বলাবলি করিত; আবার কতবার দুইজনে দুইজনের প্রতি চাহিয়া আমোদে উচ্চ হাসি হাসিত। চারু, সে সমস্ত মনে পড়িলে এখন ও——"

স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া উঠিল। তাহাকে বাধা দিয়া চারু বলিল—"কি, তুমি সেই ভূপেন্দ্রের কন্যা!" মুহূর্ত্তের জন্য বদনমণ্ডল বিকৃতিভাব ধারণ করিল, মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুঃ জ্বলিল।

শৈলবালা বলিল—"আমিই সেই ভূপেন্দ্রের কন্যা। কিন্তু, তুমি অমন করিতেছ কেন?"

তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া চারু কহিল—"না, ও কিছু নয়; আমার কেমন মাথার অসুখ হইয়াছে। কিন্তু তুমি সর্ব্বনাশী,

দিনাজপুরে থাকিতে তবে এতদিন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে কেন ?"

শৈলবালা বলিল—"বলি—বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই। যে দিন তুমি পোর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর, সেই দিনই আমি তোমাকে চিনিয়াছিলাম। সেই দিন, আরো কতদিন মনে করিয়াছি—বলি; কিন্তু বলিতে পারি নাই। চারু, এ প্রেমব্রতের উদ্যাপন কি কোন কালে হইবে ?"

চারুর মাথা ঘুরিল, কথা সরিল না। নিঃশব্দে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

প্রভাতের পক্ষী ডাকিল, যবনদিগের গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে কুক্কুট উচ্চরব করিয়া উঠিল। শৈলবালা বলিল—"প্রভাত হইয়াছে, আমি চলিলাম; কিন্তু ইহার উত্তর কবে দিবে, চারু ?"

চারু অগাধ চিন্তায় নিমগ্ন, শুনিতে পাইল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে শৈলবালা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মাকড়সাস্তোত্র।

—oOo—

হে মাকড়্সে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায় অভয় দান কর, আমি তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর জীবন চরিতার্থ করিব।

আমি মহতের গুণ গান করিব বলিয়া, পৃথিবীর সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, তুমিই "মহৎ" উপাধিধারী হইয়া পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে বিরাজ করিতেছ। অতএব হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমার মহিমা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই মহিমাকীর্ত্তন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ঘোষিত হউক।

হে শঠশিরোমণি! তুমি নানারূপে নানাস্থলে জাল পাতিয়া শীকার ধরিয়া থাক। তুমিই সেই ১২০৩ সালে মহম্মদ ঘোরীর বেশে একবার দেখা দিয়া, আবার, ১৭৫৭ খৃঃ ক্লাইবরূপ ধারণ করিয়া শঠতাজালে প্রথমে বঙ্গদেশ, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ আবদ্ধ করিয়াছ। ক্ষুদ্র ভারতবাসী সে জাল ছিঁড়িবে কেমন করিয়া? একদিন মীরজাফরের জন্য যে চাতুরী-জাল বিস্তারিত করিয়াছিলে, সে দিনও সেই জালে জড়াইয়া হতভাগ্য ওইকুমারের সর্ব্বনাশ সাধিলে। আর তাহার স্বজাতীয়গণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া২ তাহা দেখিল। এমনি আবদ্ধ, কেহ হস্তপদ নাড়িতে পারিল না। হে পাশিন্! এ পাশ কোনও কালে কি ছিন্ন হইবে?

হে জগৎগুরো! পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই তোমার শিষ্য দেখিতে পাই। ভারতে, রোমে, গ্রীসে, কারথেজে তোমার অনেক শিষ্য, তাহা না হইলে তাহাদের এমন হীনাবস্থা কেন? ইংলণ্ডে তোমার অনেক সৌভাগ্যবান্ উচ্চদরের শিষ্য আছে, এবং তথায় তোমার শিক্ষার বিশেষরূপ ফল দর্শিয়াছে; তাহা না হইলে আফ্‌গান্ যুদ্ধের ভার ভারতের স্কন্ধে কেন?

হে দীনপালক! তুমিই আমাদের দেশের উকিল, মোক্তার, ও ডাক্তারের এক মাত্র ভরসা। তোমারি শিক্ষায় তাহারা নানা বাক্‌জাল পাতিয়া অনেক "গোবেচারি" পতঙ্গ ধরিয়া খাইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; এবং অনেক গোমূর্খ কেবল তোমারি কৃপায় "বড়লোক" হইতেছে। অতএব হে গোমূর্খবড়লোককারিন্! আমি ও একজন সেই দলের, কেবল এতদিন ভ্রম বশতঃ তোমার শরণাপন্ন হই নাই; এক্ষণে আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি, তুমি আমায় "বড়লোক" কর।

হে রসিকরাজ! রমণী মহলে ও তোমার খুব পশার। তোমারি শিক্ষায় তাহারা রূপের জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে, কেহ জালে আসিয়া পড়িলে তোমারি ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করে, এবং কানে কানে কি মহামন্ত্র ছাড়িয়া দেয়। আর হতভাগ্য পুরুষ ক্ষুদ্র মশকের ন্যায় মৃতপ্রায় হইয়া চিরকাল জালের ভিতর ঘুরিয়া মরে। অথবা তাহার এমনি ফাঁস, মনুষ্যমশক ঘুরিয়া২ উড়িতে না পারিয়া সেইখানেই জীবন উৎসর্গ করে। একজালে পড়িয়া রাবণের বিপুল বংশ দুই দিনে কোথায় উড়িয়া গেল,

একজালে বদ্ধ হইয়া ট্রয় ছারখার হইল; আর একজালে জুড়াইয়া আণ্টনি জীবনরত্ন হারাইলেন! অতএব হে রমণীগুরো! তোমার শিষ্যগণকে আজ্ঞা করিও; আমাকে যেন ভবিষ্যতে সে জালে কখন আবদ্ধ না করে, আর বর্ত্তমানে আমার একটু রস দাও, আমি তোমার মহিমাকীর্ত্তন করিয়া পাঠকগণকে হাসাই।

হে তাপসবর! তুমি অনাহারে দিবারাত্র স্পন্দহীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাক। কোন ক্ষুদ্র প্রাণী দেখিলেই তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পারণা কর। তোমার জীবনের সহিত আমাদের ধার্ম্মিকদিগের জীবনের অনেক অসংখ্য মিল আছে, কেবল প্রভেদ এই, কেহ তোমার নিকটে আসিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিলে তুমি তাহার জীবন সংহার কর, কিন্তু আমাদের সাধুরা নিষ্কটে আসিবার বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে দেশে দেশে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। অতএব হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! আমাকে কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।

হে অসংখ্য অবতার! আমি অঙ্কশাস্ত্রের ভয়ে কলেজ ছাড়িয়াছি, তোমার অবতারের সংখ্যা কি করিয়া গণনা করিব? এক অবতারে তুমি আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন অংশ লিখিয়া গিয়াছিলে, তাহা না হইলে ঐ সকল অংশ এত ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ কেন? তুমি তোমার বর্ত্তমান অবতারে বাঙ্গালার বড়লোকরূপে আবির্ভাব হইয়াছ, তাই তুমি সর্ব্বদাই উচ্চস্থানে থাক, মাটিতে কখন তোমার পা পড়ে না। হে দেব! আমি মূঢ় নর, তোমার সকল অবতার বর্ণনা করিতে অকৃতকার্য্য হইলে যেন তোমার বিরাগভাজন না হই।

হে অদ্ভুত ক্ষমতাবান্! তোমার ক্ষমতা অসীম। তাহা না হইলে যে ফুল হইতে মক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, তুমি সেই ফুল হইতে বিষ সঞ্চয় কর কিরূপে? তুমিই আমাদের বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত কাব্যরূপ মধুভাণ্ডার পড়িয়া মধু পরিবর্ত্তে বিষসঞ্চয় করিতে শিক্ষা দিয়া থাক।

হে অষ্টভুজ! চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তোমার রূপে না গুণে বশীভূত হইয়া তোমায় অষ্টভুজ করিয়াছেন, আমায় কৃপা করিয়া বলিয়া দাও। আমি তাহাতে মোহিত হইয়া তোমার পূজা করি।

বঙ্গে কুলীনাধিকার।

—:o:—

উর্ণনাভ জাল পাতিয়া বসিয়াছিল। ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের সর্ব্বনাশের জন্য সূত্রের পর সূত্র ছাড়িয়া, তন্তুর পর তন্তু বিনাইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া দৃঢ়রূপে আপনার সে জাল বিস্তারিত করিল। সহজেই অনেক পতঙ্গ আসিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইল। কিন্তু উর্ণনাভ নিজেও সে জাল হইতে নিস্তার পাইল না, কালে আপনিও আপনার সেই জালে জড়াইয়া পড়িল। উর্ণনাভ উর্ণাতন্তু মধ্যে নিবদ্ধ হইল। বহুদিন ধরিয়া স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণ ভারতে এক জাল পাতিয়াছিল। বর্ণেতরদিগের সর্ব্বনাশের জন্য ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার ভাষ্য, তার টীকা, আবার তার ভাষ্য—যা কিছু সম্ভব, যা কিছু ক্ষমতায় আসিল একে একে সকলে জালের ফাঁস আরো কসিয়া আঁটিয়া দিল। কে কি করিবে? বেদ বেদান্ত সকলি ব্রাহ্মণের হাতে, বিধি বিধান শাস্ত্র শাসন ব্রাহ্মণদিগের নিজ সম্পত্তি, ইহকাল পরকালের কর্ত্তা ব্রাহ্মণ। বিদ্যা প্রভুত্ব রক্ষিণী—ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাহাতে অন্য কাহারো অধিকার নাই। ব্যবস্থা হইল, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগের চরণরেণু মাথায় লইবে, অথচ সে শূদ্র অস্পৃশ্য! ক্রমশই এ জালে ভারত ছাইয়া পড়িল, কার সাধ্য ইহা ছিন্ন করিবে? চার্ব্বাক একবার চেষ্টা করিল, পারিল না। ক্ষত্রিয়গণ একবার একটু চেষ্টা করিতে গিয়াছিল বলিয়া সেই পাপে উপর্য্যুপরি একবিংশতিবার সে জালে অধিকতর নিষ্পেষিত হইল *। তার পর আসিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধ ইহা ছিঁড়িয়া ও

---

* ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ সামন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান্ হ্রদান্।

ছিঁড়িতে পারিলেন না। প্রায় এক সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত রহিল। সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার অনেক কমিয়া আসিল। কিন্তু যাহা হইল তাহা মাত্র সহস্র বৎসরের জন্য। কালে আবার ব্রাহ্মণদিগের জয় হইল। জাল ছিঁড়িয়া ও ছিঁড়িল না। কিন্তু এততে ও যে জাল ছিঁড়িল না, যাহার বলে কতশত প্রাণীর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, কালে ব্রাহ্মণগণ আপনা হইতে নিজে আসিয়া সেই জালে জড়াইয়া পড়িল। বঞ্চক বঞ্চিত হইল।

পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, কালে আবার ব্রাহ্মণগণ স্বশ্রেণীহিতৈষিতা বলে প্রবলপ্রতাপ বিশ্বপ্লাবী সে বৌদ্ধধর্ম্মেরও উচ্ছেদ সাধিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সে পূর্ব্বাবস্থা আর পাইল না। যাহা গেল তাহা আর আসিল না। ব্রাহ্মণগণ আসিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সে ধার্ম্মিকতা, সে শাস্ত্রপরায়ণতা, সে বিদ্যানুশীলনশীলতা আর দেখা দিল না। তখন ধর্ম্মের স্থানে আসিল উপধর্ম্ম, শাস্ত্রের স্থানে অশাস্ত্র, বিদ্যার স্থানে মূর্খতা! তখন প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া সকলে উপধর্ম্মসেবী হইয়া উঠিল। যে সমস্ত উপধর্ম্ম মাত্র বর্ণেতরদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছিল, ভিতরের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণ পিতৃগণ-প্রবর্ত্তিত সেই উপধর্ম্ম সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তি হীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়*—সেই বৃহস্পতির বংশধরগণ এক্ষণে সে কথা ভুলিয়া ঘোর মূর্খ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রব্যবসায়ী, কিন্তু শাস্ত্র কিরূপ পদার্থ অনেকে তাহা চক্ষে দেখে নাই। কেহ বা যে দেবভাষায় সে শাস্ত্রাদি প্রণীত সে দেবভাষার বর্ণমালা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করে নাই। অনেকের বা শব্দজ্ঞান ভিন্ন অন্যজ্ঞান নাই। যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি লাভের জন্য অনেকে মুখস্থ করিয়া রাখিত, কিন্তু অর্থ জানিত না। ফলতঃ বৌদ্ধদিগের উপর অশেষ কষ্টে পুনর্ব্বিজয় লাভ করিলেও তখন তাহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়।

---

* কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই অবস্থা আবার ভারতের যে প্রদেশে বৌদ্ধদিগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব ছিল, সে প্রদেশে অধিকতর শোচনীয়। বঙ্গে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন, তখন তথাকার ব্রাহ্মণদিগের সে প্রচণ্ড ক্ষমতার অস্তগমন সময়। কালক্রমে হিন্দুদিগের জয় হইল। বৌদ্ধ পাল বংশের পরিবর্ত্তে হিন্দু সেনবংশ বঙ্গের সিংহাসনে বসিল। ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা একটু ভাল হইল বটে; কিন্তু তখন তাহারা ঘোর মূর্খ। নদীয়ার চতুষ্পাঠী তো সে দিনকার কথা! বঙ্গে তখন এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যাহা দ্বারা রীতিমত শাস্ত্রোক্ত কোন কার্য্য হইতে পারিত। শাস্ত্রাদি কি, আদিশূরের সময়ে সংস্কৃত বর্ণ পাঠ করিতে পারে এমন ব্রাহ্মণ বঙ্গে ছিল না। বহুকালব্যাপী একটি অমঙ্গল শান্তির জন্য আদিশূর একটি যজ্ঞ করিবার মনস্থ করেন। সে যজ্ঞে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ ব্রতী হইতে পারে না। কিন্তু সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সমস্ত বঙ্গদেশে একজনও দুর্লভ। আপন রাজ্য মধ্যে সেনভূপতি অনেক খুঁজিলেন, একজনও মিলিল না। তখন, সে যজ্ঞ সমাধা ও নিজরাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে শিক্ষিত করিবাব মানসে কয়েক জন সুশিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের জন্য কনোজরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। * কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইলেন। † সে পাঁচজনই অতি পবিত্র কুলোদ্ভব, সকলেই এক এক ঋষি হইতে সমুৎপন্ন। তাহাদিগেব গোত্র—সাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভারদ্বাজ, সাবর্ণ এবং বাৎস্য। গৌড়ে পৌঁছিবামাত্র তাঁহাদিগের পরিবার, ভৃত্য ও অনুচরগণের প্রতি অতিশয় সম্মান করা হইল। রাজ ইচ্ছায় অনতি বিলম্বে সে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ এবং ছান্দড় ঋক, যজু ও সাম বেদ গান করিতে লাগিলেন, দক্ষ এবং নারায়ণ যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আমন্ত্রিত নৃপতি সমাজ তাঁহাদিগের এতাদৃশ বেদ-পরায়ণতা ওবিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। রাজা যৎপরোনাস্তি প্রীত

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতী শতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানায়ামাস।

† ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥

হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করাইবার জন্য পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিলেন। * ক্রমে সে পাঁচ ব্রাহ্মণের খ্যাতি দেশময় এত বাড়িল যে, তাঁহারা পুরোহিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইলেন, তাঁহাদিগের ভৃত্যগণ ও শূদ্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিল। নিত্য নূতন মর্য্যাদা পাইয়া ব্রাহ্মণগণ অহঙ্কারে আপন কর্ত্তব্য ভুলিল। যাহারা তাহাদিগের এত মান্য দিল, তাহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের বংশে বঙ্গদেশ ছাইয়া গেল, কিন্তু তথাকার ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে মিশিল না, আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে বাস করিতে লাগিল। বিষ বৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। (ক্রমশঃ)

যোগিনী চক্র।

(৮৮ পৃষ্ঠার পর)

পিলু——কাশ্মিরীখেমটা।

এস হে নটবর ত্যজিয়া ধরাসন।
উদিত সুখের শশী, বিলম্বে কি প্রয়োজন।
হেরে ও চাঁদবদন, জুড়াবে নয়ন মন,
ঘুচিবে মনোবেদনা, আনন্দে হবো মগন।

(শূন্য হইতে অপ্সরা চতুষ্টয়ের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

কুহু। শান্তি সদা বিরাজুক তোমা, রাজ্যেশ্বর,

---

* পঞ্চকোটিঃ কাম কোটি র্হরিকোটি স্তথৈব চ।
কঙ্ক গ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥

চিরস্থির রাজলক্ষ্মী থাকুন সদত
রাজ কোষে মণিমুক্তা সহিত কাঞ্চনে।

(সকলের অভিবাদন। রাজার গাত্রোত্থান ও সচকিতে অবলোকন।)

সুহা। সদত শচীশবাসে ছিলেন সুরত
শয্যাব্রতে পরমীলা, দাসী তাঁর আজি
নমিছে চরণে, ধীর, ভাগ্যধর তুমি
নরবর, নিজগুণে ক্ষম এ দাসীরে।

অনু। নন্দন—আদর্শ এই কঠিন ভূতলে
প্রেমিক প্রয়াসপূর্ণ প্রমোদ উদ্যানে
প্রবাসেন প্রেমব্রতা প্রেমিকা প্রমীলা।
ব্রততী যেমতি, মরি, ছায়ার আশ্রয়ে
পালেন যতনে যত শ্রান্ত ভ্রান্ত জনে,
বিতরি সুধার রাশি,—শান্তি সুখদানে,
ক্ষেমতি যতনে সতী পালেন সততঃ
পথশ্রান্ত যদি কেহ করে পদার্পণ
হেথা ইচ্ছায়। প্রাণমন উৎসর্গি যতনে।
আতিথ্য—সৌহৃদ্য ব্রত এ তিন ভুবনে
পালক পালনে পুণ্য, মোক্ষ হেন গণি
নরনাথ! রাজ্যধর তুমি, এবে অতিথি হে
তবু তাঁর গৃহে! তিষ্ঠি সুপ্রভাতা নিশি
করহ এখানে, রাজা, এ মম মিনতি।
পূরা'য়ে বাসনা তাঁর বাঁচাও দাসীরে।

রাজা (স্বগতঃ) ও কিরে পশিল ওই শ্রবণ বিবরে?
কল্লোলিনী মন্দাকিনী কুলু কুলু ধ্বনি?
কিম্বা সে বসন্তে, মরি, নব তরুশাখে
উল্লাস উচ্ছ্বাসে ভরা কোকিলা কুহরে?
ধন্যরে, নয়ন, তুই নরভাগ্য লভি
নেহারি পবিত্র মূর্ত্তি সার্থক হইলি।

চিত্র। যামিনী বিগতা প্রায়, বিলম্ব না সহে
নরনাথ! বৃথা ব্যজে কার্য্যক্ষতি সুধু।
ঐ দেখ ডুবিছে গগণে তারাপতি
রোহিনীর প্রেম-আশা ভাসায়ে পাথারে
অকুল। বিবর্ণ, মরি, চারু কান্তি প্রভা।
রসিককুলের নিধি! কহিনু তোমারে,
নাহি পালে প্রেমব্রত কভু সে দিবসে।

রাজা। দেবী কি মানবী আমি না পারি বুঝিতে,
ক্ষুদ্রনর—অজ্ঞতম অতি, সুরবালে!
নাহি জানি কোন্ বলে তুষিব যতনে
তোমা সবে; ক্ষমি দোষ আশীষ দাসেরে।

কুমু। নহি পূজ্যতমা তব আমরা সকলে,
নরেশ! নিষেব্যা জনে বৃথা এ মিনতি।
নিস্তল ত্রিদিবে যবে ভ্রমিতে হে সুখে
মদনবাঞ্ছিত, মরি, নন্দন কাননে,
স্বর্গীয় সুরভিপূর্ণ সুবর্ণ আধারে
যোগা'তাম মনোসাধে মাতিয়া উল্লাসে,
চন্দন চুচুম চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী।
কেমনে ভুলিলা, দেব, এত অল্প দিনে
অধিনীর সরলতা, মনঃ প্রাণ হরা
প্রমীলার প্রেম কথা, আদর্শ-সুষমা?
(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
অখণ্ড বিধির বিধি কে পারে খণ্ডিতে?
কি ছার মানব-কথা, লুপ্ত স্মৃতি দেবে।

চিত্র। বিপুল বিশাল রাজ্য পালিয়া যতনে
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি—কীর্ত্তিধর তুমি,
ধীর, নরকুলে সদা; নরের অকার্য্য
যাহা করিলা সকলি। স্থাপিলা যশের

স্তম্ভ। সাম, দান, দণ্ড, ভেদাদি কৌশলে
শিখা'লে নীতির গীত, রাজনৈতিকতা
এতদিন হীনমতি মানব-সন্তানে।
তুষ্ট এবে দেবরাজ এ ইষ্ট সাধনে,
প্রেরিলেন আমা সবে এ মহীমণ্ডলে
সাদরে লইতে তোমা অনন্তভবনে।

(সকলে নিস্তব্ধ)

সুহা। হৃদয়ে সঙ্কোচ যদি এ বাক্য পালনে
নরনাথ! লুপ্ত স্মৃতি আনিতে মস্তকে,
ওই যে স্বর্গের দৃশ্য পরিদৃশ্যমান
হেথা হ'তে, স্তরে স্তরে দেখাই তোমারে-
মানব চরম চক্ষে অপ্রকাশ যাহা। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

সুরেন্দ্র বিনোদিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—জানি না, ঈশ্বর বলিতে পারেন, কি কারণে বাঙ্গালীর উপর ইংরাজের এত বিষদৃষ্টি! তুমি ইংরাজ, অথবা ইংরাজ না হইয়াও ইংরাজি নবীশ—ইংরাজি ভাষায় যতপার গালি-বর্ষণ কর, নীরবে সহ্য হইবে; কিন্তু তুমি বাঙ্গালী তোমার কি ক্ষমতা একটি ও উচ্চ কথা বলিবে? নবম আইন তোমার মাথার উপর ঝুলিতেছে। আবার, বলিতে লজ্জা করে, যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের শ্লীলতার পরাকাষ্ঠা ১৪ আইনের বিচিত্র লীলায় অভিনীত হইতেছে, সেই গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা নাটকে "প্রণয় পীযূষ"—এতদূর অশ্লীলতা!—সহিতে পারিলেন না। কুক্ষণে অশ্লীলতা নিবারণ আইন জারি হইয়াছিল, কুক্ষণে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি এরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবুর পুণ্যবল যে, নাটক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, নচেৎ বোধ হয় তাহাকে লইয়া ও টানাটানি পড়িত। বাস্তবিক্ বড় ভয়

হইয়াছিল বুঝি পুনঃ-প্রকাশ রহিত হইয়া যাইবে। যাহাহউক দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড পাইয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই, অথচ যাহা আছে সহস্র পুরাতন হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না। অতি যতনে গ্রন্থকার তাঁহার কাব্যোদ্যানে পাশাপাশি দুটি পুষ্পের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। দুইটিই সুন্দর, দুইটিরই মুকুল অবস্থা, অথচ দুইটিই পরস্পর ভিন্নভাবাপন্না। বিনোদিনী আধফোটা গোলাপ, উচুপানে তাকাইতে জানে না আপন সৌন্দর্য্য ভারেই আপনি নত হইয়া রহিয়াছে। বিরাজমোহিনী ফুটিতোন্মুখী মল্লিকা সৌন্দর্য্যে ঢলঢল করিতেছে, সদাই হাসি হাসি, হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে এত চেষ্টা করিতেছে পারিতেছে না, পদে পদে সেই হাসি মুখে ধরা পড়িতেছে। বিনোদিনী গোলাপ, সদগন্ধামোদিনী, কিন্তু নিকটে লইয়া না গেলে গন্ধ পাইবে না; বিরাজমোহিনী মল্লিকা, শতহস্ত দূরে থাকিয়াও গন্ধে আমোদিত করিবে। দূর হইতেই ম্যাক্রেণ্ডেল একদিন ইহার গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। আবার, একদিকে সুরেন্দ্র অন্যদিকে হরিপ্রিয়, একদিকে মধুরতাপূর্ণ তেজঃ, অন্যদিকে তেজঃপূর্ণ মধুরতা, একদিকে সরলতাপূর্ণ সাহসিকতা অন্যদিকে সাহসিকতাপূর্ণ সরলতা—এমন সুন্দর মনোজ্ঞ চিত্র একস্থানে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা চেষ্টা করিলে সুরেন্দ্রকে ভুলিতে পারিব, তাঁহার সে বাঙ্গালী দুর্লভ বীরত্ব ভুলিতে পারিব, কিন্তু হরিপ্রিয়কে ভুলিতে পারিব না। অত সরলচিত্ত হইলেও তাঁহার ন্যায় লোকের দ্বারা ভ্রমবশতঃ মধ্যে মধ্যে সংসারে যে রূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। তার পর ম্যাক্রেণ্ডেল, অশ্লীলতম নাটকের অশ্লীল চরিত্র সকলের মধ্যে তাঁহার শ্লীলতার যাহা পরিচয় পাইয়াছি তাহা কখনই ভুলিবনা। আর সুরেন্দ্রের সম্মুখেই তাঁহার ঋণপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে ক্রোধে, বিস্ময়ে সুরেন্দ্র যখন বলিলেন—"আমি টাকা আদায় করিতে পারিব না? সাক্ষী নেই?" তখন ম্যাক্রেণ্ডেল গর্ব্বিতস্বরে তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন—"নির্ব্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্ব্ব যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি হয় নাই?"—সে দাম্ভিক উক্তি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ।

ভারতবন্ধু, ভারতদর্পণ, } দুইখানিই সপ্তাহিক সংবাদ পত্র। সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতামত নাই।

1880
CALCUTTA

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি।

—:০:—

(১১৩ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য জড়পদার্থ-সম্ভূত বটে, কিন্তু মনুষ্য নিজে জড় নহে। মনুষ্য চৈতন্য-বিশিষ্ট বিচারসামর্থ্য—সম্পন্ন, স্বেচ্ছাশক্তিমন্ত। মস্তকোপরিস্থ অনন্ত আকাশে অবিশ্রান্তগতি অযুত গ্রহ নক্ষত্ররাজি যে অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম শূন্য দেশে যে নিত্য আলোক প্রদানে নিরত রহিয়াছে, পদতলস্থ এই কণিকাবৎ পৃথিবীতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লক্ষিত অণু, লক্ষ্যাতীত পরমাণু প্রভৃতি জীবিত অজীবিত যাবতীয় পদার্থনিকর সর্ব্বদাই যে সচঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত হইতেছে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহান্ প্রাকৃতিক শক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। তাহা-দিগের আভ্যন্তরীণ এই অননুজ্ঞাত পরিচালক কর্ত্তৃক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ একমাত্র নিয়মে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, এবং সেই নিয়ম সর্ব্বত্রই এক ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। তবে পরিচালনীয় উপকরণ পদার্থ ভেদে, তদ্বৎ বাহ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ হেতু লৌকনয়নে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর এই যে মানবজীবন—ইহাও সেই অনন্তপ্রবাহী শক্তি-স্রোতে অবিরত ডুবিয়া উঠিয়া ভাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সেই দিগন্তপ্রসারী শক্তি মানবের মূল অবলম্বন হইলেও তাহার নিজের একটি স্বতন্ত্র শক্তি আছে বলিয়া অনুভব হয়। এই নিবিড় অনন্ত-পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই পরি-বর্দ্ধিত ও জীবিত মানব কিয়ৎ পরিমাণে ও স্বকীয় শক্তি বলে পরিচালিত হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্যের অধঃস্থ জীবমণ্ডলীর যেমন একটি বই পথ নাই, প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট বর্ত্ম ভিন্ন গতি নাই, মানুষীশক্তি সে রূপ কোন নির্দ্ধারিত রেখামধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এই অসীম অনন্ত বিপুল

বিশ্বই মনুষ্যের কার্য্যক্ষেত্র। যে নিজস্ব শক্তি লইয়া মনুষ্য এই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত। প্রাকৃতিক শক্তি হইতে ইহা স্বতন্ত্র হইলেও স্বাধীন নহে। বরং উহার অধীনতাতেই ইহার সার্থকতা। কিন্তু, তাই বলিয়া স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র মধ্যে ইহা স্বাধীনতাশূন্য নহে। প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনুষ্য কি রূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে এই মানুষী শক্তির প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

আমরা যেমন প্রাকৃতিক শক্তির উদ্ভব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই রূপ স্বেচ্ছাশক্তির মূল প্রস্রবণ নিরূপণে একেবারে অসমর্থ। তবে কার্য্য দেখিয়া উভয় শক্তিই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অপিচ, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, আমাদের বিচার শক্তি (Reasoning power) আছে বলিয়াই আমরা ইচ্ছাবান্ (willful)। যুক্তির দ্বারা দুইটী বস্তুর বিভিন্নতা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হই বলিয়া ভিন্নভাবাপন্ন বস্তু নিচয়ের ইতর বিশেষ বুঝিতে পারি এবং ইচ্ছানুসারে যে কোনটির অনুসরণ করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে প্রকৃতি-প্রদর্শিত পথে গমন করি সেই খানেই সফল-মনোরথ হই, নতুবা ব্যর্থ-চেষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। মানবীয় স্বেচ্ছাশক্তি-সম্ভূত কার্য্য যখন প্রকৃতির অনুযায়ী ও তাহারই সহায়বর্দ্ধক হয় তখনই সেই কার্য্যের সার্থকতা, তখনই সেই কার্য্য অভিপ্রেত হইয়া থাকে এবং তাহাতেই আত্ম সম্বন্ধে সৎ হয়। তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল। অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রলোভে পড়িয়া যদি প্রকৃতি-বিরোধী পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমরা অসৎপথের পথিক, তাহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। তাহাতে অনিষ্ট জন্মে—পাপ হয়।

বাল্য বিবাহের দোষে ভারতবর্ষ যে অধঃপতন পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা যাঁহারা চিন্তাশীল এবং কোন বিষয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাঁহাদিগের অভ্যাস আছে তাঁহারা বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহা যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য তাহা আর কাহাকে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে বিবাহ বাল্যে এই বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে, যৌবনে তাহা না করিলে অর্থাৎ প্রকৃতি যখন চায় তখন তাহা

পূরণ না করিলে আবার প্রায় সেই রূপ ফলই দর্শে, অথচ প্রকৃতির অনুযায়ীক হইয়া যৌবনে বিবাহ করিলে যে উপকার দর্শে, বর্ত্তমান সামাজিক উন্নতি তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে।

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ই মানুষী শক্তির কার্য্যক্ষেত্র। যে বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়া একজন অদীনসত্ত্ব ইংরাজ একজন নিরীহ ক্ষুধাতুর বাঙ্গালীকে পদাঘাতে যমসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বীয় অসীম শক্তির আস্ফালন করিতে লাগিলেন—তাহা ত পশুশক্তি মাত্র, পশুদিগেরই তাহা শোভা পায়; তাহা মানুষী শক্তির ব্যভিচার মাত্র, মানুষী শক্তি বলিয়া তাহা পরিচিত নহে। কিন্তু বোধ কর, স্বার্থ-প্রণোদিত কোন ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি ম্যানচেষ্টারের প্রবোচনায় ভারতবর্ষের দীন প্রজার সর্ব্বনাশের জন্য তুলাকর উঠাইয়া দিলেন; সহস্র সহস্র লোক দুঃখে ক্ষোভে নিরুপায় ভাবিয়া হস্তবিন্যস্তকপোলে উপবেশন পূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতেছে। এক সুরেন্দ্র নাথ অথবা লালমোহন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বৈদ্যুতিক-তেজ-সমন্বিত গুটিকতক কথা নিঃসারণ করিল, অমনি সকলে একমনে একপ্রাণে উঠিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অগ্রসর হইল। অথবা, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্ম্মজ্ঞানের অপলাপে ভারতবর্ষ নরক অপেক্ষাও ভীষণ দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে, এক রামমোহন রায় অথবা কেশব চন্দ্র সেন আসিয়া তিমিরাবৃত ভারতে স্বর্গরাজ্যের আলোক আনিয়া জনগণের সম্মুখে ধরিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ইরাবতী তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইয়া জগতের পানে চাহিয়া দেখিল। মানুষী ক্ষমতার এই সকল উদাহরণ। অন্তর্জগৎ ইহার কার্য্যক্ষেত্র। আর বহির্জগতে যে মনুষ্যের ক্ষমতা কতদূর সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নতিই তাহা প্রদর্শন করিতেছে। পর্ব্বত স্বীয় বিশাল বক্ষঃ উন্মুক্ত করিয়া মনুষ্যের গতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়াছে, সমুদ্র মস্তকে করিয়া তাহার যান দেশ দেশান্তরে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, আকাশের সৌদামিনী বার্ত্তাবহকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় ভূতশক্তি কৃতদাসের বেশে দিবানিশি মনুষ্যের আদেশ পালনে নিরত রহিয়াছে। মনুষ্য দুই হস্ত দুই পদ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এই বিচার-

শক্তি ও এই স্বেচ্ছাশক্তির সদ্ব্যয় করিয়া আজি সমস্ত জগতের অধীশ্বর স্বরূপ এই সকল সুখরাশি উপভোগ করিতেছে।

ক্রমশঃ

বঙ্গে কুলীনাধিকার।

(১৮০ পৃষ্ঠার পর)

যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহার অঙ্কুর দেখা দিল। সেই পাঁচ ব্রাহ্মণের যে ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিয়াছিল * তাহাদিগের প্রত্যেককে রাজা এক এক খানি গ্রাম প্রদান করিলেন। মর্য্যাদা আরো বাড়িল। সেই সেই গ্রামের নামানুসারে তাঁহারা অমুক গ্রামীণ বা অমুক গাঁই বলিয়া বিখ্যাত হইল। সমুদয়ে ৫৬ গাঁই উৎপন্ন হইল। ইহাদের পূর্ব্বে বঙ্গে আরো সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, জগাই, ভাগাই, সানাই, বালথবী, মুলুকঝুরি, প্রভৃতি তাহাদের মধ্যেও গাঁই ছিল। কিন্তু তাহারা পঞ্চগোত্র-বহির্ভূত, সুতরাং তাহাদের সহিত আদান প্রদান চলিল না। সপ্তশতী নামে অতি হীন অবস্থায় তাহারা পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল। তাহাতেও তাহাদিগের নিস্তার রহিল না, তাহাদিগের উপর নানা উপদ্রব ও নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল। তাহাদের সেই হীনতা-শৃঙ্খল আরো কসিয়া আঁটিতে লাগিল। নিয়ম হইল, উক্ত ৫৬ গাঁই মধ্যে যে কেহ তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবে, তাহারাও তাহাদিগের ন্যায় হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় হইবে। সপ্তশতীগণ এতদিন নিঃশব্দে সকল অত্যাচার

---

* ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতশ্ছান্দড়ানুনেঃ॥

সহিয়া আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল, সেই পঞ্চকনোজীর বংশধরগণ এক্ষণে বিদ্যালোপী, আচারভ্রষ্ট অথচ অত্যাচারী। আর সে অত্যাচার সহ্য করিবে কেন? নিভৃত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উভয়দলে ঘোর বিবাদ বাঁধিল।

কালে আদিশূরের নাম ভূতগর্ভে মিশাইল। বল্লালসেন গৌড়ের সিংহাসনে বসিলেন। রোগের চিকিৎসক মিলিল। এ রোগের ঔষধ দুই প্রকার—এক, একেবারে তাহাদিগকে মর্য্যাদাহীন করিয়া নিম্নপদস্থ করা; আর এক, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা পবিত্র আচারপূত এবং সদ্বিদ্বান্ তাহাদিগকে অন্য সাধারণ হইতে কোনও উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করা। বল্লাল সেন দেখিলেন, দ্বিতীয় প্রকরণটি প্রশস্যতর। ইহাতে যেমন গুণবানের পুরস্কার হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গুণহীনের তিরস্কার ও অবমাননা সহজ-সম্ভব। মাত্র গোত্রের দোহাই দিয়া অহঙ্কারে মাতিলে আর চলিবে না, গৌরব রক্ষা করিতে হইলে নব গুণের* আশ্রয় লইতে হইবে। সেই সমস্ত ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণের সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা এই নবগুণবলে লোকের প্রীতিভাজন হইল, রাজা তাহাদিগকে কুলীন উপাধি প্রদান করিলেন। অতঃপর কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি হইল।

বল্লাল মাত্র এই কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন, সদ্বংশই সদ্গুণ সমস্ত পোষণে সক্ষম, মানহানি ভয়ে বংশগত গুণের প্রতি কেহই অনাদর প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এই কৌলিন্য বংশপরম্পরাগত মর্য্যাদা বলিয়া বিহিত হইল। এ বিধানের আমরা দোষ দিই না। আমরা ভেণ্ডালজাতি (Vandals) নহি; যদি প্রতিভা, প্রকৃতি ও শিল্পাদির অতীত চিহ্ন দেখিয়া প্রশংসা করিতে পারি, পারিবারিক পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে কেনই বা না করিব? য়িহুদীবংশের মধ্যে বেনজামিন ও জুডার পুত্রদিগকে দেখিয়া যে জন্য আনন্দ হয়, সেই জন্য ব্রাহ্মণদিগের

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণম্।

মধ্যে শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপের সন্তানদিগকে দেখিয়া আনন্দ না হইবে কেন ?* তাই বলিতেছিলাম, বিধানটির দোষ দিই না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে ও আজো অনেকে এ বিধানের পক্ষপাতী †। বিধানটি ভাল, কিন্তু যদি তাহা রক্ষা হয়। বল্লাল যেমন সদ্‌গুণ রক্ষার্থ এই বিধানটি করিলেন, তেমনি আবার এই বিধানটি রক্ষার জন্য একটু দণ্ডের উল্লেখ থাকিলে, বুঝি, এত অনর্থ ঘটিত না। বুঝি, কটু রোগের কটু ঔষধই ভাল ছিল। বল্লাল তাহা বুঝিলেন না, বংশপরম্পরাশ্রিত কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। এইখানে চিকিৎসক ঠকিলেন। বিষবৃক্ষে ফল ধরিবার উপক্রম হইল।

ছাপান্নগাঁই মধ্যে বাছিয়া বন্দ্য, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পুতিতণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল ও কুন্দগ্রামী—সমুদয়ে এই আট গাঁই উক্ত নবগুণবিশিষ্ট মিলিল। ইহার মধ্যে সমুদয়ে উনিশ জন কুলীন হইলেন। পালধি প্রভৃতি ৩৪ গাঁই অষ্টগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের আবৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্ত্ত § গুণ ছিল না; তাঁহাদিগের শরীরে অর্দ্ধেক কনৌজ রক্ত ও অর্দ্ধেক সপ্তশতী রক্ত মিশ্রিত; এজন্য তাঁহারা হইলেন শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয়গণ তাহাদিগের মাতামহ গোষ্ঠি সপ্তশতীদিগের হইতে কিছু উচ্চ। গড়গড়ি প্রভৃতি আর ১৪টি গাঁই ছিল, তাহারা সদাচার কাহাকে বলে জানিত না; এজন্য তাহাদের সংজ্ঞা হইল—গৌণকুলীন। ব্যবস্থা হইল, কুলীন কুলীনের সহিত আদান প্রদান করিবে, শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে পারিবে না। করিলে, কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবে।‖ গৌণকুলীনের সহিত আদান প্রাদান একেবারে নিষিদ্ধ। এই

---

* See Calcutta Review. Vol. II. p. 9.

† It is a reverend thing to see an ancient castle or building not in decay, or to see a fair timber-tree sound and perfect, how much more to behold an ancient noble family which hath stood against the waves and weathers of time. BACON.

§ আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্ত শ্চাতুর্বিধঃ॥

‖ শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনোবংশজো ভবেৎ।

ব্যবস্থা যাহাতে বজায় থাকে, অর্থাৎ কুলীনদিগের মধ্যে যাহাতে এই গুণ সমস্তের ব্যভিচার না ঘটে, এজন্য এই সময়ে আর এক সম্প্রদায় হইল। তাহাদিগের ব্যবসায় হইল, কুলীনদিগের গুণগান ও ও বংশকীর্ত্তন করিবে, এবং তাহাদের গুণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ইহাদিগের উপাধি হইল—ঘটক।

এই মাত্র যে বংশজ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, ক্রমে তাহাও একটি শ্রেণী-বাচক শব্দ বলিয়া পরিগণিত হইল। কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীন ব্যতীত আর এক প্রকার ব্রাহ্মণ হইল, তাহাদিগের নাম হইল, বংশজ। কেহ কেহ বলেন, বল্লাল স্বয়ং কুলীনাদি শ্রেণী বিভাগের সম সময়ে এ শ্রেণী বিভাগ করেন নাই; 'বংশজ' এই শব্দটী তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল মাত্র। পরে, যে সকল ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দিয়া কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিল, তাহাদিগের জন্য ভবিষ্যৎ ঘটকগণ এই বংশজ ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, বন্দ্য প্রভৃতি ৮ গাঁই সমস্ত লোকের মধ্যে মাত্র ১৯ জন কুলীন হইল; কিন্তু, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট লোক-দিগের জন্য কি ব্যবস্থা হইল? বোধ হয়, বল্লাল তাহাদিগকেই বংশজ আখ্যা প্রদান করেন। বোধ হয়, ইহারাই আদি বংশজ, তৎপরে আদান প্রদান দোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে তাহারা ও বংশজ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। * এসমস্ত মীমাংসা কতদূর প্রামাণিক আমরা বলিতে পারিলাম না; ফলতঃ শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দিয়া হউক, অথবা গৌণ-কুলীনের কন্যাগ্রহণ করিয়া হউক, যে কোনও প্রকারে কুলগৌরব হারাই-লেই কুলীনেরা বংশজ হইতে লাগিল। নবগুণের মধ্যে অন্যান্য গুণ দূরে গেল, এক আবৃত্তি গুণই কুলীনের কুলীনত্ব রাখিবার উপায় বলিয়া স্থির হইল! ক্রমে বংশজ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। এতদিনে বিষবৃক্ষে ফল ধরিল।

(ক্রমশঃ)

---

* বহুবিবাহ ১ম খণ্ড ২৪ শ পৃষ্ঠা দেখ।

তোষামোদ দর্শন।

১ম। সূত্র। বড় লোকের সাক্ষাতে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করাকে তোষামোদ বলে।

[ভাষ্য]

বড়লোক অর্থে দীর্ঘহস্তপদবিশিষ্ট, (৩×৪) ফিট লম্বা চৌড়া ব্যক্তি বুঝায় না। 'ড়লয়োরভেদঃ'—সুতরাং 'বড়' স্থানে 'বল' বুঝিতে হইবে। হিতোপদেশকর্ত্তা বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন—'অর্থেন বলবান্ লোকে'—অতএব অর্থ সম্পন্ন যিনি, তিনিই এ সংসারে বড় লোক। (আফিষের বড় সাহেব ও বড় বাবু বড় লোক মধ্যে গণ্য।)

গুণ—অভিধানে যে গুণ ও দোষের কথা লেখে, বড় লোক শব্দে তাহা বাচ্য হইতে পারে না। বড় লোকের দোষ গুলিকে ও গুণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। 'অর্থাদ্ভবতি পণ্ডিতঃ'—যাঁহার অর্থ আছে তিনি পণ্ডিত। পণ্ডিতের সকলই গুণ। যথা চাণক্য—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে।'

কীর্ত্তন। কীর্ত্তন অর্থে খোল করতাল বাজাইয়া হাত নাড়িয়া নাকি সুরে মধুকানি ঢপ সঙ্গীত গান করা কেহ যেন না বুঝেন। গুণের সাধারণতঃ উক্তির নামই গুণ-কীর্ত্তন। তবে যদি কেহ ছুঁচার কীর্ত্তন করিতে পারেন তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

বড় লোকের সাক্ষাতে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন—এ কথায় অসাক্ষাত বা অন্য কোন স্থল একেবারে পরিত্যক্ত হইতেছে। অর্থাৎ সাক্ষাতে করিবে, অসাক্ষাতে করিবে না। করিলে, বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

২য়। সূত্র। তোষামোদ ত্রিবিধ। স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও ঔপমানিক।

[ভাষ্য]

স্বাভাবিক তোষামোদ—অর্থাৎ উক্ত বড় লোকের স্বভাবে যথার্থই যে গুণ গুলি বর্ত্তমান আছে। যথা—দাতা হইলে দাতা, ধার্ম্মিক হইলে ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ হইলে বিদ্বান্ ইত্যাদি।

অস্বাভাবিক। যে গুণ বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া খুঁজিলে ও তাহার স্বভাবে মিলিবে না। যথা—কৃপণ হইলে ও দাতা, পাপী হইলে ও ধার্ম্মিক, মূর্খ হইলে ও বিদ্বান্—ইত্যাদি।

ঔপমানিক। গুণ থাকিতে ও পারে, নাও থাকিতে পারে ; অথচ সেই সকল গুণের জন্য কোন ও মহাপুরুষের সহিত উপমা দেওয়া। যথা—কৃপণ হউন বা দাতা হউন, তিনি দানে বলিরাজা ; ধার্ম্মিক হউন বা অধার্ম্মিক হউন, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির ; মূর্খ হউন বা বিদ্বান্ হউন, বিদ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস—ইত্যাদি।

৩য়। সূত্র। সাধারণতঃ তোষামোদের প্রণালী আট প্রকার। মূর্দ্ধন্য, মৌখিক, অনুনাসিক, চাক্ষুষ, মানস, হাস্ত, ত্বাচ এবং পাদ।

[ভাষ্য]

মূর্দ্ধন্য—কথায় কথায় সর্ব্বদা সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা।

মৌখিক—'আজ্ঞে', 'মহাশয়,' 'হুজুর,' 'জল উচু? উচু, নীচু? নীচু,' ইত্যাদি শব্দ সমূহ-প্রয়োগ।

অনুনাসিক—মাঝে মাঝে আপন কষ্ট জানাইবার জন্য মাকে কান্না।

চাক্ষুষ—বাবুর বেশ্যার বিড়াল মরিলে, তাহার জন্য ২।১ ফোঁটা চক্ষের জল ফেলা।

মানস—বাবু একটা কথা না বলিতেই অনুমানে সেই কথা লুফিয়া লওয়া।

হাস্ত—তৈলাদি মর্দ্দন, সময়ে ২ বোতলস্থ ব্রাণ্ডি গেলাসস্থ করণ।

ত্বাচ—বাবুর নন্দদুলালিগোছ গোল গাল টেঁপাটোঁপা ছেলেটির আব্দার জনক প্রহার-সহিষ্ণুতা।

পাদ—বাবুর কর্ম্মে সর্ব্বদা দৌড়ঝাঁপ।

৪র্থ। সূত্র। এতদ্ভিন্ন কার্য্যকে তোষামোদ বলে না।

[ভাষ্য]

কেহ কেহ এ প্রকার আরো ২।৪ টি গুরুতর কার্য্যকে তোষামোদ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা মিথ্যা। যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিন্দুক।

৫ম। সূত্র। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চাতুর্ব্বর্গ ফলই তোষামোদে সহজে লাভ করা যায়।

[ভাষ্য]

ধর্ম্ম। 'শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্'—ইহা কালিদাসের কথা। শরীরের উন্নতি থাকিলেই ধর্ম্মের উন্নতি। তোষামোদে বৈকালি, ফলাহার, জলযোগ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা।

অর্থ। চাক্‌চিক্যশালী ঝন্‌ঝনায়মান রজতখণ্ডের সাধারণ সংজ্ঞা অর্থ। এই অর্থ লাভের জন্যই তোষামোদ দর্শনের বিশেষ সৃষ্টি।

কাম। যে কোন কামনা হউক, পুত্রের চাকুরি কামনা হউক, সংবাদ পত্র চালাইবার কামনা হউক, গৃহিণীর গহনা গড়াইবার কামনা হউক, যাহাই হউক, তোষামোদে তাহা সহজেই পূরণ হইবে। সমস্ত বিশেষে শনিবারে বাবুর সহিত বাগানে গেলেও——

মোক্ষ। নেশার ঝোঁকে বাবু কখন কখন 'বাপান্ত' প্রভৃতিই ও করিয়া থাকেন। তাহাতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হন। সুতরাং যে পিতৃঋণ-মুক্ত, তাহার মোক্ষ অনায়াসলভ্য।

৬ষ্ঠ। সূত্র। তোষামোদ সাধনের নিমিত্ত দ্বিবিধ উপায় অবলম্বনীয়। শারীর ও মানস।

[ভাষ্য]

ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।' সাধন করিতে হইলে শরীরের পতন নিশ্চিত প্রয়োজন। তোষামোদ সাধনে তদপেক্ষা মনের পতন অধিকতর প্রয়োজনীয়। বিবেক ও ন্যায় এখানে বলিয়া দিতে হইবে; সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান, নিজের মানমর্য্যাদা-বোধ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি অবশ্য বর্জ্জনীয়।

৭ম। সূত্র। যাঁহারা তোষামোদ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ তোষামোদী বলা যায়।

[ভাষ্য]

চাটুকার, মোসাহেব, লক্ষীর বরযাত্র, প্রভৃতি অরো অনেক কথা তোষামোদী শব্দের প্রতিপাদ্য।

৮ম। সূত্র। অতএব সকলে যদি চাতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে চাও, বড় লোকের তোষামোদ কর।

[ভাষ্য]

এই সূত্রে পূর্ব্ব সূত্র গুলির একত্রে সমন্বয় করা হইল, এবং প্রতিপন্ন হইল যে, ইহা একটি বাঙ্গালার অত্যুৎকৃষ্ট দর্শন শাস্ত্র এবং আমরা (গৌরবে বহুবচন) ঘোর দার্শনিক। অতএব ভরসা করি, ভবিষ্যৎ তোষামোদ-শিক্ষার্থীগণ মনোভিনিবেশ সহকারে এই দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন।

ইতি শ্রীকল্পনায়াং মাসিক পত্রিকায়াং
সমাপ্তোহয়ং তোষামোদনাম দর্শনঃ।

সুহাসিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দূতী।

Por: Come on, Nerissa, I have work in hand,—
Merchant of Venice.

সূর্য্য উঠিয়াছে। শৈলবালা ধীরে ধীরে আপনার গৃহে আসিয়া জানালা খুলিবা মাত্র সূর্য্যের আলো আসিয়া গৃহে পড়িল। লিখিবার উপকরণ সমস্ত নিকটে ছিল, শৈলবালা একখানি পত্র লিখিল। লিখিল,—

চারু; এতদিন যে ভাবটি হৃদয়ে অতি যতনে পুষিয়া রাখিয়াছিলাম—

যাহা এতদিন কাহাকেও বলি নাই, অথবা কখন যে বলিব তাহাও যাহা মনে ভাবি নাই—আজ তাহা তোমারই নিকটে প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছি, কিছু মনে করিও না, ভাই।

দিনাজপুর হইতে কেন আসিলাম, তাহা তোমায় কি বলিব? তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রীলোকের হৃদয় বুঝিবে কিরূপে? যদি স্ত্রীলোক হইতে, একদিনের তরেও যদি এ হৃদয়ের শতাংশজ্বালা ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলেও বুঝিতে পরিতে কিনা জানি না। স্ত্রীলোকের হৃদয় সব সহিতে পারে, কিন্তু প্রেমের কণ্টক সহিতে পারে না। চারু, যেখানে সে কণ্টক সদাই চক্ষের উপর, সেখানে স্থান হইবে কিরূপে?

পূর্ব্বের কথা সকল মনে পড়ে না, অথবা যাহা পড়ে যে—এ পোড়া মনে যাহা সদত জাগিতেছে তাহাই বা আর বলিব কি? বলিয়াই বা ফল কি? আমি অভাগিনী, মাতা নাই, পিতা কোথায় জানিনা, সংসার মরুময়। শৈশব হইতে যে প্রেমের আশ্রয়ে এত দিন এ পোড়া দেহভার বহিলাম, ভাগ্যদোষে তাহাও নির্ম্মূলপ্রায়! তাহা নহিলে যাহাকে হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিতে এত সাধ, তার গলায় মালা দিতে গিয়া সে মালা ছিঁড়িবে কেন? চারু! সুখ, আশা, অভিলাষ—হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলি ফুরাইতে বসিল।

যখন দিনাজপুর হইতে আসি, বড় আশা ছিল একবার অর্থের চেষ্টা করিয়া দেখিব, দেখিব অর্থেও তোমার প্রেম লাভ করিতে পারি কি না। অর্থচেষ্টা করিলাম। অর্থ পাইয়াছি, এখন আমি বঙ্গেশ্বরী। কিন্তু বঙ্গেশ্বরী হইয়াও তোমায় পাইলাম কৈ? চারু, সত্যই কি তুমি এতই দুর্ল্লভ!

আর একটি কথা বলিয়া এ পত্র শেষ করিব। চারু, তুমি আমায় যবনী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছ, কিন্তু বিশ্বাস করিবে কি! যবনীর বেশ পরিয়াছি বটে, কিন্তু যবনী হই নাই। চারুচন্দ্র আর কাসিম খাঁ! ছিঃ মুক্তার নিকট শম্বুক! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! চারু, শৈলবালাকে শতপাপিনী বলিতে পার, কিন্তু শৈলবালা দ্বিচারিণী নয়। গৃহস্থ চোরকে ফাকি দিবার জন্য যেমন তাহার একমাত্র রত্নটি যতনে আবরণমধ্যে লুকাইয়া রাখে, তেমনি তোমারি জন্য—তোমারি জন্য, চারু, আজও নানা কৌশলে এই বিজাতীয় পরিচ্ছদ মধ্যে এ হৃদয় লুকাইয়া রাখিয়াছি। চারু, ইহা কি তোমার গ্রাহ্য হইবে না?

এ পত্রবাহিকা বিশ্বাসিনী। যাহা বলিতে হয়, নিঃসন্দেহে বলিয়া দিও। ইহার নিকট আমার শৈলবালা বলিয়া সম্বোধন করিও না,—বলিতে লজ্জা করে—এ হতভাগিনীর নাম এখন

মতিয়া।

পত্র লেখা শেষ হইল। একবার, দুইবার তাহা পাঠ করিল। পত্র মুড়িয়া শিরোনামা দিল। পাশের ঘরে একজন বাঁদী থাকিত, ডাকিল —'বিবিজান।' বিবিজান এতক্ষণ জানালায় মুখ দিয়া একটি পুরুষের সঙ্গে কি ইশারা করিতেছিল, কর্ত্রীর ডাক শুনিবামাত্র বড় অনিচ্ছায় মনোমত-ধনকে হাত নাড়িয়া বিদায় দিয়া বলিল—'যাই।'

বিবিজান আসিল। শৈলবালা বলিল, "বিবিজান, তুই একটা কাজ কর্‌তে পারিস্।

বি। কাজ! বিবিজান পারে না এমন কি কাজ আছে? সফী নানি ও যারে-

শৈ। মর, অত চেঁচাস্ কেন? কে কোথা দিয়ে শুন্‌তে পাবে।

বি। কেন, বিবিজান আর তো হিঁদুর ঘরের বৌ নয়।

শৈ। দূর! চুপকর। আমি যা বলি, তা পার্‌বি?

বি। আমি না পারি কি? কি করিতে হ'বে বলইনা।

শৈ। দেখিস্ সাবধান, সুবাদার জান্‌তে পারলে আগে তো তোরই প্রাণ যাবে, তারপর আমারও নিস্তার থাক্‌বে না।

বি। আর, যদি না জান্‌তে পারে?

শৈ। তা হ'লে, আজ হ'তে এই হার ছড়া তোর গলায় শোভা পাবে।

শৈলবালা বস্ত্র উন্মোচন করিয়া আপনার সেই কণ্ঠলগ্ন অমূল্য হার দেখাইল। সৌরকর-প্রতিবিম্বে সে হার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। বিবিজান তাহা দেখিল। বলিল—"পারিব, কি করিতে হইবে বল।"

শৈ। আমাদের যে একজন বাঙ্গালী সেনাপতি আছেন, জানিস্।

বি। জানি। কেন?

শৈ। এই পত্রখানি তাঁকে দিয়া আসিতে হইবে।

বিবিজান বিস্মিত হইল, কথা কহিল না। শৈল বলিল, "চুপ করিলি যে!

বি। বিবি, ক্ষমা করুন, ইহা আমার অসাধ্য।

শৈ। বলিস্ কি, তুই পার্‌বিনে।

বিবিজান কথা কহিল না, পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। শৈল বলিল,—এই বুঝি জারি! আচ্ছা, তুই যা।"

বিবিজান চলিয়া গেল। শৈলবালা দেখিল, যথার্থই বিবিজান গেল, কিন্তু সে ভিন্ন এ কাজ আর কাহারো দ্বারা হইতে পারে না, বিবিজানই এ কার্য্যের একমাত্র বিশ্বাসপাত্রী। শৈল আবার ডাকিল, "বিবিজান, শোন্।"

বিবিজান নিকটেই ছিল। মৃদু বায়ু সঞ্চালনে শৈলবালার বসনের ভিতর হইতে হারের উজ্জ্বল আভা বাহির হইতেছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। লোভ সামলাইতে পারিল না। আসিয়া বলিল—"আবার ডাকিতেছ কেন?"

শৈ। যে হার দিব বলিয়াছিলাম তাহা দিতেছি এই ধর।

শৈলবালা সেই অনন্ত-রত্ন-খচিত অনন্ত-প্রভাময় হার বিবিজানের হস্তে দিল। বিবিজানের মুখে একটু হাসি আসিল। বলিল—"তবে, সত্যই কি সেখানে যেতে হ'বে?"

শৈ। যেতে হ'বে বৈ কি, দেখিস্ সাবধান।

বি। সে কথা আর বিবিজানকে বলিতে হইবে না। কৈ, পত্র দাও।

শৈলবালা পত্র দিল। বিবিজান পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পত্রের কি হইল?

Do not the hist'ries of all ages
Relate miraculous presages
Of strange turns in the world's affairs?

Hudibras.

এখন, সে পত্রের কি হইল বলি শুন।

বিবিজান পত্র লইয়া আপন গৃহে গেল তখন যাইবে কি না অনেক

ভাবিল। দেখিল, বেলা অনেক হইয়াছে; স্থির করিল, সন্ধ্যার সময় যাইবে। বিবিজান আহারাদির উদ্যোগ করিতে গেল।

রৌদ্র পড়িল, সূর্য্য ডুবিল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিবিজান যাহা পারিল আপনার চুলটি বাঁধিয়া সিন্দুক খুলিল। সিন্দুক বস্ত্রে পূর্ণ। তাহার মধ্যে বাছিয়া ২ একটি পেশোয়াজ লইয়া পরিল, সে পেশোয়াজের উপর সে হার দুলাইল। হার ছড়াটি যাহাতে সকলে দেখিতে পায়, এমনি করিয়া একখানি ওড়না গায়ে দিল। তার পর বাটা হইতে পান লইয়া চিবাইল। নিকটে একখানি দর্পণ বিলম্বিত ছিল, বাম হস্তে ধরিয়া বিবিজান তাহাতে আপনার ঠোঁটখানি দেখিল। অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। সে হাসির অর্থ আমরা তত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তবে বিবিজান আপনার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে দুই একবার 'রোস্তম রোস্তম' বলিয়াছিল। রোস্তম তাহার মনোমত-ধন।

ক্রমে ঘোর হইয়া আসিল। ঘরে চাবি দিয়া পত্রখানি কাপড়ের ভিতর রাখিয়া একখানি রুমাল হাতে করিয়া বিবিজান দৌত্য কার্য্যে চলিল। সে আপন মনে চলিয়া যাইতেছিল, কে ডাকিল—'জানি!' বিবিজান পশ্চাতে ফিরিল, দেখিল, রোস্তম। একটু হাসিয়া বলিল—'দোস্ত।'

র। তবে, জান, সন্ধ্যার সময় এ বেশে কোথায়?

বি। যেখানে খুসি।

র। যেখানে খুসি!

একটু হাসিয়া বিবিজান বলিল—'কাজেই, তোমায় তো পেলাম না।'

র। আমায় পেলেনা! এ গোলাম তো চিরদিনই তোমারি। আমায় পেলে না,—সে কি বিবিজান?

বি। তা বৈ কি, হানিপের মা না ছাড়িলে তো আর পাইব না। (হানিপ রোস্তমের চারিবৎসর-বয়স্ক পুত্রের নাম)

র। বলেছি তো, সে ভাবনা তোমার নাই। সে না ছাড়ে, আমি তাকে ছাড়িব।

বি। ও তোমার মুখের কথা।

র। না বিবিজান, তুমি দেখ, যে দিন তোমায় আমায় সাদি হবে সেই

দিলই তাদের তাড়িয়ে দিব।

বি। দেবে?

র। দেব।

বি। বিশ্বাস হয় না। পুরুষ জাতিকে বিশ্বাস নাই। (বিবিজান মনে মনে বলিল, বাস্তবিক্ যে একজনের জন্য আর একজনকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিতে পারে তার মত বিশ্বাসঘাতক আর কে?)

র। এই তোমার পায় হাত দিয়া——

বিবিজান দেখিল, যথার্থই পায়ে হাত দেয় বলিল—"ওকি, কে কোথা দিয়ে দেখ্‌তে পাবে, উঠ।

র। উঠি; কিন্তু নিকা কবে হবে, জান?

বি। ব্যস্ত হইওনা। আজ সকালে যখন জানালা দিয়া কথা কহিতে কহিতে তোমায় বিদায় দিই, তোমার মুখখানি দেখে বড় কষ্ট হ'য়েছিল থাকিতে না পারিয়া এই কথা বলিতে আসিয়াছি।

মুহূর্ত্তের জন্য রোস্তম পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিল। বলিল 'সত্যি?'

বি। সত্যি। তবে, এখন বিদায় দাও, যাই।

রো। সেকি? আজ আর কোথায় যাবে? কেমন ভাল সুরা এনেছি, চল ঘরে যাই।

রোস্তম বিবিজানের হাত ধরিয়া টানিল। বিবিজান দেখিল বড় পীড়া পীড়ি, বলিল—'ছাড়িয়া দাও, বেগম সাহেব আমায় খুঁজিবেন, আজ যাই, তখন আর একদিন আস্‌বো।'

রোস্তম দেখিল, চেষ্টা করা বৃথা, বিবিজান থাকিবে না। একটু হতাশ হইয়া বলিল—'আসবে?'

বি। আস্‌বো।

বিবিজান প্রস্থান করিল। যাইবার সময় তাহার কাপড় হইতে কি পড়িয়া গেল, সে তাহা জানিতে পারিল না। রোস্তম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল, দৌড়িয়া আসিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল। দেখিল—একখানি পত্র। গৃহে যাইয়া আপনার বিছানার নীচে রাখিয়া দিল।

কতক দূর আসিয়া পত্রের কথা মনে পড়িল। বিবিজান যেখানে

রাখিয়াছিল, হাত দিল, পাইল না। মুখ শুকাইয়া গেল, অঙ্গের বস্ত্রাদি ঝাড়িয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিল তাহা তন্ন তন্ন করিতে লাগিল, পত্র মিলিল না।

না মিলিল তো আর কি হইবে? কোন বিষয়ের জন্য বহুক্ষণ চিন্তা করা বিবিজানের অভ্যাস ছিল না। বিবিজান গৃহে ফিরিল। শৈলবালা আপনার ঘরের দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিল; বলিল—'কেও, বিবিজান?'

বি। হাঁ।

শৈ। এত দেরি!

বি। কাজেই। তখনই তো বলেছিলাম, বিবি, ইহা আমা হইতে হইবেনা।

শৈ। কেন, কি হ'য়েছে?

বি। হবে আর কি? গরিব ব'লে কি আমাদের প্রাণে আর কিছুই দরদ নেই?

শৈ। মর! কি হ'য়েছে বল্ না।

বি। তা বৈ কি, বড় মানুষের বাড়ি চাকুরি করা ঝক্‌মারি। সেখানে খেলাম মার, এখানে খাই গালাগালি।

শৈ। সে কিরে, তোরে মার্‌লে কে?

বি। সে কথা আর কি বলিব? গিয়া তো পত্র দিলাম, কি লিখেছিলে জানি না। সে পত্র পড়িয়াই তো টুকরা ২ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, আর আমায় কিছু না হবে তো সহস্র গালি। ওমা, শেষ কি না—প্রহরী দিয়া আমায় মেরে তাড়িয়ে দিলে। (বিবিজান একটু নাকে কাঁদিল।)

শৈলবালা চুপ করিয়া সকল শুনিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি চিন্তা করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"কাঁদিস্‌নে, এখন তুই যা।"

বিবিজান চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে একবার পশ্চাতে চাহিল। দ্বারে আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দেখিল, তাহার বেগমের চক্ষে ফোটা ফোটা জল!

প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাস ও সেক্সপীয়র।

কালিদাস ও সেক্সপীয়রকে লইয়া আজ কাল সাহিত্য সমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। কেহ বা সেক্সপীয়রকে অসাধারণ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া একেবারে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছেন, আর কালিদাসের কিছুই কবিত্বশক্তি নাই, কেবল ভাষার লালিত্যে এতদিন আমাদের মনোহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্য জগতে নূতন সত্যের অবিষ্কার করিতেছেন। আবার কেহ বা সেক্সপীয়ার অপেক্ষা কালিদাসের কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কোন কবিরই পক্ষপাতী নহি। উভয়েরই কবিত্বশক্তি দেখিয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়াছি, উভয়েরই প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান সমান। একজন সমালোচকের ন্যায় আমরাও মুক্তকণ্ঠে বলি—"কালিদাস যদি এক সৌর জগতের সূর্য্য হন, সেক্সপীয়র অন্য সৌরজগতের সূর্য্য।" আমরা এই দুইজন অসাধারণ কবির কবিত্ব সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করি নাই। ইঁহাদিগকে একত্রে সমাবেশ করিয়াই আমাদের লেখনী কাঁপিতেছে, সমালোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? তবে কালিদাস ও সেক্সপীয়ার প্রকৃতিবর্ণনায় কি রূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই স্পষ্ট করিয়া দেখানই আমাদের এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

কালিদাস প্রতিভা বলে ভারতে যে কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্তকাল থাকিবে, সময় শত চেষ্টা করিলেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না, সমালোচক সে কীর্ত্তিলোপ করিবার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিলে ও তাহা চিরকাল অক্ষয় থাকিবে। সেক্সপীয়ারের প্রতিভা ও কালিদাসের প্রতিভা হইতে কোনও অংশে ন্যূন নয়। ইংলণ্ড এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সেই প্রতিভার অনন্তকাল পূজা করিবে। বড় আহ্লাদের বিষয়, তাঁহার কীর্ত্তি লোপ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড কিম্বা সমগ্র ইয়ুরোপে এপর্য্যন্ত কোনও সমালোচক লেখনী ধারণ করেন নাই।

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, প্রতিভা কি। আমরা প্রতিভাকে ঈশ্বর দত্ত অসাধারণ ক্ষমতা ভিন্ন আর কোনও আখ্যা দিতে পারিলাম না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রতিভাবিশিষ্ট হউন না কেন, সেটি তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। নিজের চালনা দ্বারা তিনি প্রতিভার স্ফূরণ করিতে পারিবেন, মাত্র অভ্যাস দ্বারা প্রতিভা-বিশিষ্ট হইতে কখনই পারিবেন না। তুমি, আমি সহস্র বৎসর ধরিয়া কল্পনা দেবীর আরাধনা করিলেও কালিদাস কি সেক্সপিয়ার হইতে পারিব না। প্রতিভা যদি ঈশ্বর দত্ত হইল, তবে প্রতিভাবিশিষ্ট ব্যক্তি যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই।

এস্থলে আমরা বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এই উভয় প্রকৃতি বর্ণনায় পৃথিবীর দুইজন প্রধান কবি কিরূপ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কবির প্রকৃতিগত প্রাণ, প্রকৃতি লইয়া তাঁহার লীলা খেলা। যে কবি প্রকৃতি-পুস্তক বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া নিজের আয়ত্বাধীন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত কবি নামের যোগ্য। বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া কবি আমাদিগকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মোহিত করেন। তিনি কখন আমাদিগকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লইয়া যান, কখন মনোহর পুষ্পোদ্যানে লইয়া গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দেখান, কখন বা কল্লোলিনী স্রোতঃস্বতীতীরে লইয়া গিয়া তাহার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর কলকলধ্বনিতে আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করেন, আবার কখন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আমাদের হৃদয়কে নাচাইতে থাকেন। আবার পক্ষান্তরে, অন্তঃ-প্রকৃতি বর্ণনায় কবি আমাদিগকে নানারূপ মানবচিত্র দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া থাকেন। সে সকল চিত্রে আমরা দেখি, কখন ধর্ম্মের শান্ত মূর্ত্তি আমাদিগের সন্দেহাকুল মনে শান্তি স্থাপনা করিতেছে, কখন বা অধর্ম্মের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৃদয়কে আকুলিত করিতেছে, আবার কখন প্রণয়ের সুখকর মূর্ত্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। তাহাতে আমরা দেখি, কোথায় প্রণয়িনীর প্রণয়-স্রোতঃ মনোমত প্রণয়পাত্রে মিশাইতে পারিল না বলিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে; কোথায় বা নায়ক কিম্বা নায়িকা প্রণয়ের অনুরোধে নায়িকা কিম্বা নায়কের সুখের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছে—নিজের সুখের বা মঙ্গলের

প্রতি দৃষ্টি নাই! এরূপ নিঃস্বার্থ প্রণয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি, সাহানুভূতি ও স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি যে কিছু স্বর্গীয় পদার্থ এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে এখনও রহিয়াছে তাহাদিগের এক একটি নয়নানন্দদায়ক ধীর মূর্ত্তি কবি আমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। আবার প্রতিহিংসা, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি পিশাচেরা যে ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যসমাজে অহরহঃ কত অনিষ্ট করিতেছে তাহাও আমরা তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনায় দেখিতে পাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, বাহ্য-প্রকৃতি না অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনা করা কবির কর্ত্তব্য? আমরা বলি, যখন কবি প্রকৃতি-গতপ্রাণ হইলেন, তখন তাঁহাকে উভয় প্রকৃতিই বর্ণনা করিতে হইবে; তাহা না হইলে তাঁহার কাব্য তত সুন্দর হইবে না। জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেল বাইবেলের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে (Back-ground) নানাবিধ বৃক্ষ কিম্বা পর্ব্বত-শ্রেণী ও মস্তকোপরিস্থ বিচিত্র আকাশমণ্ডল অঙ্কিত না করিলে ঐ সকল চিত্র কখনই আমাদের ততদূর হৃদয়গ্রাহী হইত না। চিত্রকরের পক্ষে যেরূপ কবির পক্ষেও ঠিক্ সেইরূপ। তিনি মাত্র বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনা করিলে চলিবে না। আর বাহ্য প্রকৃতির ক্রিয়া দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতির কিরূপ অবস্থা হয় তাহাও কবিকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে। একটি ফুল ফুটিল, তাহার সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল, সান্ধ্য-সমীরণে ঈষৎ চালিত হইয়া পাতাগুলি ফুল কোলে করিয়া নাচিতে লাগিল। বাহ্য প্রকৃতির এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা অন্তঃপ্রকৃতিতে কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত হইল কবিকে তাহা বিশদরূপে দেখাইতে হইবে। দেখাইতে হইবে, বাহ্য-প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কিরূপ নিকট সম্বন্ধ, উভয়ে উভয়ের কিরূপ অনুযায়ী, একের ভাবে অপরের কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবনীয়। আমরা প্রথমে বাহ্য-প্রকৃতি, পরে অন্তঃপ্রকৃতি এবং সর্ব্বশেষে—বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ায় অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্ত সমূহ লইয়া আন্দোলন করিব।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যচিকিৎসা।

(১৬৫ পৃষ্ঠার পর

৮। তৈল ব্যবহার। তৈলের মধ্যে তিল তৈল শ্রেষ্ঠ। সর্ষপ তৈল প্রায় সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। এই তৈল দ্বারা গণ্ডুষ করিলে দন্তমূলের স্ফীততা নষ্ট ও চর্ব্বণশক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং অম্ল দ্বারা দন্তহর্ষ হয় না। ইহা মস্তকে সুচারুরূপে মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল, খালিধরা, অকালপলিত ও কেশক্ষয় হয় না; কেশ সকল চিক্কণ, দীর্ঘ, শোভাযুক্ত, ইন্দ্রিয় প্রসন্ন ও অগ্নি পরিশুদ্ধ হয়।—কর্ণদ্বয়ে পূরণ করিলে বাতজ পীড়া, হনুস্তম্ভ, মন্যা-স্তম্ভ ও বধিরতা হয় না।—গাত্রে মর্দ্দন করিলে শরীর স্নিগ্ধ, কোমল, শ্রমসহ বলবিশিষ্ট ও চাকচিক্যযুক্ত হয়, ত্বক স্পন্দন হয় না। এবং কোষ্ঠে প্রশান্ত-রূপে বায়ু সঞ্চরণ করে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীর শীঘ্র জরা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহারা কফ রোগাক্রান্ত অথবা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, কিম্বা যাহারা বমন, বিরেচনাদি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উক্ত তৈলাভ্যঙ্গ বিহিত নহে।

৯। স্নান। প্রত্যহ স্নান করা উচিত। স্নান দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি, আয়ু, পুরুষত্ব ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং চুলকানি, অরুচি, গাত্র-দৌর্গন্ধ, শ্রম, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ ও পাপ নাশ হয়। অর্দ্ধিত বায়ুগ্রস্ত, চক্ষু-রোগী, মুখ-রোগী, কর্ণ-রোগী, অতিসার-রোগী, এবং যাহাদের পেট ফাঁপে, অজীর্ণ আছে ও অল্প দিন কফ লাগিয়াছে, তাহা-দের পক্ষে স্নান বিহিত নহে। আহারান্তে স্নান করা সম্পূর্ণ অহিতকর।

১০। ঋতুচর্য্যা। বৎসরে ঋতু ছয়টি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত। দুই মাস অন্তর এক এক ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া বৎসর পূর্ণ হয়।

ঋতুর পরিবর্ত্তন সময়ে স্বভাবতঃ মনুষ্যদিগের শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

ঋতু সকল দুই অয়নে বিভক্ত। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুকে উত্তরায়ণ, এব অবশিষ্ট ঋতু তিনটিকে দক্ষিণায়ন বলে। উত্তরায়নে সূর্য্যের গতি উত্তর দিকে ও উহার তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এবং তজ্জন্য বায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রুক্ষস্বভাব হইয়া জগতের স্নিগ্ধ গুণ নষ্ট করতঃ তিক্ত, কটু, কষায় এই রুক্ষ রস ত্রয়কে বীর্য্যবান্ করিয়া মনুষ্যগণের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। দক্ষিণায়ন কালে সূর্য্যের গতি দক্ষিণ দিকে হয়, উহা হীনশক্তি হইয়া পড়ে, এবং চন্দ্রের বল বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র আপনার শীতল কিরণ দ্বারা এই কালে জগতের সন্তাপ নিবারণ করিয়া অম্ল, লবণ ও মধুর এই শীতল রসত্রয়কে বলবান্ করতঃ মনুষ্যদিগের বলাধান করে।

দুই অয়নের মধ্যে হেমন্ত ঋতু অতি উত্তম সময়। একালে মনুষ্যের রোমকূপ শৈত্য সংস্পর্শে সঙ্কুচিত থাকে। দৈহিক তাপ এই কারণে সরল ভাবে তদ্দ্বারা নির্গত হইতে না পারিয়া জঠরানলের সহিত মিলিত হওয়ায় অগ্নির দীপ্তি হয়। সুতরাং মনুষ্য প্রচুর ভোজ্য আহার করিয়াও কোনরূপ অসুখ অনুভব করে না। এই কালে মধুর, অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট দ্রব্য বাহুল্যরূপে ভোজন, এবং শীত নিবারণ জন্য উষ্ণজল, উষ্ণগৃহ, মোজা, শাল, রুমাল, ফ্লানেল, বনাত বা অন্যবিধ স্থূল ও উষ্ণবস্ত্রাদি ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে অবহেলা করিলে শরীরে কফ প্রবৃদ্ধ হয়। এবং বসন্তকালে যখন্ সূর্য্যদেব অল্পে অল্পে উষ্ণ কিরণ বিস্তার করিয়া জগতের রস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই প্রবৃদ্ধ কফ সূর্য্যোত্তাপ নিবন্ধন দ্রবীভূত হইয়া পাচকাগ্নিকে হতবল করতঃ বিবিধ রোগোৎপাদন করে।

শিশির কালে হেমন্ত কাল অপেক্ষা শীত অধিক হয়। অতএব এই কালে হেমন্ত কালোচিত বিধি সকল বিশেষ রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাতে শ্লেষ্মা প্রকুপিত না হয়, এমত আচরণ করিতে কদাচ তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, অম্ল ও মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য ও দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

বসন্ত কালে বমন, বিরেচন, তীক্ষ্ণ নস্য গ্রহণ, রুক্ষ ও লঘু দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি কফ নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিবে। গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল,

মধুর, অম্ল ও মিষ্টরস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই কালে অতি সামান্য কারণেই শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া অগ্নিমান্দ্য করে ও তজ্জন্য নানা প্রকার রোগ সমুপস্থিত হয়। অতএব এই কালে লবণ, অম্ল, কটুরস, উষ্ণদ্রব্য এবং পরিশ্রম, স্ত্রীসংসর্গ ও সূর্য্য কিরণ পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর ও লঘু দ্রব্য ভোজন এবং সুশীতল জলে স্নান করা উচিত।

বর্ষা কাল অতি কদর্য্য সময়। এই কালে নিরন্তর বারিবর্ষণ জন্য ভূমি কর্দ্দমময় ও আর্দ্র হয়। আকাশ সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকে, এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হওয়ায় জল অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। সেই অপরিষ্কৃত জল পান ও শীতল বায়ু সেবনাদি কারণে মনুষ্যদিগের কোষ্ঠাগ্নি স্তম্ভিত হওয়ায়, ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। তজ্জন্য তাহাদের দেহে পিত্ত সঞ্চিত হয়। এই সময় অগ্নির উদ্দীপক, কোষ্ঠপরিষ্কারক, স্বাদুরসযুক্ত ভোজ্য পানীয় সেবন, অনার্দ্র স্থানে বাস, পরিষ্কৃত বস্ত্রধারণ ও জল উষ্ণ করিয়া শীতল করতঃ পান করা উচিত। দিবানিদ্রা, হিম, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবা, স্ত্রীসহবাস ও নদীর জল পরিত্যাজ্য।

শরৎ কালে তিক্ত, লঘুপাক, মিষ্টরস ও পিত্তনাশক দ্রব্য ভোজন করা উচিত। মৎস্য, মাংস, হিম, ক্ষার দ্রব্য, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। এই কালে বর্ষাঋতুতে মনুষ্যের শরীরে যে পিত্ত সঞ্চিত হয়, তাহা সূর্য্যের উত্তাপে প্রকুপিত হইয়া উঠে। এবং তজ্জন্য বিবিধ পিত্তজ ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

এই সামান্য কতিপয় নিয়ম পালন করিলেই যে এককালে আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়জয় লাভ করা যায়, ইহা কেহ মনে করিবেন না। দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে, নগর রক্ষা বিষয়ে রাজা যেরূপ যত্ন করেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাদৃশ যত্নশীল হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেশ, কাল ও আত্মগুণের অবিরুদ্ধে ব্যবহার দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যের সহিত সর্ব্বদা সদ্‌বৃত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। জীবহিংসা, চুরি, নিষ্ঠুরতা, পরস্ত্রীহরণাভিলাষ, ঠকামি, কর্কশবাক্য, মিথ্যাকথা, নির্লজ্জতা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীকাতরতা প্রভৃতি যত প্রকার পাপ কার্য্য আছে, সমস্ত পরিত্যাগ করা উচিত।

স্থূল কথা এই, অনুকূল কাল, স্বধর্ম্মানুষ্ঠিত ক্রিয়া, স্বাস্থ্যানুবন্ধি কর্ম্ম, নির্ম্মল বুদ্ধি, বিহিত মন, এই সকল গুলি স্বাস্থ্যের কারণ। এই সকল ব্যতীত মনুষ্যের সদা সুস্থ থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ

তটিনী।

রাগিণী মিঞার মল্লার——তাল ব্রহ্মতাল।

(স্থায়ী)

কল কল কল নাদে চলেছে তটিনী
হের ওই সাগরের কূলে।
মরি, কি শোকের ভরে আছাড়ি পিছাড়ি
ধায়, আহা! কাঁদে ফুলে ফুলে।

(অন্তরা)

শৃঙ্খল পরেছ বুকে তাই কি মনের দুখে
জানাতে চলেছ সবে হৃদয়-বেদন?
ভারতে ভারতী নাই—কোথা গেলে দেখা পাই—
তাই বা 'কোথা মা' ব'লে কাঁদ ঘন ঘন!
তটিনি লো খুলে প্রাণ গা' তবে শোকের গান
গা' তবে যদিন র'বি বীচিরব তুলে।

বাঙ্গালার কবি ও কাব্য।

—o-o-o-o—

প্রস্ফুটিতোন্মুখ পদ্মের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যজগতের মুখ-শ্রী দিন দিন সুন্দর কান্তি ধারণ করিতেছে, দিন দিন অতি ধীরে ধীরে তাহার সেই কমনীয় ভুবনভুলান লাবণ্য-জ্যোতিতে জগৎ হইতে জগদান্তর পর্য্যন্ত আলোকিত হইতেছে। বঙ্গসাহিত্য জগতের যে আকাশ এই বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে গুটিকতক মাত্র নক্ষত্রে অল্পই আলোকিত ছিল, যাহা নিজ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণে বঙ্গের পরিখার পরবর্ত্তী ভূভাগ আলো করিতে অক্ষম হইয়াছিল, সেই আকাশ আজি আলোকে পরিপূর্ণ। আজি মধ্যাহ্ন প্রখরসূর্য্যের ন্যায় সেই আলোকে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে, আজি সেই আলোকে জড় জগতের ভাব যেন কবিদিগের কল্পনাস্রোতে অতি ধীরে ধীরে চুপে চুপে গা ঢালিয়া দিতেছে। প্রাচীন কবিরা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষে সেই বৃক্ষে সুফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বতন কবিরা যে সকল ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিতেন, আধুনিক কবিদিগের মনে সে ভাব স্থান পায় না, এখন সে ভাব অশ্লীল বলিয়া অপাঠ্য হইয়াছে। পূর্ব্বতন কবিদিগের মন যেমন সামান্য পরিখায় পরিবেষ্টিত ছিল, তাঁহাদের কল্পনাও সেইরূপ ক্ষুদ্র পরিখার মধ্যস্থ গুটিকতক বর্ণিত বিষয় লইয়াই প্রাণ ভরিয়া রাখিত, তাঁহাদের কল্পনায় টান নাই, প্রাণ ভরপুর হইয়া যায় না, তাঁহাদের কাব্যে তটিনী ছুটে না, প্রাণ কাঁদে না, চাঁদিমা ফুটে না। তাঁহাদের কল্পনা অতি ক্ষীণ কলেবরে অল্প পরিসর ভূমিমধ্যে একটি দুটি তরঙ্গ তুলিয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিত। সে তরঙ্গে কবিতার লীলাময়ী মাধুর্য্যপরিপূর্ণ ভাব নাই; তাহাদের কাব্যে কেবল উষার অন্ধকার। পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে বাল্মীকি বা তৎপরবর্ত্তী কবিদিগের কথা বলিতেছি। দাশুরথি রায় হইতে মহাত্মা

ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত এই ভাবের কবি, সুতরাং এ প্রবন্ধে আমরা তাহাদের বা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের কোন উল্লেখ করিব না; কবিবর মাইকেল মধুসূদন হইতে আধুনিক কবিদিগের সমালোচনাই এ প্রবন্ধের [illegible] উদ্দেশ্য।

অধুনাতন বঙ্গীয় কবিদিগের সমালোচনার পূর্ব্বে কবিতা কি সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলা উচিত। যাহাতে মনের জলন্ত চিত্রখানি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে, যাহাতে মানব চরিত্রের, জগতের যে কোন বস্তুর হউক না কেন যথার্থ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যাহাতে কল্পনার বৈদ্যুতিক ক্রীড়া প্রতি ছত্রে প্রতি অক্ষরে পবিদৃষ্ট হয়, ভাব যাহার শরীর, বর্ণনা যাহার রং, তেজস্বিতা, কমনীয়তা ইত্যাদি যাহার গুণ, যাহা পাঠ করিলে মন সেই বর্ণিত ভাবের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতে থাকে, প্রাণ দরাজ হইয়া যায়, সুখের তরঙ্গাঘাতে প্রাণের অবরুদ্ধ দ্বারগুলি একবারে উন্মুক্ত হইয়া কবিতাময়ী স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, যাহা পাঠ করিলেই মনে হয় যেন আমার চক্ষের উপর কে যেন সেই সকল বর্ণিত বিষয় গুলি বাছিয়া২ অতি ধীরে ধীরে আমার নয়নপথে Phantasmagoria বা ছায়াবাজীর মতন একটির পর আর একটি আনিয়া আমায় অভিনয় দেখাইতেছে, যাহা মনে পড়িলে প্রাণে একটা আজন্ম দাগ থাকে—সে দাগ যেন অতি নরম সূক্ষ্ম তুলিতে শিরার রক্ত দিয়া শিরার ভিতরে ভিতরে কে যেন অতি ধীরে ধীরে লিখিয়া চলিয়া গেল, যাহাতে মনকে জড় করিয়া তোলে, যাহাতে শব্দবিন্যাসের কোমলতা—খাদ নিখাদ আছে, যাহাতে "কবিতা কোমল বনিতার" সার্থকতা সম্পাদন করা হইয়াছে তাহাই কবিতা। কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্‌টন, শেলি ইত্যাদি কবির এত প্রসংশা কেন? তাঁহাদের প্রতিই বা জগৎ এত পক্ষপাতী কেন? আর ভট্টি কাব্যকেই লোকে কেন জড় শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।* ভট্টিকাব্য প্রণেতা শব্দ বিন্যাসের চাতুরী দেখান নাই।

* আমরা ভট্টিকাব্যকে জড় শুষ্ককাষ্ঠবৎ বলি না, তাহার অন্যগুণের কথা কি বলিব? তাহাতে যে কবিত্ব শক্তি আছে দ্বিতীয় সর্গ পড়িলেই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সম্পাদক।

অত্যন্ত শ্রুতি কঠোর কবিতা পড়িতে গলা ফাটিয়া যায়; ভাট্টকাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ, তাহাতে "নীরস তরুরুহ পুরতো ভাতি"—রকম ললিত প্রাণখোলা কবিত্ব নাই। ঐ রকম সকল কাব্যে যেন কবিতার গৃহদ্বার রুদ্ধ—চারিদিক্ রুদ্ধ, ঐরূপ কাব্যগৃহে থাকিলে প্রাণটা ছট্ ফট্ করে।

সঙ্গীতের যেমন বাদী ও বিসম্বাদী শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন কথাটি কোন খানে বসাইলে ভাষে হানি হয় না অথচ অভীষ্ট সুর লয়ে পায় তাহা দেখা আবশ্যক। সঙ্গীতের যেমন কোন সুর কোন খানে বসাইলে ভাবের অন্তঃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়া, কানে কোনটি ভাল লাগে দেখা উচিত; কবিতার ও কোমল বর্ণনার সময় কোমল সুরের কথা গুলি যত্নে বিন্যাস করা উচিত, তেমনি কঠোর বর্ণনার সময় কঠোর শব্দগুলি সাজান উচিত—নতুবা কবিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। যে সকল কবিরা ভাবের শ্রাদ্ধ করিয়া, শব্দ বিন্যাসের চাতুরীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল ছন্দের প্রতি লক্ষ্য করেন তাহারা সেই "কোমল বনিতার" গলাটি টিপিয়া ভীষণ মুখ শ্রী নির্গত করান মাত্র। ছন্দহীন কবিতাকে কবিতা বলা যায় কিন্তু ভাবহীন শ্রুতি কঠোর কবিতাকে কবিতা বলা যায় না। কবিতা প্রাণে লাগে ছন্দ কানে লাগে। ছন্দ সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য বটে কিন্তু তাহার ভিতর একটু তারতম্য চাই। ভাব ও শব্দ চাতুর্য্য মুখ্য, ছন্দ গৌণ।

ছন্দ ভিন্নও কবিতা হয়; যাহারা ছন্দের অনুরোধে কবিতার বিমল ভাব গলাটি টিপিয়া রাখেন, ভাবকে স্বাধীনতা দেন না তাহাদের কবিতা কবিতাই নয় অক্ষর যোজনা মাত্র। সে কবিতার শরীর নাই, অবয়ব নাই, প্রাণ নাই। এক রকম কবিতা আছে তাহাদের শরীর আছে, দেহের সমুদয় বস্তুই দৃষ্ট হয় কেবল প্রাণ নাই। সেই সকল নিস্তেজ কবিতা প্রাণে লাগে না, মন ভরপুর হয় না, কি যেন অপূর্ণ রহিল, কি যেন পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, দিশে হারা হইয়াছি বলিয়া খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি যেন মনে হইতেছে জানি, অথচ মনে আসিতেছে না এরূপ বোধ হয়। সে সকল কবিতা পড়িয়া প্রাণের সূক্ষ্ম চর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাহা পড়িতে ভাল লাগে না সে কবিতায় মনের তৃপ্তি হয় না, সে অতৃপ্তি কেবল একটি বস্তুর অভাবের অতৃপ্তি।

এ জগৎ কবিতার জন্মভূমি। কবিতায় দুটি সারাংশ—ভাব ও বর্ণনা। এমনি পৃথক্ ভাবে অথচ এমন সংমিলিত আছে যে একটিকে পৃথক করিয়া অপরটিকে লইতে গেলে তাহা কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা যেন কাজে লাগে না বলিয়া বোধ হয়। বহির্জগৎ বা জড়জগৎ হইতে অন্তর্জগৎ যেমন পৃথক্; ভাব ও বর্ণনা ও সেই রূপ। জড়জগতে কেবল ভাবের সমষ্টি দেখিতে পাইবে, সেই ভাব গুলি কেমন একত্র সংমিলিত রহিয়াছে, কেমন পূর্ণ মাত্রায় খেলা করিতেছে, কেমন উদাস ভাবে ক্রীড়া করিতেছে; আর অন্তর্জগতে কেমন সশরীরী কল্পনা কেমন প্রাণের ভিতর নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ঐ দুটির সমবেশে সচেতন সশরীরী কবিতার জন্ম হয়; একটি ছাড়িয়া আর একটি লইলেই অসম্পূর্ণ হইল। আমাদের দেশের কথা বলি, কতকগুলি কবি আছেন তাঁহারা কেবল জড় জগতের বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেন না; তাঁহাদের মন এত ক্ষুদ্র যে জড়জগতের ছায়াতেই তাঁহাদের মনের সকল স্থানই দখল করিয়া ফেলে, অন্তর্জগতের নাম ও তাঁহারা মনে স্থান দিতে পারেন কি না সন্দেহ। তাহাদের চক্ষু একদিকের শোভাতেই ভিজিয়া গিয়াছে, প্রাণকে উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছে, আর অন্য স্থানে যাইতে দেয় না। সেরূপ কবির অসদ্ভাব আমাদের দেশে নাই।

"দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমাখানি
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
দেখিয়াছ কহ তবে, কেন ভাল বাসি?"

বাঙ্গালীর স্থূল ত্বক্ হইতে ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মার্জ্জিত কুন্তল চাই, আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘকেশ রাশি চাই তবে প্রেমের উদ্রেক হইবে। একটি সশরীরী কল্পনার উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটি গীত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

"জাগিল ঊষা। গেল আঁধার ধীরে ধীরে ধীরে
কিরণ ছটা বিকাশিল।
কনক দ্বার উঘাটিয়া তরুণ ভানু প্রকাশিল,
কিরণে কিরণে দিক্ দিগন্ত প্লাবিল।

প্রাতঃকালের বর্ণনা করিতে গিয়া কোন কবি বলিয়াছেন প্রথমতঃ উষাজাগ্রত হইল। উষা বলাতেই যেন একটু ঘোর ঘোর রহিয়া গেল, সেই জন্য আবার বলিলেন আঁধার অতি ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে, ইহাতেও তাহার ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইল না বলিয়া তিনি বলিলেন—"কিরণ ছটা বিকাশিল।" বাল সূর্য্য কিরণ বিকশিত হইল বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন না, তরুণ ভানু কনক দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিক্ দিগন্ত প্লাবিত করিয়া দিল। এমন সশরীরী ন[illegible] কবিতা না হইলে আমাদের স্থূল চর্ম্মে লাগে না।

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এ কথার গূঢ় [illegible] আজি সকলের সমীপে উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কবিতার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী নির্ম্মল কিরণগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে কি না সে কথার বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ তাহার বিচার করুন। আধুনিক কবিরা ভাবিতে শিখিয়াছেন, বিজাতীয় ভাব সকল বিশেষরূপে আয়ত্ব করিয়া হজম করিতেছেন; কাব্য-জগতের এই একটি বড় শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। যতদিন না কোন একটি ভাবকে আমরা হজম করিতে পারিব, আমাদের শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিব, যত দিন না আমরা সেই বর্ণিত বস্তু সকলকে ঘরে আনিতে শিখিব, আপনার মধ্যে রাখিতে শিখিব, ততদিন আমাদের কবিতার পূর্ণ বিকাশ হইবে না। উষার ন্যায় ফোট ফোট আলো আমাদের কবিতা হইতে নির্গত হইতে থাকিবে। যখন প্রকৃত কবিতার স্রোত প্রশান্ত ভাবে আমাদের প্রতি শিরার ভিতর দিয়া বহিতে থাকিবে তখন জানিব আমাদের দেশের কাব্য-জগতের মঙ্গল বা উন্নতি হইয়াছে। অনেকে বলেন "প্রকৃত স্রোত প্রশান্ত ভাবে বহে না"। তাহাতে হানি নাই; আমরা সকল স্রোত প্রশান্ত ভাবে কবি-হৃদয়ে বহমান দেখিতে চাই না; প্রশান্ত না হউক প্রস্ফুটিতোন্মুখের কিছু উপর হইলেই আমাদের যথেষ্ট!

(ক্রমশঃ)

টাকা যায় কোথায় ?

ভাল বল দেখি, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর কি? ইহার উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলিবেন বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার ভিক্টোরিয়া এম্প্রেস লেখা ভারতেশ্বরীর মুখ আঁকা রজতখণ্ডের সুমধুর শব্দ সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে। ইহার জন্মস্থান টেঁকশালে, থাকে সিন্ধুক বাক্সে, লোকের হাতে হাতে বেড়ায় বলিয়া ইহার নাম সার্কিউলেটিংমিডিয়ম; এবং এই জন্যই বুঝি, চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর এত অপবাদ! এই ছিল তোমার হাতে, এই এল আমার কাছে, আবার ঐ গেল তাহার সিন্ধুকের ভিতর। কিন্তু, এইরূপে শেষ যায় কোথায়? যায় কোথায় শুনিবে? যায় ইংলণ্ডে। বিশ্বাস না হয়, দেখ। দেখিতে পাইলে কে শুনিতে চায়?

সাধারণতঃ জমিদারগণই দেশের অর্থবান্ লোক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারই ইন্‌সলভেণ্ট। শূন্য উপাধি লাভাশয়ে কত C.S.I., C.I.E, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন বলা যায় না। একটা বল্ বা একটা ভোজে অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। আবার শুদ্ধ তাহাই নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মামলাবাজ, গৃহ-বিবাদে সর্ব্বদা ব্যস্ত। কাজেই অবশিষ্ট যা কিছু থাকে, ক্রমে ক্রমে কোর্টে গিয়া জমা হয়। কোর্টের হাকিমেরা অধিকাংশ ইংরাজ। সুতরাং টাকা তাহাদের সহিত চলিয়া যায়; যায় কোথায়? যায়—ইংলণ্ডে।

তার পর ব্যবসায়ীগণ। কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—একথা আর খাটে না। বাণিজ্যের বন্ধনে সচলা লক্ষ্মীকে আর অচলা করিয়া রাখা যায় না। একে ত যে সকল ব্যবসায়ে স্থায়ী লাভ তাহা গভর্ণমেণ্টের হস্তগত, তাহাতে আবার ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ীদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া কার্য্য চালাইতে হয়। অথচ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয়

ব্যবসায়ীদিগের পক্ষপাতী। বলিতে কি, সে দিন গভর্ণমেণ্ট মেঞ্চেষ্টারের প্ররোচনায় দেশীয় ব্যবসায়ী দিগের সর্ব্বনাশ করিয়া অম্লানবদনে তুলাকর উঠাইয়া দিলেন। তদ্ব্যতীত তাহাদের লাভের গুড় পিপিড়ায় খায়। গভর্ণণ্টের টীকা টিপ্পনির আশ মিটাইতেই প্রাণান্ত! ইহাতেও নিস্তার নাই। ইহার উপর আবার লাইসেন্স ট্যাক্স! হারাণে মুদী আদহাঁড়ি মসুর ডা'ল, দেড় জালা বুকড়ি চা'ল ও তদুপযুক্ত তৈল লবণ লইয়া দোকান করে—Assessor বাবু তাহার ১০ টাকা টেক্স ধার্য্য করিয়া গেলেন। সে টাকার ভোগী কে?—ইংরাজ। সুতরাং তাহার কষ্টের অর্থ যাইবে কোথায়? যায়—ইংলণ্ডে।

আমাদের দেশের ডাক্তার ও উকিল সম্প্রদায়েরাই অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ব্যারিষ্টার সাহেবদের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা ত ইংরাজচরণে বিক্রীত। তাঁহারা উঠিতে বসিতে ইংরাজ, খাইতে পরিতে ইংরাজ, তাঁহাদের যা কিছু সকলি ইংরাজের। ডাক্তার বাবুরাও ঐ ছাঁচে গড়া। সে Ether, Acid, Powder, Spirit প্রভৃতি সে সকলের জন্য বলিতেছি না; কিন্তু নাড়ি ধরিয়া রোগ পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। সেজন্যও থার্মমিটারের (Thermometer) আশ্রয় প্রয়োজন! আর উকীল বাবু দেশী বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরিধানে আলপাকার চোগা চাপকান, চরণে ওয়াটসের বাড়ীর জুতা, বুকে হেমিল্টনের ঘড়িচেন; পান এক্সা ব্রাণ্ডি আর আহার উইল্সনের বাড়ীর খানা। এততেও কি আর টাকা থাকে? দেখিতে দেখিতে এই সকল বিলাতি দোকানদারের হাত দিয়া তাহাদের টাকা চলিয়া যায়। যায় কোথায়? যায়—ইংলণ্ডে।

ইহাদের পর কেরাণীর দল। তাহাদের দুঃখ দেখিলে চক্ষে জল আসে। যেখানেই ভারতবর্ষের স্বার্থ ইংলণ্ডের লাভের বিসম্বাদী হয়, সেই খানেই গভর্ণমেণ্ট দুঃখের মুখ না তাকাইয়া ইংলণ্ডের ভাল চেষ্টা পান। তাঁহাদের ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন ও তাঁহাদের সেই কার্য্যে বাধা দিতে পারে না। পাছে এখানে মেনুফ্যাক্চরির উন্নতি হয় এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট লাভ করিবার ভাণ করিয়া ফেক্টরিবিল প্রস্তুত করিলেন। এখানকার কলে উপযুক্ত খাটুনিও

উঠিয়া গেল। অথচ অন্যান্যদিন উদয়াস্ত খাটিবার পরেও দুর্দ্দশাপন্ন কেরাণীরা ধার্ম্মিকপ্রবর রিপন বাহাদুরের শাসনাধীনে থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্মের অননুমোদিত রবিবারে পর্য্যন্ত খাটিয়া মরে। ধর্ম্ম জানেন ধর্ম্মের মহিমা! কিন্তু এত খাটিয়াও কি তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়? যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের কথা আর বলিব কি? কিন্তু তবুও বিলাতি সভ্যতার দৌরাত্ম্য কম নয়! ক্ষুদ্রপ্রাণ কেরাণীরা পেটে না খাইয়াও যে দুই একটি পয়সা বাঁচাইয়া রাখে, সভ্যতার নিঃশ্বাস লাগিয়া দুই দিনে কোথায় উড়িয়া যায়। বিলাতে Pinmoney আছে, সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এখনও তাহা লব্ধ-প্রবেশ হয় নাই, কিন্তু এক Woolmoney অনেক পরিবারকে ছারখার করিল। এ গেল সামান্য কেরাণী-দিগের কথা, তবে যাহারা উচ্চদরের তাঁহাদের কিছু টাকা থাকে বটে। কিন্তু তাহা থাকে কিসে?—কোম্পানির কাগজে। গভর্ণমেণ্ট গালে চড় মারিয়া একখানি চোতা কাগজ দিয়া সকল টাকা গুলিন কাড়িয়া লন। বলিতে হইবে না, সে সকল টাকা যাইতেছে কোথায়। তাহা যায়—ইংলণ্ডে।

ইহার পর কৃষক সম্প্রদায়। তাহাদের দুর্দ্দশা শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়, সে কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। বৎসর বৎসর কত দীন প্রজা যে হাল গরু বিক্রী করিয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছে তাহা আর বলিব কি? বলিবে, সে জমিদারদিগের দোষ; কিন্তু জমিদারেরা তো গভর্ণমেণ্টের কেনা! হতভাগ্যগণ যে নুন দিয়া দুবেলা দুমুটো খাইবে তাহারও যো নাই। ইহার উপরও ট্যাক্স। লবণকর দ্বারা যে কতলোকের রক্তশোষিত হইতেছে, তাহা যাঁহারা শোষক তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন! ইহার উপর আবার আরো একটি বিষফোড়া আছে। তাহা মদের ভাটী। পথের কাঙ্গাল যাহারা তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, তবে যাহারা পাট প্রভৃতি বুনিয়া দুই এক পয়সা করিতে পারে তাহা মদের ভাটীতেই সকলি নিঃশেষিত হয়। দিনের বেলা রৌদ্রবৃষ্টিতে অবিরাম পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে একবার গ্রামের প্রান্তঃস্থিত ভাটীতে গমন করিয়া কষ্টের শান্তি ও মনের সুস্থতা সম্পাদন করে। আবকারি ডিপার্টমেণ্টের জয় হউক। বিলাত হইতে মদ আনিয়া সহরের মোড়ে মোড়ে মদের দোকান খুলিয়া দিয়াও

আশ মিটিল না, গ্রামে ২ মদের ভাটি সৃষ্টি হইল। লাভের পথ প্রশস্ত হইল। রাজ কর্ম্মচারীগণ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। সুতরাং যার বুদ্ধি তার কড়ি। টাকা থাকিল না, বুদ্ধি কৌশলে চলিয়া গেল। গেল কোথায়?—ইংলণ্ডে।

এই রূপে ভারতের রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত, বৃদ্ধ হইতে বালক পর্য্যন্ত সকলের টাকা কোন না কোন মতে ইংলণ্ডে যাইয়া জমিতেছে। পূর্ব্বে যবনেরা ভারতের রাজা ছিল, তাহারাও অনেক প্রকারে অনেক টাকা লুঠিত বটে; কিন্তু ভারতের টাকা ভারতেই থাকিত, তাহা ইহার বাহিরে যাইত না। ইংরাজেরা দূরবাসী, বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্যই তাঁহাদিগের উন্নতির সাধন। এই বাণিজ্যের ফাঁদে ফেলিয়া প্রবল প্রতাপ গভর্ণমেণ্ট হইতে সামান্য একটি মেরির পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই ভারতের টাকা ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছে। এক Pin বেচিয়া ইংলণ্ড বৎসরে ভারত হইতে লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছে, অথচ এ Pin ভারতের কয়জনের প্রয়োজনে আসে? যাউক, ব্যবসায়ীদিগের কথা ছাড়িয়া দাও। ইংলণ্ডের কোন্ সম্প্রদায় ভারতের অর্থে পুষ্ট নন? রাজপ্রতিনিধি, প্রেসিডেন্সি সমূহের শাসন কর্ত্তা, কমিশনরগণ তাঁহাদিগের সচিব সমূহ, জজ, কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট, আর ও শতসহস্র কর্ম্মচারী—কে বলিবেন, তিনি ভারতের অন্নে প্রতিপালিত বা পরিপোষিত নন? ডাক্তার বল, উকীল বল, বিদ্যাধ্যক্ষগণ বল, মিশনরী সম্প্রদায় বল, কে বলিবেন তিনি ভারতের নূন খান নাই? ইংলণ্ডে থাকিলে যাহাদের অন্ন জুটিত না, ভারতে আসিয়া আজ তাহারা রাজরাজেশ্বর! বলিতে হাসি পায়—তবুও নাকি ভারত ইংলণ্ডের গলগ্রহ! ধন্য ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতায়! এক সৈন্য সম্প্রদায়ে ভারতের কত ব্যয় পড়ে! পৃথিবীতে এমন কোনও যুদ্ধপ্রিয় বা সমরকুশল জাতি নাই যাহার প্রত্যেক সৈন্যের জন্য এখানকার প্রতি সৈনের উপর যত ব্যয় পড়ে তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় করে। কিন্তু ভারত এই ব্যয় কি তাহার নিজের সৈন্যদিগের জন্য করে? সে কথায় কাজ কি? হতভাগ্য দেশীয় সৈন্যগণ পৌষের দারুণ শীতে একখানি কম্বল বড়জোর একটা পস্তিন্ ভিন্ন পায় না, আর ইংরাজ সৈন্য?—যা কিছু সকলি তাহার প্রাপ্য!

ইহা তো গেল, ভারতে বসিয়া ভারতের টাকা রোজগার। ইহাতে ও তাঁহাদের আশ মিটেনা। তাঁহারা—"খেয়ে যান নিয়ে যান আর যান চেয়ে।" চেয়ে যান—পেন্‌সন। তা ছাড়া আবার গ্রাটুইটি আছে। লিটন —তাঁহার গুণের কথা কহিয়া কাজ নাই—তিনি ইংলণ্ডে গিয়া হইলেন ডিউক; ষ্ট্রাচি যিনি ভারতের রাজস্ব আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হইয়া শত শত অনিষ্ট ঘটাইলেন, বিলাতে বসিয়া তিনি হাজার হাজার টাকা পুরস্কার পাইলেন; রবার্টস্—আফগান যুদ্ধ এখনও যাঁহার কাপুরুষতার পরিচয় দিতেছে—সেখানে গিয়া সহস্র মুদ্রার সহিত সার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এ সকল অর্থ আসিল কোথা হইতে ? ভারতবর্ষের কোষ হইতে। কেন ? লর্ড বিকন্সফিল্ড—তিনি এখন ইহসংসার হইতে অবসর লইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না—তিনি সৈন্য পাঠাইলেন মাল্‌টায়, তাঁহার আদেশে সৈন্য গেল নেটালে; কিন্তু সে ব্যয় বহন করিল কে ? ভারতবর্ষ। কেন ? কেন,—ইহার উত্তর নাই। Knight সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন——

"The whole record of the connection (between England and India) is marked by unrighteous appropriations of her revenues to ease the taxpayers of this country (England).

আমাদের আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠকবর্গ যেন স্মরণ থাকে, ইহার উপর Home charges আছে!

অবশেষে আমরা মান্যবর সোর সাহেবের একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

"The fundamental principle of the English had been to make the whole Indian nation subservient, in every possible way, to the interest and benefits of themselves."—

ইহার পরও আমাদের বলিবার আর কি আছে ? ইহার পরও আমাদিগকে আরো কি বলিতে হইবে—ভারতের টাকা যায় কোথায় ? টাকা যায় কোথায় ? এ প্রশ্নের একই মীমাংসা, একই উত্তর। যায় ইংলণ্ডে !!

সুহাসিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবালয়ে।

"গিরিশ মুপচচার প্রত্যহংসা সুকেশী।"

কুমার সম্ভবম্।

আজ আকাশে অনেক রাত্রে চাঁদ উঠিল। চন্দ্রের আলো যাইয়া দিনাজপুরস্থ উচ্চ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পড়িল। সেই চন্দ্রালোকে সেই সুধাধবলিত দেবমন্দির ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনন্ত সৌধমালা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া আকাশে চিত্রপটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনী গম্ভীর, দেবালয় শান্তিপূর্ণ। অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া সে দেবালয়—সমস্তই শান্তিপূর্ণ। কোথাও শব্দমাত্র নাই। কেবল দূরাগত করতোয়ার কলকল শব্দ, কেবল দুই একটি নিশাচরের শব্দ, কেবল বৃক্ষগণের বায়ুবশে সরসর শব্দ; আর সম্মুখেই যে প্রশস্ত নাট্যমন্দির—তাহার মধ্যে বহুদূরাগত যে সকল যাত্রী হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কাহারো তিনদিন কাহারো বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা নাই—একমনে একধ্যানে আপনার ইষ্টের জন্য শরীর ঢালিয়া দিয়াছে—কেবল রহিয়া রহিয়া সেই সকল উপাসকদিগের "বাবা! বিশ্বেশ্বর! দয়াময়!" ইত্যাদি অন্তর্ভেদী করুণ শব্দ চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশগুণ বৃদ্ধি সহকারে বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে নিস্তব্ধ নৈশ আকাশ বিদারিত করিতেছে। ইহা ভিন্ন অন্য শব্দ নাই। নীরব, নিঃস্তব্ধ, শান্ত।

সেই সকল যাত্রীদিগের মধ্যে একটি বালিকা আজ এক সপ্তাহকাল অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে,

মাত্র এক একবার শিয়রে যে বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত রাখিয়াছিল তাহাই পান করিতেছে। সপ্তাহ অতীত হইল, আজও স্বপ্ন হইল না, আজও বিশ্বেশ্বর দয়া করিলেন না—অনবরতঃ অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া বালিকা উঠিল। সামর্থ্য নাই, শরীর অস্থিসার হইয়াছে—বলিতে পারিল না, আবার শুইয়া পড়িল। দুই হরের ঘণ্টা বাজিল। আর শয়ন হইল না। বালিকা আবার ধীরে ধীরে উঠিল। সম্মুখেই প্রকাণ্ড সরোবর মন্দিরের পাদদেশ প্রক্ষালন করিতেছে, বালিকা যাইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে স্নান করিল। অঞ্জলিপূর্ণ বিল্বপত্র লইয়া ধীরে ধীরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল।

মন্দিরে রত্ন প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই রত্নপ্রদীপের ভাস্বর আলোককে তিরস্কার করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পিণাকপাণি বিশ্বেশ্বর স্বয়ং পবিত্র জ্যোতিঃ বিকাশিত করিতেছেন। স্থানে স্থানে স্তবকে স্তবকে পুষ্পহার সজ্জিত রহিয়াছে, স্থানে স্থানে পুঞ্জে পুঞ্জে বিল্বপত্র রাশীকৃত রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপে স্তূপে ধূপ ধূনা জ্বলিতেছে। তাহা হইতে যে সৌগন্ধ আসিতেছিল তাহা অপার্থিব, তাহা স্বর্গীয় সামগ্রী। কে বলিল, গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজার কোন অর্থ নাই? এমন মাদকতা জন্মাইয়া দেয় কে? এমন বিভোর করিয়া দিয়া উল্লাসভরে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দেয় কে? ধর্ম্ম অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক উপকরণ—বুঝি, হিন্দুধর্ম্মই যথার্থ সার সনাতন ধর্ম্ম। বুঝি, হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন উৎকৃষ্ট অন্য ধর্ম্ম নাই।

এত যে দুর্ব্বলতা, এত যে কষ্ট মন্দিরমধ্যে আসিবামাত্র সকলি ঘুচিল। বালিকা প্রীতিপ্রফুল্লমনে সেই আর্দ্রবস্ত্রেই পূজায় বসিল। প্রায় একপ্রহর কাল পূজা করিতে লাগিল। মুদিতনয়নে নিস্পন্দশরীরে যোগাসনে বসিয়া বালিকা পূজা করিতে লাগিল। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা, বদনমণ্ডলে একে একে সেই পবিত্র ভাবগুলি অঙ্কিত হইতে লাগিল। পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা ভগিনী সংসারে বালিকার কেহ নাই। একমাত্র স্বামী। স্বামী ভিন্ন সে আর কাহাকেও জানে না, স্বামীর মঙ্গলেই মঙ্গল, স্বামীর সুখেই সুখ—সেই স্বামীর মঙ্গলের জন্য বালিকা এই বয়সে এই দারুণ

কষ্ট সহিতেছে। দেখিতে দেখিতে বালিকা সকল ভুলিয়া গেল। সে আকাশ, সে পৃথিবী, সে মন্দির বালিকা সব ভুলিয়া গেল। একমাত্র স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুর পর অশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা—সকল স্রোতঃ অপার অপরিমেয় অতলস্পর্শ। সে সকলের গতি এক পথে, আধার এক! একে একে সকল স্রোতঃ সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। স্থির হইয়া বালিকা করযোড়ে সেই স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। স্বামীর দুঃখেই দুঃখ, স্বামীর বিপদেই চিন্তা, স্বামীর জন্যই জীবন—সেই স্বামী আজ অনর্থক বিপদ ঘটাইতেছেন, অনর্থক আপনাকে দুঃখের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছেন। বালিকার নিজের জন্য কিসের চিন্তা? স্বামী যদি তাহাকে বধ করিয়া সুখী হন তাঁহাতে সে আনন্দিত ভিন্ন কাতর নয়। কিন্তু সে জানিত, তাহা হইবে না। তাঁহার স্বামী একার্য্যে দুঃখ ভিন্ন সুখ পাইবেন না। যে দিন বালিকা এ মন্দিরে প্রথম আসিয়াছিল, একবার স্বামীর ইষ্টসিদ্ধির ও সুখের জন্য বিশ্বেশ্বরের চরণে একটি বিল্বপত্র রাখিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, পত্র দিবার অব্যবহিত পরেই তাহা চরণ হইতে স্খলিত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে বালিকার ভয় বাড়িল। সেই দিন হইতেই আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া এক মনে স্বামীর মঙ্গল মানসে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিল। সেই স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে বালিকার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত যে ভক্তিভরে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহাতে বিস্ময় কি? সেই চন্দ্রধৌত গভীরা রজনীতে, সেই সৌগন্ধপূর্ণ স্ফাটিক দেবগৃহে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, বালিকা এক প্রহর কাল স্বামীর মঙ্গলার্থ বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করিল। উপাসনার পর বালিকা যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একবার বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান করিল, তখন তাহার হৃদয় অনেক সুস্থ, অনেক শান্ত।

বালিকা মন্দিরের বাহির হইল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতার উপর অধিক পরিশ্রম হওয়াতে সর্ব্বশরীরে বিন্দু২ ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল। বাহিরে সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছিল, বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘাটে আসিয়া বসিল। কে ডাকিল—"সুহাসিনী!"

বালিকা চাহিয়া দেখিল—বিনোদ। দৃষ্টিলোপ হইল, মস্তক ঘুরিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ঘূর্ণিত মস্তক তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল।

বিনোদের কথা সরিল না। আপন ভ্রম বুঝিল। বুঝিল, সে যাহার জন্য আসিয়াছিল এ সে সুহাসিনী নয়। বিনোদ চিনিল—গিরিবালা। পরিত্যক্তা, গৃহবহিষ্কৃতা, অসহায়া গিরিবালা!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্বামীচরণে।

Wretch that I am! Oh, whither shall I go?
Will you not hear me, nor regard my love?

Theoc.

ভাষায় তেমন কথা ছিল না যে, কেহ তাহা বলিয়া তখন আপনার মনের ভাব জানাইবে। গিরিবালা যে সুখভোগ করিতেছিল, তাহার নিকট কথার সুখ তখন অতি সামান্য, কথার প্রয়োজন তাহার ছিল না। কিন্তু, বিনোদের তাহা ছিল। চেষ্টা করিল, পারিল না।

কতক্ষণ পরে বিনোদ বলিল, "ছাড়িয়া দাও—গিরিবালা ছাড়িয়া দাও, আমি যাই।"

বালিকা কথা কহিল না। পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীর পদতলে মাথা লুকাইয়া নীরবে চক্ষের জলে সে চরণযুগল ধৌত করিতে লাগিল।

বিনোদ আবার নিঃস্তব্ধ হইল, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। একবার চারিদিকে দেখিল। দেখিল, সমস্ত নীরব। সম্মুখে নীল-নীরদ খণ্ডবৎ দেব-সরোবর নীরবে প্রশান্তভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, মাথার উপর নীল আকাশে শেষরাত্রের চন্দ্র নীরবে হাসিতেছে, সেই চন্দ্রের কোলে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র ও নীরবে উজ্জ্বলিতেছে, চারিদিকে লতাপুষ্পশোভিত

মান বর্ণের পাদপশ্রেণী চন্দ্রকরধৌত হইয়া নীরবে বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে, নীরবে সেই সরোবরের জল চন্দ্রকিরণের সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে করিতে বায়ুভরে উছলিয়া উছলিয়া চলিতেছে, পদতলে কুসুমময়ী বালিকা মাথা লুটাইয়া নীরবে রোদন করিতেছে। বিনোদ এ সকল দেখিল। দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার পাষাণ গলিল। তৎক্ষণাৎ আবার নানা চিন্তা হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ আবার নানা চিন্তা আসিয়া ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে সে ভাবটিকে সরাইয়া দিল। কতক্ষণ পরে বিনোদ আবার বলিল—"গিরিবালা, কাঁদিতেছ কেন?"

কাঁদিতেছ কেন?—একথার কি উত্তর দিবে? বালিকার চিত্ত তখনও ভালরূপ শান্ত হয় নাই। অনেক কষ্টে একবার মাথা তুলিল। শূন্যদৃষ্টে একবার বিনোদের প্রতি চাহিল। চক্ষুঃ জলে ভাসিতেছে, ফোটা ফোটা করিয়া সে জল গণ্ডঃস্থল বহিয়া ভাসিয়া যাইতেছে—দৃষ্টি কাতরতাপূর্ণ। তাহা দেখিলে পাষাণও ভিজে, কিন্তু বিনোদ ভিজিল না। বলিল—"কাঁদিও না, আপনার স্থানে যাও, আমাকেও যাইতে দাও।"

যাহার জন্য এত, যাহার জন্য জীবন মরণ তুচ্ছজ্ঞান—এত কষ্টেও তাহার নিকট এই সম্ভাষণ! ইহাতে দুঃখ হয় না কার? কিন্তু বালিকা সে জন্য বিশেষ দুঃখিতা হইল না। স্বামীর ব্যবহার জানিত, সে জন্য সে দুঃখিতা হইল না। কিন্তু কোথায় যাইবে? এ সংসারে আর তাহার আপনার স্থান কোথায়? তাহার জীবনের আশ্রয় একমাত্র স্বামীচরণ, স্থান একমাত্র সেই স্বামীচরণে। বালিকা আবার সেই বিনোদের পদতলে মাথা লুকাইল। আবার রোদন করিল, তাহার অশ্রুজলে বিনোদের পদতল প্লাবিত হইল। এ সংসারে অনেকে অনেক প্রকার সুখ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু স্বামীচরণে মস্তক রাখিয়া রোদনে যে সুখ গিরিবালার নিকট কোন সুখই তাহার তুল্য নহে।

বিনোদ আবার কথা কহিল। বলিল—"গিরিবালা, আমি তোমায় গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি—সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আর কাঁদিও না, পাষাণে জলসিঞ্চন করা বৃথা।"

গিরিবালা মাথা তুলিল না। অতিকষ্টে বলিল—"আপনি আমার দেবতা, আপনি না শুনিলে আর কাহার নিকটে রোদন করিব?"

"আমি তোমার দেবতা নহি। রোদন করিতে হয়, এই বিশ্বেশ্বরের নিকট রোদন করিও, তিনি তোমার দুঃখ শুনিবেন।"

"হতভাগী যে অন্য কাহাকে জানে না।———"

"ও কথা অনেক শুনিয়াছি, উহা ভুলিয়া যাও।"—বিনোদের স্বর স্থির, গম্ভীর, তীব্র। বালিকা ভয় পাইল। দারুণ কষ্টে মাথা তুলিয়া একবার বিনোদের প্রতি চাহিল। বলিল—"দাসী আর কি শ্রীচরণ দর্শন পাইবে না?"

পুনরপি কর্কশস্বরে বিনোদ বলিল—"এক কথা কেন পুনঃ পুনঃ বলিতেছ! জ্বালাতন করিও না। আমি চলিলাম।"

বিনোদ যাইবার উপক্রম করিল। গিরিবালা তাহা দেখিল। চক্ষুঃ জলে ভাসিয়া আসিল। বলিল—"একবার—একবার অপেক্ষা করুন, আর জ্বালাতন করিব না।—একটা কথা শুনুন।" যে স্বরে বালিকা এ কথা কয়টি বলিল তাহা কাতরতাপূর্ণ, তাহা অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া আসিল। সে স্বর যেই শুনিত সেই দ্রবীভূত হইত; বিনোদ ও কথঞ্চিৎ দ্রবীভূত হইল। বলিল—কি বলিবে, বল।"

তখন গিরিবালা স্থির হইয়া বসিল। চক্ষে আর জল নাই, তাহা হতাশে জ্বলিতেছিল। রুক্ষ কেশরাশি বায়ুবশে আশে পাশে দুলিতেছিল, বালিকা তাহার মধ্যে যতনে যে নির্ম্মাল্য পুষ্পটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিল। একবার মন্দিরপানে তাকাইল, মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে ডাকিল; সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামী বর্ত্তমান, একবার স্বামীর চরণযুগল ভাল করিয়া দেখিল। বদনের সে মলিনতা দূরে গেল, মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় প্রেমভরে প্রফুল্ল হইল। আকাশের চন্দ্র তখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বালিকার মুখমণ্ডল তাহাপেক্ষা শতগুণ প্রভা বিস্তার করিল। দেখিয়া বিনোদ বিস্মিত হইল।

সেই পুষ্পটি হাতে করিয়া বালিকা বলিল—"ইহা বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ফুল, আজ সাতদিন অনাহারে থাকিয়াও ইহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, গ্রহণ করুন। বিশ্বেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

বিনোদ কথা কহিল না, হাত বাড়াইল। বালিকা হাতে ফুল দিল। বায়ুবশে তৎক্ষণাৎ সে ফুল বিনোদের পায়ের উপর পতিত হইল। গিরিবালা শিহরিল। মুহূর্ত্তের জন্য বিনোদেরও সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। স্বামীর আশঙ্কায় বালিকার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে ফুল লইয়া মাথায় বাঁধিল, নয়ন মুদিল, করযোড়ে স্বামীর জন্য বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল।

এই অবসরে বিনোদ ধীরে ধীরে ভীতমনে তথা হইতে সরিয়া গেল। কতক্ষণে বালিকা চক্ষুঃ চাহিল। দেখিল—স্বামী নাই! দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিল, সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। নৈরাশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল। সাত দিনের অনাহার ও অনিদ্রা—ভীষণ দুর্ব্বলতা আসিয়া ঘেরিল। গিরিবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

সিশিরো।

সমাজ যখন একজনের উপদ্রবে উপদ্রুত; প্রকৃতিবর্গ যখন একজনের অত্যাচারে অত্যাচরিত, পীড়িত এবং লাঞ্ছিত; একজনের স্বার্থমন্দিরে যখন শত শত প্রাণীর সুখ, শান্তি, ধন, ঐশ্বর্য্য, জাতি, কুল, মান সমস্ত বলি পড়িতে বসে; তখন সমাজের জন্য, প্রকৃতিবর্গের জন্য, শত শত প্রাণীর জন্য একজন অভ্যুত্থিত হন—নিজের প্রতি লক্ষ্য নাই, আত্মসুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই; একমাত্র সাধারণের মঙ্গলই আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ স্বার্থই প্রাণ স্বার্থ—সে লোকের নাম যিনি যাহাই দিউন, তিনি মহাপুরুষ, তিনি ঈশ্বরের দূত। ধর্ম্মজগতে যখন পাপের ভয়ানক অত্যাচার—বহুতর প্রাণী যখন তাহার প্রপীড়নে প্রপীড়িত, তখন নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া সাধারণের পরিত্রাণের নিমিত্ত এক একজন অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের দূত বলে। সেইরূপ রাজনৈতিক জগতে যখন একজন রাজ-পুরুষ বা তৎসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি সমূহের ঘোরতর অত্যাচারে সাধারণ প্রকৃতিবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, তখন আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া, সাধারণের হিতের জন্য এক এক জন অভ্যুত্থিত হইয়া থাকেন

আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাও এক এক জন ঈশ্বরের দূতস্বরূপ। হিতৈষণা-প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এরূপ কত মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে, ইতিহাসে এখনও তাহার সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান। রোম যখন এইরূপ রাজপুরুষদিগের দ্বারা ভয়ানক রূপে অত্যাচারিত—রাজ-পুরুষেরা যখন শার্দ্দূলদীপিবৎ হিংস্র ও স্বেচ্ছাচারী, তাহা-দিগের ক্ষমতা যখন অনিয়ন্ত্রিত, স্বেচ্ছাচারপরবর্ত্তিতা সর্ব্বগ্রাসিনী, ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিবার ক্ষমতা যখন কাহারও নাই, প্রজারা সামান্য কীট পতঙ্গের ন্যায় চরণে দলিত—কীট পতঙ্গ অপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষমতা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না; কয়েকজন মুকুটধারী বা তাহাদিগের প্রসাদভোজীর সুখবৃদ্ধির জন্য যখন সাধারণ প্রকৃতিমণ্ডলী সর্ব্বস্ব হারাইয়া হাহাকার করিতেছিল, কয়েকজনের নীচ পাশব আমোদ চরিতার্থতার জন্য রোমের মৃত্তিকা যখন অসংখ্য প্রাণীর উত্তপ্ত ধূমায়মান শোণিতে কর্দ্দমিত হইতেছিল—রোম যখন এইরূপ সর্ব্বংকষ প্রভুশক্তির যাদৃচ্ছিক বিলাসভূমি, তখন এইরূপ বিশ্বপ্লাবী সাম্যময়ী হিতৈষিতা প্রণোদিত হইয়া, আপনার সুখদুঃখ ভুলিয়া গিয়া সাধারণের পরিত্রাণের জন্য একজন মহাপুরুষ অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। সে মহাপুরুষ—সিশিরো।

সিশিরো অনেক সময়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে দোষ সিশিরোর নয়। কার্য্য মনুষ্যের, কার্য্যের ফল ঈশ্বরের হস্তে। কোন কোন ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ সিশিরোর প্রকৃত হিতৈষিতার প্রতি সন্দেহ করেন; কিন্তু সে সন্দেহ অমূলক ভ্রান্তি মাত্র। সত্য, তাঁহার জীবনের শেষভাগে সিশিরো কিছু আত্মাদরপ্রিয় হইয়াছিলেন, সত্য, সকলের নিকট নিজের গৌরবকথা শুনিতে ভাল বাসিতেন, এবং ইহাও সত্য যে, এক সময়ে যখন তাঁহার সম্মাননার নিমিত্ত তাবৎ প্রজাবর্গ অনবরতঃ একপক্ষ যাবৎ উৎসব করিয়াছিল; সিশিরো তাহাতে নিজে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন—এ সকল সত্য বটে; কিন্তু সিশেরো যিনিই হউন, তিনি মনুষ্য। কোন্ মনুষ্য একেবারে সর্ব্বদোষাশ্রিত বা সর্ব্বগুণভূষিত হইয়া থাকে? আবার, এজন্য সিশিরো তত দোষী নন, যত দোষী তাঁহার সমাজ। সমাজ ও সমাজের দৃষ্টান্ত মনুষ্য-প্রকৃতি ভাঙ্গে, গড়ে, আপন

বলে নূতন পথে লইয়া যায়। * যে সমাজে বাস করিয়া ইংরাজেরা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, আর যে সমাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পলিতশিরা বৃদ্ধ হইতে অজাতশ্মশ্রু বালক পর্য্যন্ত তাবৎ বাঙ্গালী এত গোলামিপ্রিয়; সেইরূপ গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, উচ্চাভিলাষদূষিত সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব তাহার দৃষ্টান্তে লালিত হইয়া শেষকালে যে একটু শ্লাঘাপ্রিয়তা জন্মিবে, তাহাতে বিশেষ বিস্ময় কি? যাহা হইয়াছিল, তাহা সময়ের গতিতে, সমাজের বিশ্বজনীন অপ্রতিহার্য্য বলপ্রভাবে। সময় ছিল, যখন কবিরা এরূপ লোকের গুণ গান করিতে ভাল বাসিতেন, সময় ছিল যখন ভার্জ্জিল † ও হোরেস্ ‡ এইরূপ লোকের কার্য্যসমূহ বর্ণন করিতে গৌরব মনে করিতেন, সময় ছিল, যখন শত শত কর্ণ অধীনস্থদিগের নিকট প্রশংসাবাদ শ্রুতিলোলুপ হইয়া সদতঃ প্রত্যাশিত থাকিত, এমন সময়ও ছিল, যখন ওয়ালপোল (Walpole) ও নিজের মানবৃদ্ধির জন্য পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্যদিগকে অর্থ দ্বারা বশীকৃত করিয়াছিলেন—এ সময়ে এ সমস্ত কার্য্য দূষিত বলিয়া গণ্য হইত না। তাহা হইত না, কেন না, সে সকল কার্য্য তখন সমাজের অনুমোদিত। সুতরাং সময় এবং সমাজের অবস্থা ধরিলে সিসিরোর সে দোষ নগণ্য মাত্র।

সিসিরোকে মহাপুরুষ বলিলাম কেন? মহাপুরুষ বলি কাহাকে? অনন্ত-বিস্তৃতা দেশমহাদেশসংকুলা এই ধরিত্রী উপরে যে কেহ কখন মহা-পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যে কেহ কখন আপনার কার্য্য দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে একস্বরে আপনাকে মহাপুরুষ বলাইতে পারিয়াছেন, জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি মহৎকার্য্য করণা-ভিলাষী, প্রথম হইতেই জীবনের স্রোতঃ সেই একপথে প্রধাবিত। সে স্রোতঃ আবার যে বলে পরিচালিত হয়, তাহা অসাধারণ ক্ষমতার বল। সে ক্ষমতা অনৈসর্গিক, তাহা দেবদত্ত, সাধারণ লোকের তাহা থাকে না। আবার, মাত্র এই ক্ষমতার অধিকার দ্বারা মহাপুরুষ হওয়া যায় না। এমন

* Cf. Buckle's History of Civilization Vol. I.

† Read: Virgil's "Ipse Menalcas."

‡ Vide. "Exegi monumantum" of Horace.

অনেক লোক হয়তঃ ছিলেন বা আছেন যাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাহার চালনা করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকের নিকট পূজিত ও সম্মানিত না হইয়া কাননকুসুমের ন্যায় কাননেই বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতা সত্ত্বেও অনেকে সে ক্ষমতার চালনা করিতে পারেন না কেন? ক্ষমতা পরিচালনার পূর্ব্বে সে ক্ষমতা-বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান আবশ্যক। আবশ্যক, সে ক্ষমতার উপর বিশ্বাস, তাহার উপর আস্থা, এবং তাহার উপর নির্ভরতা। সিসিরো প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি সেই ক্ষমতার অধিকারে অধিকারী, তাহা বুঝিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারই স্রোতে আপনার জীবন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই সিসিরো আজ আমাদের নিকট—ইতিহাসের নিকট—সমগ্র জগতের নিকট মহাপুরুষ বলিয়া সমাদৃত!

সিসিরো বহুবার কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া আপনার মহাপৌরুষ দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনবারের ঘটনা অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রথম কার্য্যক্ষেত্র সিসিলি। প্রথম উত্থান ভেরাসের (Verres) বিপক্ষে। এক সিরাজুদ্দৌলার জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত, কিন্তু সে সময়ে রোমে ভেরাস্ যাহা করিয়াছে তাহা তেমন শত সিরাজুদ্দৌলার দ্বারা সংঘটিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। সে সকল জঘন্য বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা কল্পনার পৃষ্ঠাকে দূষিত করিতে চাহি না। ভেরাস্ যাহা করিয়াছিলেন তাহা সিসিলিতে, কিন্তু তাহার উপরে তখন রোমের বিচারকগণ ছিল। সে বিচারকগণ ভেরাসের ক্রীত, ভেরাস্ তাহাদিগকে আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ দিত, বিচারকেরা অর্থবশে সকলে ভেরাসের পক্ষ। সিসিরো একা, একা হইয়াও সিসিরো ভীত হইলেন না। তাহাদিগের অপেক্ষা পদে অনেক নীচ হইলেও সিসিরো ক্ষমতায় সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র হর্টেন্সিয়স সমদূরের লোক—সিসিরোর অটল সাহস তাহাকেও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। শত শত গুপ্তশত্রু তাঁহার হত্যার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিতেছিল, সিসিরোর সাহস অদমিত, ক্ষমতা অপ্রতিহার্য্য উর্ম্মিকারী বক্তৃতাস্রোতঃ অনর্গলরুদ্ধ। একাদিক্রমে সাতবার ভেরাসের বিপক্ষে সিসিরো বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা জগৎ তৎপূর্ব্বে আর

কখন শুনে নাই। সে বক্তৃতায় পাষাণ ও বিচলিত হয়, মৃত ব্যক্তি ও জাগিয়া উঠে। মুহূর্ত্তের জন্য বিচারকদিগের হৃদয় ও তাহাতে বিচলিত হইল মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা ও জাগিয়া উঠিল। রোমানদিগের আইনমতে তখন যে কেহ এরূপ ঘটনা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিত। এক কার্য্যের নিমিত্ত দুই বা বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে বিচারকেরাই যাহাকে বুঝিত, তাহার হস্তে সেই বিষয়ের ভার অর্পণ করিত। সিশিলিয়স নামে অপর একব্যক্তি ভেরাসের বিপক্ষে উত্থিত হইয়াছিল। সিশিলিয়স সিশিরো অপেক্ষা ক্ষমতায় অনেক নীচ। হর্টেন্সিয়েস সুযোগ বুঝিল, সে ঘটনার ভার সিশিলিয়সের হস্তেই উপন্যস্ত হইল। এ সুযোগে ভেরাস অক্লেশে নির্দ্দোষী বলিয়া বিপন্মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু, সিশিরো বিচারকগণের চক্রান্ত বুঝিলেন। তখন তাঁহার সেই অমানুষী গলা ছাড়িয়া আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বিচারকগণ ত্রস্ত হইল। অন্য উপায় নাই—সুতরাং সিশিরোর হস্তে সেই ভার পুনরর্পিত হইল।

অর্থ লইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিশিরোর অপবাদ দেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসত্য। সিন্সিনিয়ান আইন (Cincinian Law) তখন ও রোমে প্রচলিত ছিল। কার্য্যের নিমিত্ত কেহ কাহার ও নিকটে অর্থ লইতে পারিত না। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, সিশিরো এই আইনকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, এবং প্লুটার্কের কথার বিপরীতে যে এপর্য্যন্ত কেহ কিছু বলে নাই তাহাই দৃঢ়তর প্রমাণ। বরং হর্টেন্সিয়স্ সম্বন্ধে অন্য কথা শুনা যাইত, সিশিরোর হস্ত কখন ও সে প্রকার নীচ কার্য্যে দূষিত হয় নাই। ভেরাসের দণ্ড, সিশিলিবাসীদিগের ক্লেশাপনোদন এবং সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতিত সাধারণ সভার উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে তন্মধ্যে একটু স্থান প্রাপ্তির কামনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবলরূপে জাগিতেছিল।

হৃদয়ের এই সকল উন্নত পবিত্র কামনা সাধনোদ্দেশে সিশিরো যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ মনুষ্যে পারে না। প্রবলপ্রতাপ বিচারকগণ সহায় সত্ত্বে ও তাহাদিগের অশেষ কুটিলতাপূর্ণ বিদ্বেষ মধ্য হইতে আপনার অমিত পরাক্রমে ভেরাস্‌কে শৃগালের ন্যায় রোম হইতে খেদাইয়া দিতে সাধারণ মনুষ্যে পারিত না। সিশিরো সে সকল পারিয়াছিলেন। পারিয়া-

ছিলেন, কেননা, টুলি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। সিসিরো একজন অসাধারণ অমিততেজা মহাপুরুষ! (ক্রমশঃ)

প্রকৃতি-বর্ণনায় কালিদাস ও সেক্সপীয়ার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিয়া পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করান আমাদিগের সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে তাঁহাকে জগতের সর্ব্বপ্রধান কবি বলিলেও অতিবাদ হয় না। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত, বিক্রমোর্ব্বশী—যে কোন পুস্তক পাঠ কর, তাহাতেই বাহ্যপ্রকৃতির সুন্দর হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাইবে। কি বায়ুবিকম্পিত, লতাস্রগ্‌বিশোভী, বৃক্ষাদির সৌন্দর্য্য বর্ণনায়, কি অভ্রংলিহ, উচ্চচূড় শৈলের গম্ভীর মূর্ত্তি বর্ণনায়, কি উদ্বেলিততরঙ্গ সমুদ্র বর্ণনায়, কি বায়ুভরে বহমান সচঞ্চল জলদখণ্ড বর্ণনায়, কি নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি বর্ণনায়—সকল বর্ণনায় কালিদাস একজন অসাধারণ অদ্বিতীয় কবি। আমরা যদি সে সকল অসাধারণ বর্ণনা ভাল করিয়া দেখাইতে না পারি, তাহাতে কালিদাসের কবিত্ব-শক্তির হানি হইবে না, তাহা কেবল আমাদিগের লেখনীর দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। 'কল্পনার' আকার অতিক্ষুদ্র, সুতরাং যতদূর সম্ভব এ প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র হইবে। এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কালিদাসের কল্পনার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। যতদূর সংক্ষেপে পারি, আমরা সেই অসীম কবিত্বের আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিব। উপরে যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল, একে একে তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া, আমাদিগের কথার প্রমাণ স্বরূপ, দুই একটি চিত্র দেখাইব। দেখাইব, কালিদাসের সে সকল বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনা অতুল, অসাধারণ, তাহা ঐ সকল কাব্যে ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ। বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনায় কালিদাসের অদ্বিতীয়তা অবিসম্বাদিত।

প্রথমতঃ কুমারসম্ভব। কবি কুমারের তৃতীয় সর্গে বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনায় কি অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন! আমরা কোন্ স্থান রাখিয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করতঃ পাঠকগণকে উপহার দিব ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে পুষ্পধন্বা কামদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য হিমালয়ের অধিত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও সেই বসন্তবর্ণনা একবার মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিলে, ভ্রম হয়, যেন যথার্থই আমরা সেই বসন্ত ঋতু উপভোগ করিতেছি। তাঁহার সেই——

"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃস্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥"

—পাঠ করিলে কাহার না মন তন্ময় হইয়া যায়? লতাগুলি পুষ্পস্তবকে ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন পল্লব হইয়া অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে, শাখা প্রশাখাগুলি আনম্র হইয়া পড়িয়াছে। কবি এস্থানে আর একটু সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিলেন। তিনি লিখিলেন, লতাবধূরা যেন প্রিয়তম তরুদিগকে ভুজদ্বারা বন্ধন করিতেছে! এইরূপ সুন্দর বর্ণনা কাহার না হৃদয়গ্রাহী হইবে? কেবল ইহাই নহে। এই বসন্তবর্ণনার মধ্যে আর একটি চিত্র দেখ——

"লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসঙ্গতৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥"

মহাদেবের ভৃত্য নন্দী বাম প্রকোষ্ঠে হেমবেত্র ধারণ করিয়া নীরবে লতাকুঞ্জের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এবং ঈষৎ ক্রোধ ভরে মুখে এক অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া যেন প্রমথগণকে সঙ্কেতে শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমরা অধীর হইও না। এরূপ স্থলে এরূপ চিত্র প্রাণারাম, প্রীতিপ্রদ, নয়নানন্দদায়ক। আবার——

"নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥"

যে যার আপন কার্য্য আরম্ভ মাত্র করিয়াছে, আর পারিতেছে না!

নন্দীর সেই সাঙ্কেতিক শাসনে বৃক্ষগণ নিষ্কম্প, ভৃঙ্গযূথ নিশ্চল, মৃগ সমূহ প্রচারবিরহিত, পশুপক্ষীগণ নিঃশব্দ—সমস্ত কানন যেন একখানি প্রকাণ্ড চিত্রপট মাত্র। এইরূপ স্পষ্ট বর্ণনা (Vivid description) পাঠ করিলে বাস্তবিক আত্মবিস্মৃতি জন্মায়, তাহা যেন আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইয়া যায়, আমরা মানস চক্ষে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, আর প্রাণে যেন একটা দাগ চিরকালের জন্য রহিয়া যায়।

তাহার পর আবার তপস্যানিরত মহাদেবের তৎকালোচিত অবস্থা বর্ণনা।

" পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায় মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে॥
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈ র্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈ
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈ র্লক্ষীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ॥
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈ র্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিক সৌকুমার্য্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ॥"

উভয় স্কন্ধাগ্রভাগ ঈষৎ অবনত করতঃ সরলভাবে বীরাসনে বসিয়া আছেন। নাভির উর্দ্ধভাগ স্থির, হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ব্যবস্থিত, যেন ক্রোড় মধ্যে প্রফুল্ল পদ্ম শোভমান। জটাজুট উর্দ্ধ করিয়া সর্পদ্বারা বাঁধা, কর্ণে রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, আবার সেই মৃগচর্ম্মে নিজ কণ্ঠপ্রভা প্রতিফলিত হইয়া নীলবর্ণ হইয়াছে। অল্প অল্প চাহিয়া আছেন, তথাপি তারা নিশ্চল, ভ্রূবিক্ষেপ নাই, পক্ষ্মপংক্তি ও নড়িতেছে না, কেবল নিম্নাভিমুখে নাসিকাগ্রভাগ অবলোকন করিতেছেন। প্রাণাদি বায়ুর নিরোধ করিয়া বর্ষণহীন মেঘ, তরঙ্গহীন সমুদ্র কিম্বা বাতাভাবে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় স্থির হইয়ারহিয়াছেন। আবার কপালনেত্রমধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। সে জ্যোতিঃ প্রভাতে মৃণাল সূত্রপেক্ষা সুকুমার শিরঃস্থিত চন্দ্রকান্তিকে নিন্দিত করিতেছে।—যোগিবরের এইরূপ তপস্যানিমগ্ন অবস্থা যদি কালিদাস অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লেখককে চিত্রিত করিতে হইত, তাহাহইলে বোধ হয়, এমন সুন্দর ও মনোমদ হইত না; বোধ হয় অনেকে 'শিব গড়িতে বাঁদর', গড়িয়া বসিতেন! (ক্রমশঃ)

সিশিরো।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মেরিয়স্, সিলা, পম্পে, কাটিলিন, সিজার, এণ্টনি—হাহাকারপূরিত দুঃখতমসাচ্ছন্ন রোমের আকাশে এই সময়ে এক একজন এক একটি ভীষণ-দর্শন ধূমকেতু। সকলেই লোলজিহ্ব, সকলেই সর্ব্বভুক্—অর্থের প্রয়াসী, মানের প্রয়াসী, রাজ্যের প্রয়াসী; সে প্রয়াস সাধনে সাগরবারিবৎ অজস্র শোণিতপাতে ও অকুণ্ঠ। একজনও অন্যরূপ ছিল না, একজন ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া প্রজার জন্য ভাবিত না, সুতরাং একজনও প্রজার নিকট ভালবাসা পাইত না। সিজার ক্ষমতায় সর্ব্বপ্রধান; অভিলাষ, অত্যাচার, লালসাতুরতায় সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু রোমের তদাতন প্রধান ব্যক্তি সমূহ যে নিষ্ঠুর, বিশ্বাসহন্তা, স্বার্থপরায়ণ এবং পশ্বাচারী ছিল, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যাইত, যদি না আমরা যাঁহার কথা লিখিতেছি, সেই সিশিরো ভিন্নপ্রকৃতির লোক হইতেন। আমাদিগের কি আসিয়া যাইত, যদি এক সঙ্গে বাস করিয়া, এক সম্মান উপভোগ করিয়া, একপদে অবস্থিত থাকিয়া, এক ফোরমের বায়ু সেবন করিয়া সিশিরো আশা, অভিলাষ, স্বার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সাধারণ প্রকৃতিমণ্ডলীর উন্নতি এবং মঙ্গল কামনায় জীবন উৎসর্গীকৃত না করিতেন। কি আসিয়া যাইত, যদি না একদিক্ হইতে এই সকল নরশার্দ্দূলদিগের পাশবপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া প্রজামণ্ডলী হইতে হাহাকার উত্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ অপরদিক্ হইতে জলদগম্ভীর নির্ঘোষে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সিশিরো আপনার বিরাট কণ্ঠ নিনাদিত করিতেন। হিতৈষিতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ব্যর্থচেষ্ট এবং তজ্জন্য অসুখিত হইলেও * সিশিরো সে সময়ে হিতৈষিতার যেরূপ

* Dean Merivale calls him "Unhappy patriot Cicero."

অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অতুল, তাহা জীবন্ত, তাহা হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা। কেটো (Cato) হিতৈষী ছিলেন; কিন্তু কিসের কেটো? তাঁহার হস্ত অনবদ্য ও অদূষিত ছিল, কিন্তু তিনি কখনও দূষিত লোকদিগের সঙ্গে বিমিশ্রিত হন নাই। শত শত ঘোরতর নারকীদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকিয়া, জীবনের সর্ব্বক্ষণ সেই সকল হেয় লোকের মধ্যে একত্র বাস করিয়া ও যে ব্যক্তির অসাধারণ আত্মবিসর্জ্জনসংমূলা হিতৈষিতা বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হয় নাই, সম্মুখে সহযোগীদিগের ঘৃণিত কার্য্য সকল প্রতিনিয়তঃ চক্ষের উপর ব্যাপ্রিত হইতে দেখিয়াও ভ্রমেও যাঁহার হস্ত কখন সেই দিকে প্রসারিত হয় নাই—তাঁহার নিকট কিসের কেটো? কেটো হিতৈষী ছিলেন, কিন্তু সিশিরো তাঁহাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর।

মাত্র বক্তৃতা দ্বারা কমন্সসভায় সভ্যসমূহের ঐকমত্যতা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার—এ কথা অদ্যতন সভ্যসমিতির নিকট পরিশ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি এক মাত্র বক্তৃতা দ্বারা অযুত প্রাণীর হৃদয়ের চিরপালিত বিশ্বাস পর্য্যন্ত অপনীত করিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিব? না বুঝিয়া রুলস্ ভূমিবিভাগ আইন (Agrarian law) স্থাপনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন! সিশিরোর বক্তৃতায় তাহার সকল প্রয়াস সকল চেষ্টা স্রোতঃগত তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল! সে দিন প্রজাবর্গ সিশিরোর নিকট যে তেজোময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছিল, তাহা জগদুন্মাদকারী, তাহা অমানুষশক্তিসম্ভূত। সেই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া Pliny (the Elder.) তাঁহার প্রেতাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সিশিরো, তুমি একবার তোমার মুখ হইতে একটি কথা বহির্গত কর, প্রজাগণ তাহাদিগের মহানর্থকর এগ্রেরিয়ান আইন পরিত্যাগ করুক।" * বাস্তবিক, তাহাতে সকলের হৃদয় আমূল আলোড়িত হইয়া উঠিল; সকলে আপনাপন স্বত্ব বুঝিল। রুলস্ ফাঁফরে পড়িলেন, তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ হইল না।

তাহার পর কাটিলিন চক্র আরম্ভ হইল। পৃথিবীতে যতবার যত চক্রান্তকারী জন্মিয়াছে কাটিলন কোন ও বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা দীনস্বত্ব ছিল

---

* Hist. Nat. Lib. VII. C. XXXI.

না, বরং সর্ব্বোপরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অতিবাদ হইবে না। * কাটিলিন যাহা করিয়াছিলেন তাহা সকলে করিতে পারে না, সে সকল কথা অতি রোমহর্ষণ—কল্পনায় আমরা তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিব না, পাঠক, তজ্জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান করুন। সিশিরোর সর্ব্বদর্শী চক্ষু এ সকল ব্যাপারে মুদ্রিত ছিল না, অমানুষ কণ্ঠ নির্ব্বাক ছিল না,—সে দুর্ব্বার হিতৈষিতা নিশ্চেষ্ট থাকিবার নহে। সিশিরোর ভৈরব কণ্ঠ আষাঢ় জীমূতমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল, বক্তৃতার পর বক্তৃতায় রোমে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে বক্তৃতা মাঠে দাঁড়াইয়া প্রজাবর্গ শুনিল, সেনেটে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সকলে শুনিল, দূর হইতে চক্রান্তকারীগণ ও শুনিল;—শুনিয়া মনে মনে সকলে যুগান্তর গণনা করিতে লাগিল। কি প্রকারে সিশিরো এই চক্রের দুর্জ্ঞেয় বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হইলেন তাহা আমরা জানি না, জানিলে ও এখানে সে রহস্য উদ্ভিন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই। সিশিরো কৌশলে গোপনে গোপনে সকল সংবাদ জানিলেন, প্রকাশ্যস্থলে কাটিলিনের সহযোগীদিগকে সমবেত করিয়া প্রজামণ্ডলীর নিকট তাহাদিগের সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। চক্রান্তকারীদিগের দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না, সকল দোষ প্রমাণিত হইল। এখন তর্ক উঠিল, ইহাদিগের কি প্রকার শাস্তি বিধেয়। সিজার গোপনে গোপনে ইহাদিগের সমর্থনকারী, কিন্তু ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিবার ক্ষমতা ও আর নাই—জীবনদণ্ড ব্যতীত সিজার অন্য সর্ব্বপ্রকার দণ্ডের পক্ষপাতী। সেনেট সে কথা শুনিল না, প্রজাবর্গ তাহা মানিল না, সিশিরোর হৃদয় দয়াপ্রবণ, এত দোষী তথাপি সে হৃদয় দয়ার উৎসে উৎসারিত। কিন্তু ভবিষ্যৎ আশঙ্কা গণিলেন, সাধারণের আগ্রহ বুঝিলেন, অগত্যা তাহাদিগের মতের পোষকতা করিতে হইল। চক্রান্তকারীগণ বধ্যভূমে নীত হইল। 'Vixerunt'—একটি—একটি কথা সিশিরোর মুখ হইতে উচ্চারিত হইল; বাহিরে স্যান্দ সমীরণ সায়ন্তন কুসুম নিচয় বিধুনিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বায়ুর সঙ্গে চক্রান্তকারীদিগের

* The great wellborn ravelling Roman Conspirator is much better known to us than Parkin Warbeck, or Guy Fawkes, or the Duke of Monmouth— *Anthony Trollope.*

প্রাণবায়ু মিশাইল। কাটিলিন চক্রের মূলোচ্ছেদ হইল।

সিশিরোর প্রশংসারবে জগৎ পূরিয়া উঠিল, প্রজাসংঘের আনন্দসূচক ভীম কোলাহলে রোমের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বধ্যভূমি হইতে প্রজামণ্ডলী দলে দলে তাঁহার যশোগান গাহিতে গাহিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন রাত্রি হইয়াছিল, নরেন্দ্রমার্গাট্ট সকল তাঁহার পথ প্রদর্শনের জন্য আলোকমালায় শোভিতেছিল, পুরনারীব্রজ উন্মুক্তগবাক্ষ-পথ দিয়া মহাহর্ষে আপনাপন সন্তানদিগকে দেখাইতেছিল। সেনেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা কাটুলস্ এবং প্রজাদিগের বহুমানিত কেটো সকলের প্রতি-নিধি হইয়া সকলের মতে তাঁহার নাম দিল—দেশের পিতা!

মঠে, মন্দিরে, ঘাটে, মাঠে, পথে সর্ব্বত্রই সিশিরোর নাম বিঘোষিত হইতে লাগিল। রাজদ্বারে, দেবগৃহে, বিদ্যালয়ে, পান্থশালায় রোমের সর্ব্বস্থলেই একই কথা, একই প্রসঙ্গ, একই আলোচনার বিষয়। কয়েক দিনের জন্য রোম "Pater Patrea" শব্দে প্রতিশব্দিত হইতে লাগিল। অনেকের সে শব্দ সহ্য হইল না। সিশিরো নিজেও আপনার গৌরব যথা তথা করিয়া বেড়াইতেন, সেই জন্যই বুঝি ভাগ্যদেবতারও তাহা সহ্য হইল না। অতঃপর ভাগ্যবিপর্য্যয় আরম্ভ হইল। সিশিরোর দুঃখের দিন উপস্থিত হইল। সিজারপত্নী ও ক্লদিয়সের জঘন্য অভিনয়ে সমগ্র রোম স্তম্ভীভূত হইয়া পড়িল। শ্লীলতার অনুরোধে সে সকল কথা আমরা এখানে প্রকাশ করিতে চাহি না। কুক্ষণে সিশিরো ক্লদিয়সের উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কুক্ষণে তাহার শাস্তির উপায়োদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ক্লদিয়স প্রজাসমূহের নিকট, যে কোনও উপায়ে হউক, সিশিরোর নির্ব্বাসনাভিমতি যাচিয়া লইল। সিশিরো রোম হইতে দূরে সম্মাড়িত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে নীত হইল, গৃহ দগ্ধীভূত হইল, ক্লদিয়স তৎস্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সিশিরো দূর হইতে এ কথা শুনিলেন, হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইল। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, সাধারণ প্রকৃতিমণ্ডলী ইহারই মধ্যে তাঁহার কৃত উপকার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কৃতঘ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা আর কোনও আশ্বাস মানিল না।

খৃষ্টশকের ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে এপ্রেল মাসে তিনি রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন, পর বৎসর আগষ্ট মাসে আবার সকলের আগ্রহাতিশয্যে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে প্রজাদিগের আনন্দোল্লাস দেখিয়া সিশিরো বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন, ক্লদিয়স বলপ্রয়োগেই তাহাদিগের মত ফিরাইয়াছিল। আবার সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, আবার সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল, মন্দির ভাঙ্গিয়া আবার পেলাটাইন শৈলে তাঁহার গৃহ বিনির্ম্মিত হইল। সকলই হইল; কিন্তু একবার যাহাদিগের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কয়জনের পুনরায় গড়িয়াছে? ষট্‌পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে সিলিশিয়ার শাসনকর্ত্তা হইয়া যাইতে হইল! এ সময়ে এরূপস্থলে এরূপ পদে নিয়োজিত হইতে পারিলে অনেকে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিত, নিষ্কণ্টকে অনেকে লুণ্ঠনাদি দ্বারা বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত! সিশিরো সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি ইহাতে দুঃখিত ভিন্ন আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ, এই বৃদ্ধ বয়সে রোমে থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু উপায় নাই, সিলিশিয়ায় তাঁহাকে যাইতে হইল। অতি অল্পদিনই সিশিরো তথায় ছিলেন, কিন্তু সেই অল্পদিনের জন্য সিলিশিয়ায় যেরূপ সুশাসন হইয়াছিল, তাহা তৎপূর্ব্বে সেখানে আর কখন হয় নাই।

সিশিরো রোমে ফিরিলেন। সিজার তখন রুবিকন অতিক্রান্ত হইয়াছিলেন। এ ঘটনার পরিণামে কি ফল দর্শিবে তাহা সিজার, কি পম্পে, কি সিশিরো কেহই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সিজার সাধারণসমিতির ঘোর বিদ্রোহী; পম্পে, ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে তাহাদিগের পক্ষ। প্রজাদিগের স্বার্থসংরক্ষণ সিশিরোর প্রাণভূত সঙ্কল্প, সিশিরো অনন্যোপায়ে পম্পের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। উভয় পক্ষে ফার্সেলিয়া ভূমে সংগ্রাম সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে সিজার রাজ্য লাভ করিল, পম্পে শৃগালের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিল, পরাজয়ের সকল কলঙ্ক মাথায় লইয়া সিশিরো রোমে ফিরিলেন। সিজার সিশিরোকে রোমে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সিজারের মাহাত্ম্য ও উদারতা দেখিয়া সিশিরো বিস্মিত হইলেন তিনি তাহার প্রশংসা করিলেন। যে তাঁহাকে

এতদূর হইলেও আবার রোমে থাকিতে দিল, তাহার প্রশংসা না করিবেন কেন? সিজার অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাকে এক্ষণে বাঁচিতে দেওয়াই অনুগ্রহ, তাহে রোমে বাস করিতে পাইলেন—এত অনুগ্রহেও তিনি তাহাকে প্রশংসা না করিবেন কেন? সিজারকে তিনি প্রশংসা করিতেন, প্রশংসা করিবার গুণও সিজারের ছিল। জেতা বিজিতকে রক্ষা করেন তাহার দৃষ্টান্ত রোমে সিজার প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। আবার নিষ্ঠুরতার জন্যও সিশিরো তাহাকে ঘৃণা করিতেন; কিন্তু সিশিরোর ন্যায় ব্যক্তির নিকট এ প্রকার জীবন দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ। আত্মহত্যা করিয়া এ দুর্ব্বিষহ ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে এক একবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। করেন নাই কেন না, তিনি জানিতেন, মনুষ্যজীবন দুর্ল্লভ সামগ্রী, এ জীবন থাকিলে জগতের কোন না কোন কার্য্য করিতে পারিবেন। সিশিরো জীবন নষ্ট করিলেন না।

সিশিরো মরিলেন না, কিন্তু সিজার মরিল। এই সময়ে হত্যাকারীগণ তাহাকে গোপনে হত্যা করিল। সিশিরো তাঁহার সাধারণ সমিতির আশঙ্কায় আকুল হইলেন। একাদিক্রমে চতুর্দ্দশবার এণ্টনির বিপক্ষে বক্তৃতা করিলেন। * সে বক্তৃতা সাধারণ প্রকৃতিমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত। তাহা তেজোময়, তাহাতে স্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইতে লাগিল, সেই স্ফুলিঙ্গ প্রকৃতিমণ্ডলীর হৃদয়ে সঙ্কুক্ষিত হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এণ্টনিও ভীরু ছিল না, প্রকৃতিবর্গের সে উত্তেজনা নিবারণের জন্য এণ্টনিও সজ্জীভূত হইল। সিশিরো তখন প্রাণ মুষ্টিমধ্যে লইয়া যুঝিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, এণ্টনি নিতান্ত হীনবল নহে, এণ্টনি ইহার পরে কখনই তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবে না, তথাপি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না—অটল সাহস, অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, অপ্রতিরুদ্ধ বীর্য্য, দিগন্তসঞ্চারী বক্তৃতাস্রোতঃ। নিজে তখন জরাজীর্ণ পলিতকেশ বৃদ্ধ, সুখশান্তি দূরপরাহত, একমাত্র জীবনরূপিণী কন্যা কালকবলিত, ভার্য্যা সঙ্গভ্রষ্ট, ভাগ্য অপ্রসন্ন, বন্ধুবর্গ অবিশ্বসনীয়, তথাপি

* They are termed "Phillipics." Phillipics are altogether fourteen in number.,

সিশিরো কিছুমাত্র ভীত নহেন, অলোকসাধারণ দৈববে বলীয়ান্। নেলসন যেমন একদিন অসীম বিপদ্‌রাশির মধ্যে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, হয় রাজপদ লাভ করিব, নয় ওয়েষ্টমিনিষ্টার সমাধিমন্দিরে চিরদিনের তরে বিরাম ভোগ করিব। * সর্ব্ববিপদ্‌কে তুচ্ছ করিয়া সিশিরোও সেইরূপ উচ্চরবে বলিয়াছিলেন, হয় প্রজার মঙ্গল সাধিব নয় এ ছার তনু বিসর্জ্জন দিব। "কার্য্যং বা সাধয়েম্ শরীরং বা পাতয়েম্"—এই এক মন্ত্র, এক ধুয়া। সিশিরো সিংহপ্রতিমতেজে বাহুবলদর্পে সেই বাক্যে ও অকুতোভয়ে এণ্টনির বিরুদ্ধে যুঝিলেন।

যুঝিলেন, কিন্তু যুঝিয়া কিছু হইল না। কালে এণ্টনি প্রবল হইল, তাঁহার সে প্রচণ্ড রৌদ্র তেজ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল, সিশিরো পরাস্ত হইলেন। হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। এণ্টনিপ্রেষিত শত শত ঘাতুকের শাণিত অস্ত্র তাঁহার শোণিতপিপাসু হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। জীবন তখন আর প্রিয় ছিল না, যে জীবন সাধারণের উপকারে আসিল না তাহাতে কিসের প্রয়োজন? নিঃশব্দে আপন মস্তক বাড়াইয়া দিলেন। অকস্মাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে শিবা সকল অমঙ্গল চীৎকার করিয়া উঠিল, দেবালয়ের চূড়া খসিয়া পড়িল, সদ্যঃপ্রসূত শিশু মাতৃস্তন মুখে করিয়া বিকট রূপে কাঁদিয়া উঠিল, রোম অনাথ হইল, একমাত্র কাণ্ডারী বিহনে প্রজাবর্গ অকূল পাথারে ভাসিল। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও হিতৈষী চিরদিনের জন্য ইহ সংসার হইতে অবসৃত হইলেন।

আজ দুই সহস্র বৎসর অতীতপৃষ্ঠে যোগ দিয়াছে, সিশিরো জীবলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখনও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া রোম বিলাপিয়া বিলাপিয়া কাঁদে কেন? এখনও সভ্য অসভ্য সমস্ত জাতি তাঁহার জন্য সহানুভূতিতে গলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করে কেন? ইতিহাস এখনও কেন জলদক্ষরে সেই নাম বহন করিয়া ভবিষ্যবংশাবলীর নিকট তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে? আমরাই বা আজ দুই হাজার বৎসর পরে সে কথা লিখিয়া কল্পনার পৃষ্ঠা পূরণ করিতেছি কেন? কেন, তাহার কারণ—

---

* See. Southey 's Life of Nelson.

সিশিরো একজন অসাধারণ অদ্বিতীয় মহাপুরুষ! তেমন মহাপুরুষ এ বসুধা-উপরে অতি অল্পসংখ্যকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতি অল্পলোকেই সেরূপ নিজের মহাপ্রাণতার প্রস্ফূরণে লোকসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিতে পারিয়াছেন! সামান্য অবস্থা হইতে নিজের উন্নতি করিয়া পৌরুষ দেখাইয়াছেন অনেকে; কিন্তু দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, পীড়িত ভ্রাতৃবর্গের জন্য সুলার (Sulla) একটি সামান্য সৈনিক যে এতদূর মহাপৌরুষ দেখাইতে পারিবে ইহা অচিন্তিতপূর্ব্ব! হৃদয়ের যে সকল উন্নত আশা—সিশিরো অনেক সুসিদ্ধ করিয়াছিলেন। বাগ্মীতার ইচ্ছা আশৈশব বলবতী, সে বাগ্মীতায় সিশিরো জগতের নিকট সর্ব্বে সর্ব্বা। সিশিরোর হিতৈষিতা ও আত্মবিসর্জ্জন জগতে অতুলনীয়। মানিলাম, সিশিরো এই সমস্ত অলোকসামান্য গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন; কিন্তু সে কথা এই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে বসিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম কি জন্য? এই জন্য যে—ভারতেও একদিন এরূপ মহাপুরুষ ছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয় ভারতে ও এমন অনেকে জানিত! ভারতের দধীচি একদিন পীড়িতদিগের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া হাসিতে হাসিতে আপনার অস্থি সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই ভারতের সন্তানেরা আজ স্বার্থের কীট, সম্পূর্ণ রূপে আত্মত্যাগ-বিধুর, জীবনে বিশ্বাসশূন্য, বেদনাবোধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! গুরুগোবিন্দ সিংহের বংশ আজ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিঃস্পৃহ! প্রাবৃটপয়োদমালাতুল্য অসংখ্য বিপদ্‌রাশির মধ্যে এই অমানুষ মহাপুরুষ সিশিরোর অসীম সাহস, বীর্য্য, হিতৈষণা, আত্মবিসর্জ্জন ও জীবনীশক্তির অলৌকিক দৃষ্টান্ত সমূহ দেখিয়া, আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আপনাদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া, কল্পনার একজনও পাঠক যদি নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন, তবে বৃথায় এ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলাম!

বঙ্গে কুলীনাধিকার।

[১৯১ পৃষ্ঠার পর]

তার পর মেলবন্ধন। ক্রমেই সেই বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ভয়ানক হইয়া উঠিল। কুলীনদিগের মধ্যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল!— অবসর বুঝিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদার পুনঃসংস্কারের জন্য কুলাচার্য্যপ্রধান দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করিলেন। সমুদয়ে ছত্রিশটি মেলে কুলীনগণ বিভক্ত হইল। তাহার মধ্যে ফুলিয়া, খড়দা, সর্ব্বানন্দী ও শ্রীবল্লভ চারিটি মহিমা ও মর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান। এইখানে এই মেলবিভাগ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। রঘুনন্দন তর্কবাগীশ বলেন, দোষ লইয়াই মেলবন্ধন, অতএব যে মেল সর্ব্বপ্রধান তাহা সর্ব্বপ্রধান দোষে দূষিত। * এই মতের সমর্থন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বলেন, যে ফুলিয়া মেল সর্ব্বপ্রধান বলিয়া [illegible] যবনস্পর্শ দোষ আছে। † কেহ কেহ আব [illegible] করেন। ‡ ফুলিয়া মেল এ তৎসঙ্গে [illegible] কৃত্তিবাস পণ্ডিত তাহাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলি[illegible] হউক,

---

* কুলসারসিন্ধু দেখ।

† বহুবিবাহ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় [illegible]।

‡ ঘ্রাণমাত্র পীরআলি দেখে সর্ব্বজন।
সাক্ষাৎ যবনস্পর্শে কি হয় আচরণ?
অপভ্রংশলোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
হাঁসাই থানদারের কথা সত্য সত্য নয়। মেলমালা।

§ স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ রামায়ণ আদিকাণ্ড।

মেল সকল যে দোষোদ্ঘোষণ পূর্ব্বক আবদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, মেলবন্ধনে সে দোষের কিছুই লাঘব হইল না। বিষবৃক্ষে তখন ফল ফলিয়াছে, সামান্য চেষ্টায় কিছুমাত্র প্রতিকার দর্শিল না। দেবীবর ভাল সংস্কারক ছিলেন না, অথবা সংস্কারকুশল হইলেও যথার্থ সংস্কার করিতে পারেন নাই। দেবীবর কুলীনদিগের তৎকালীন বিশৃঙ্খলা-দোষ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বুঝিয়া যদি যথার্থ সংস্কারকের ন্যায় সেই দোষ সকল অপাকৃত করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এমন হইত না। একমাত্র ভ্রাতা যোগেশ্বর পণ্ডিতের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষবশে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়াই * নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রশস্ত অবসর না বুঝিয়া যদি প্রকৃত সমাজ সংস্করণের এই সুসময় মনে করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এমন হইত না। দেবীবর এ সকল বুঝিলেন না, বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে মেলবন্ধন করিলেন। দোষের নিরাকরণ কিছুই হইল না, অপরন্তু কৌলীন্যের আর ও একটি বাঁধুনি বাড়িল। বিষবৃক্ষের কিছু মাত্র হানি না হইয়া ফলতঃ নূতন রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া সময়ে বিষবৃক্ষের ফল পাকিয়া আসিল। আবৃত্তিগুণ-মাত্রাবশিষ্ট মেলবিভাগবদ্ধ কৌলীন্যে ক্রমে বহুবিবাহ আসিয়া উপস্থিত হইল। বল্লাল সেনের শ্রাদ্ধ হইল। কুলীনদিগের সঘর ভিন্ন উপায় নাই, অন্যত্র গতি নাই, তাহা হইলেই পতিত ও কুলভ্রষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু করণীয় ঘর দুষ্প্রাপ্য, উপযুক্ত পাত্র মিলে না। অন্যঘরে ভাল পাত্র মিলিলে ও কন্যা তাহাতে অর্পিতা হইতে পারে না, হইলে কুলক্ষয়কারিণী হইবে। সুতরাং অনেক লীলাবতী ললিতমোহন ছাড়িয়া নদেরচাঁদের হাতে পড়িতে লাগিল। হয়তঃ কুলীনঠাকুরের ঘরে কন্যা অথবা কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিতে বিবাহযোগ্যা ৪।৫ টি, বহুকষ্টে ও অশেষশ্রমে একটি পাত্র জুটাইয়া একরাত্রেই একজনের সঙ্গে, পরস্পর সম্পর্কাদি না বাছিয়া, সকলগুলির পরিণয় দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হয়তঃ চল্লিশ বৎসরের পিসি দশ বৎসরের ভাইঝির সঙ্গে একসময়ে একজন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধকে পতিরূপে

---

* পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধিকৃত সম্বন্ধনির্ণয় ১৮০—১৮৪ পৃষ্ঠা।

বরণ করিল, পিসি ভাইঝির সপত্নী হইল, কুলীনঠাকুর দায় হইতে উদ্ধার হইলেন। * হতভাগিনীদিগের কি দশা হইবে সে দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, কি রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ঘৃণিত কর্ম্মে † প্রবৃত্ত হইলেন সে কথা একবার ভাবিলেন না, যেন তেন প্রকারেণ কুললক্ষ্মীকে প্রসন্না রাখিতে পারিয়া মহাহৃষ্ট হইলেন। এদিকে আবার, শ্রোত্রিয়দিগের কুলীনপাত্রে কন্যাদান স্বতঃ অধিকার—অন্যান্য পাত্র সত্ত্বেও তাহারা কুলীনদিগের জন্য লালায়িত! —পণ, গণ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। অনেক কৃতদার কুলীনসন্তান অর্থলোভে বহুবিবাহ করিতে আরম্ভ করিল; এ বহুবিবাহ বংশজদিগের চেষ্টায় আরো ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। কুলীনেরা তাহাদিগের সহিত আদান প্রদান করিত না; কিন্তু তাহাদিগের নিতান্ত সাধ, কুলীনে কন্যাদান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। সে সাধ কিরূপে পুরিবে? সুতরাং তাহারা দর চড়াইতে লাগিল। সে লোভ সামলাইতে না পারিয়া অনেক শুল্কগ্রাহী কুলীন বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিল। অতঃপর সে পুত্রের আখ্যা হইল—স্বকৃতভঙ্গ। স্বকৃতভঙ্গ দেখিলেন, বিবাহিতা স্ত্রীর কোন ভার লইতে হইবে না অথচ বেশ কিঞ্চিৎলাভ ও আছে,—আর তিনি বংশজদিগের প্রতি বিমুখ থাকিলেন না। পতিতপাবন স্বকৃতভঙ্গ এইরূপ লাভ পাইয়া একে একে অনেকগুলি অবলার মাথা খাইয়া, খাতায় নামের তালিকা বাড়াইয়া বংশজদিগকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবিবাহ ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইল। বিষবৃক্ষের বিষময় ফলের ক্রিয়ারম্ভ হইল।

বিষবৃক্ষের বিষময় ফলের যখন ক্রিয়ারম্ভ হইল, তখন ইহা একস্থানে থাকিল না, বঙ্গের সকল প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল। আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয় বলিলাম তাহা মাত্র রাঢ়ীয়দিগের কথা। তদ্ভিন্ন বঙ্গে আরও

---

* কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে এই কদর্য্য লজ্জাকর চিত্রটি একবার দেখিবেন।

† একস্মিন্ দিবসে চৈব সোদরাণাং তথৈব চ।
যুগ্মমৌদ্বাহিকং বর্জ্জ্যং কন্যাদান দ্বয়ং তথা।—উদ্বাহতত্ত্ব।

দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিত—বারেন্দ্র ও বৈদিক। বারেন্দ্রগণ ও পা কুলমর্য্যাদাইয়াছিল। কেহ বলেন, বল্লাল কর্ত্তৃক তাঁহারা কুলীন, মৌলিক (শ্রোত্রিয়) ও কাপ (বংশজ) এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। * আবার কেহ বলেন, বারেন্দ্রভূমের রাজা বীরমল্ল গৌড় হইতে নিজ রাজ্যে পাঁচজন কনৌজী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং কালক্রমে তিনিই গৌড়-রাজের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে এই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। † ইহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ১৫টি গাঁই—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সাঙ্গায়িনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্ট, শালী, লাউড়েল, চম্পাটি, ঝম্পাটি, আদিত্য ও কামদেবতা। এতন্মধ্যে প্রথম ছয় গাঁই কুলীন। কুলীনের যা কিছু থাকা আবশ্যক সকলেই ইহাদিগের বর্ত্তমান। তবে, রাঢ়ীয় কুলীনেরা বংশজ হইলে আর উঠিতে পারে না, কিন্তু আদি কাপেরা সৎকার্য্য করিলে সর্ব্বদা তাজা থাকে। তার পর বৈদিক। ইহাদিগের কোন ও গাঁই নাই—নিগাঁই বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যেও কৌলীন্যের বাঁধাবাঁধি আছে। কুলীনেরা মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিলে বংশজ হন। তবে, বংশজ কুলীনকে কন্যা দিতে পারে, কিন্তু গ্রহণের অধিকারী নহে। সাধারণতঃ নবগুণ কুললক্ষণ বলিয়া অভিহিত, তদ্ব্যতীত ইহাদিগের আরো একটি কুললক্ষণ আছে। কন্যার এক মাস মাত্র বয়ঃক্রমেই বিবাহের বাগ্‌দান কার্য্য সম্পন্ন করা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ‡ এই লক্ষণ বজায় রাখিতে গিয়া অনেক অভাগার কন্যা

---

* পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধিকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় ২৭শ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট ৭ ম পৃষ্ঠা।

† The royal patron of the Barenders [Birmallah] did not fail to imitate the example of his friend of Gour in creating Kulins and Shrotriyas among his Brahmins.

CALCUTTA REVIEW VOL. II. P.19

‡ বৈদিকেরা কহেন যে, 'জাতমাত্রেণ কন্যায়া বাগ্‌দানং কুললক্ষণম্।' এই বাগ্‌দানের প্রায় অবিলম্বেই পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়।—প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকৃত বৈদিক কুলজী।

অন্যপূর্ব্বা দোষে দূষিত হইয়া থাকে। বৈদিকদিগের মধ্যে বহুবিবাহ আজও ততদূর ভয়ানকরূপে প্রবল হয় নাই, কিন্তু বারেন্দ্রদিগের মধ্যে ইহার অত্যাচার অতি ভয়ানক। অনেক বৃদ্ধ ভাদুড়ী আজও কন্যার সঘরে বিবাহ দিতে না পারিয়া অগত্যা সেই বৃদ্ধ বয়সে কুলরক্ষার জন্য পরিবর্ত্তে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে। অনেক লাহিড়ীসন্তানকে আজও ভগিনীকে পাত্রস্থা করিবার জন্য স্ত্রী পুত্র স্বত্বেও দ্বিতীয়দার-গ্রহণে স্বীকৃত হইতে হইতেছে। অনেক বারেন্দ্ররমণী আজও সপত্নী-যন্ত্রণায় নির্জ্জনে বসিয় নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। অহো! কবে এ বঙ্গভূমি হইতে এ ভয়ানক প্রথা উঠিয়া যাইবে? কবে এ বিষবৃক্ষের সম্যক্ উন্মূলন হইবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষবৃক্ষে তাবৎ বঙ্গদেশ ছাইয়াছিল। সেই পঞ্চকনৌজীর সমভিব্যাহারে যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিল * ক্রমে তাহারা ও তাহাদিগের বংশাবলী এই বৃক্ষের আশ্রয় লইল। বল্লাল তাহাদিগকে ও মজাইলেন। কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল—কুলীন ও মৌলিক। ঘোষ বসু ও মিত্র এই তিন ঘর কুলীন। দত্ত অভিমানবশে ভৃত্যভাব স্বীকার না করায় কুলীনত্ব পান নাই; গুহ কুলীন হন নাই, কিন্তু বসুজদিগের অপেক্ষা কিছু উচ্চ। মৌলিক দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধ মৌলিক আটঘর—দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, ও পালিত। তদ্ভিন্ন বায়াত্তর ঘর সাধ্য মৌলিক। সাধ্যগণ সিদ্ধ অপেক্ষা হীনতর। কুলীন কায়স্থের পুত্রগত কুল। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে হয়, না করিলে কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু তাহার অপর পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন। প্রথম কুলীনকন্যা বিবাহের পর মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিলে জ্যেষ্ঠপুত্রেরও কোন দোষ স্পর্শে না। মৌলিকের কুলীনের সহিত আদান

---

* কে কার ভৃত্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কায়স্থকুলদীপিকার বলেন, দক্ষের ভৃত্য দশরথ বসু, ভট্টনারায়ণের মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষের দাশরথি গুহ, বেদগর্ভের কালিদাস মিত্র এবং ছান্দড়ের পুরুষোত্তম দত্ত। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কৃত রাজাবলীতে কালিদাস মিত্রকে শ্রীহর্ষের এবং দাশরথি গুহকে বেদগর্ভের ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রদান বিহিত, মৌলিকে মৌলিকে কার্য্য করিলে তাহাকে হীনক্রিয় হইতে হয়। মৌলিকের বাসনা, কুলীনে জ্যেষ্ঠপুত্রকে কন্যা দান করে, এ জন্য যত্ন ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। কুলীনসুত সেই যত্ন ও অর্থে বশীভূত হইয়া মৌলিকের ঘরে দ্বিতীয় সংসার করেন। এই সংসারের নাম আদ্যরস। আদ্যরস বহুবিবাহের প্রশ্রয়কারী। আদ্যরসে অনেক কায়স্থের সর্ব্বনাশ হইতেছে। সে বিষবৃক্ষের বিষময় ফলের জ্বালায় অনেক পরিবার অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে।

এখন দেখান গেল, কিরূপে তাবৎ বঙ্গদেশে কৌলীন্য-প্রথা হইতে বহুবিবাহ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ ও শুল্কগ্রহণ প্রভৃতি জঘন্য বিষয় সকল আচরিত হইতে লাগিল; দেখান গেল, কিরূপে বিষবৃক্ষ বীজাঙ্কুর হইতে ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া, সহস্র বিষময় ফলে শোভিত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু, এ বিষময় ফলের প্রধানতঃ ভুক্তোভোগী কে? পুরুষ—স্বার্থসংকুল বলবান্ পুরুষ যত পারিল বিবাহ করিল—পুঁজির উপর পুঁজি বাড়িল—পুরুষের কি? কন্যাকর্ত্তা গৌরব লাভ করিলেন, বরকর্ত্তার অর্থলাভ হইল, সুতরাং লাভ ভিন্ন তাহাদের আর কি? কিন্তু—কিন্তু তাহাদিগকে এইরূপে দুইদিক্ হইতে বলি দিয়া দুইদিক্ হইতে দুইজনে লাভ-প্রাপ্ত হইল—তাহাদিগের দশা কি হইল? কি হইল, তাহা আর লিখিয়া কি বলিব? বিধাতা তাহাদিগের কপালে ছাই পূরিয়া রাখিয়াছিলেন—কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইল। হইল, 'বাসরে সমাধি,' হইল, সধবার একাদশী!' তাহাদিগের সে ভয়ানক দুর্গতির কথা লিখিয়া জানাইতে পারি না। পিত্রালয় বা মাতুলালয় ভিন্ন তাহাদিগের অন্যত্র স্থান নাই, পাচিকা বা পরিচারিকার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য জীবনোপায় নাই। সকলের মন যোগাইয়া, সকলের দাস্যবৃত্তি করিয়া, তদুপরি অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়া, সূর্য্যাস্তগমনের সময় চক্ষের জলের সঙ্গে দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দেওয়া ভিন্ন অন্য সুখ তাহাদের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই। বলিতে লজ্জা করে, দুঃখে ক্ষোভে হৃদয় জ্বলিয়া উঠে—হয়তঃ পাত্রাভাবে কাহারো ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, কাহারো ভাগ্যে বা একবার সেই বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় ভিন্ন স্বামীসন্দর্শন আর ঘটিয়া উঠে নাই—উত্তরসাধক ও জুটিল, হতভাগিনী

কুলভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করিল। কৌলীন্যে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিল। বল্লালরোপিত বিষবৃক্ষে চূড়ান্ত ফল ফলিল!

ধিক্—ধিক্ বঙ্গবাসীর নামে! লোকলজ্জামানভয়পরিপন্থি বৃথাগৌরবগর্ব্বিত বঙ্গের কুলীনসন্তান! নিবিষ্টচিত্তে ধীর মনে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—ভাবিয়া দেখ দেখি, অকিঞ্চিৎকর গৌরব ও অর্থলাভের আশে তুমি কিরূপ মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া জঘন্য পাশব আচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার যে শাস্ত্রবলে, পিতৃগৃহে অবিবাহিতাবস্থায় কন্যা রজঃস্বলা হইলে পিতামাতার নিরয়গামী হইতে হয় *—যে শাস্ত্র বলে, কন্যাদি বিক্রয়ের অর্থ লইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিলে চিরকালের জন্য পুরীষসংকুল হ্রদে বাস করিতে হয় †—যে শাস্ত্রেবলে, যে গৃহে ভার্য্যা অসন্তুষ্টা, ভর্ত্তা ও ভার্য্যায় প্রীতি নাই তাহার ভাল হয় না ‡—তুমি কোন্ ধর্ম্মে—কোন্ যুক্তিমতে এক মাত্র বল্লালকপোলকল্পিত কৌলীন্যের অনুরোধে সেই সকল শাস্ত্র অনায়াসে খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার পশ্বাচারে, তোমার কৌলীন্যের ঘোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দিন দিন কত শত অভাগিনী অকূল পাথারে ভাসিতেছে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাই বলিয়া তাহাদিগের উপর এত নির্য্যাতন করিবার তোমার কিসের অধিকার? তুমি বাচস্পতি, তুমি সামশ্রমী—তুমিসমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাপুরুষ, তাই তুমি এত যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি কন্যা নাই? ভগ্নী নাই? ও শরীর কি রক্তমাংসগঠিত মনুষ্যশরীর নহে? একবিন্দু—একবিন্দু দয়া কি তোমার পাষাণচিত্তে কখনও স্থান পায় নাই? আর, তুমি

---

* মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজঃস্বলাম।
উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতিসার বচন।

† যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজঃ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদ সংজ্ঞকম্। ক্রিয়া যোগসার।

‡ সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্য কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবম্। মনু।

—তুমি হতভাগ্য বেগের গাঙ্গুলি, তুমি মূঢ় কুলদর্পিত ভূপালবংশের দৌহিত্র! তোমায় ও বলি, ঐ যে তোমার এক মাত্র প্রাণসমা কন্যা পুত্র কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিতে করিতে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসাইতেছে—ঐ যে দুঃখিনী ভগিনী নির্জ্জনে বসিয়া স্বামীর জন্য নীরবে রোদন করিতেছে,—আর এই যে একমাত্র জামাতার মৃত্যুতে এককালে ৪।৫ টি কন্যা বিধবা হইয়া ভূমে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতেছে—এ সকল দেখিয়া ও কি মুহূর্ত্তের জন্যও লৌহহৃদয় দ্রবীভূত হয় না! মুহূর্ত্তের জন্যও কি হৃদয়ের মর্ম্মদ্বারে কিছুমাত্র আঘাত লাগে না? কন্যা ও ভগ্নীদিগের জন্য সহস্র ভোগ সহিয়া ও কি এ কুলগৌরব রক্ষার স্পৃহা যাইবে না? কুলগৌরব? কিসের কুলগৌরব? কুলগৌরব কি কেবল আবৃত্তিগুণের জন্য? সে আচার—সে বিনয়—সে সকল গুণ কোথায়? নৈষ্ঠুর্য্য, স্বেচ্ছাচার, পাশববৃত্তি ও পৈশাচিক ব্যবহারের জন্যই কি কেবল কুলীনের কুলগৌরব কল্পিত হইয়াছিল? সাধে কি বলিতেছিলাম, বঙ্গে কুলীনাধিকারের সূত্রপাত হইতেই তাহা বিষবৃক্ষের বীজ রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ বিষবৃক্ষ এ সোণার বাঙ্গালা হইতে কবে উন্মূলিত হইবে? কে বলিবে কবে হইবে? যে দেশের পুরুষেরা এতদূর যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত—এতদূর পশুর ন্যায় স্বার্থপরায়ণ—কন্যা ভগিনী সকলে হাহাকার করিয়া দুঃখাপনোদন জন্য অভাগিনীদিগের একমাত্র ভরসাস্থল ভারতেশ্বরীর নিকট বলিতেছে—

"ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতোনা পতি থাকিতে জীবিত।
পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়।
ঠেলোনা মা রাজমাতা দুঃখী অনাথায়।"—

তবুও—এ সকল শুনিয়া—তবুও যাহাদিগের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য ও বিচলিত না হয়, কে বলিবে কবে এ দেশ হইতে এ জঘন্য প্রথা উঠিয়া যাইবে? নিরক্ষর মূর্খদিগের কথার জন্য বলি না, যে দেশের তর্কবাচস্পতি, সামশ্রমী, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সমাজসংস্কারকগণ আজও বহুবিবাহ রহিত করণের চেষ্টা দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্লেষ করিয়া থাকেন—দেশের আদর্শ এবং চূড়া এই আখ্যাধারী পণ্ডিতদিগের এখনও যখন এই

রূপ প্রবৃত্তি—তবুন কে জানে—কে বলিবে সে দেশ হইতে এ জঘন্য প্রথা কখনও উঠিবে কি না? ধিক্! ধিক্ বাঙ্গালীর সভ্যতায়! ধিক্ তাহাদিগের নিরর্থক বিদ্যার অহঙ্কারে!

কুলীন ভগিনীগণ! বড় মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ বাঙ্গালায় আসিয়া কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছিলে! তোমাদিগের আর উপায় নাই! সমাজ তোমাদিগের উপর খড়্গহস্ত, বন্ধুবর্গ তোমাদিগের কষ্ট বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না, জীবনের এক মাত্র অবলম্বন পিতা বা স্বামী তোমাদিগকে স্ব স্ব লাভের পণ্যদ্রব্য ভিন্ন কিছুই ভাবেন না, বিধাতাও বুঝি তোমাদিগের উপরে বাম! বৃথায় তোমাদিগের রোদন, বৃথায় তোমাদিগের ও করুণ বিলাপধ্বনি! অথবা কাঁদিতেই তোমাদিগের জন্ম, কাঁদিবার জন্যই বাঙ্গালায় আসিয়াছ, আমরণ কাঁদিয়াই ও ছার জীবন কাটিবে। কিন্তু তোমাদের রোদন কে শুনিবে? কে ব্যথার ব্যথিত হইয়া ওই অশ্রুতে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিবে? আর এ অরণ্যে রোদন কেন? কেন!—ধর্ম্ম নাই? ঈশ্বর নাই? যদি ধর্ম্ম থাকেন, ঈশ্বর যদি সত্য হন, নিশ্চয় জানিও, বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটক নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন। নিশ্চয় জানিও, এক দিন তোমাদিগের এ শাপে বঙ্গসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। এক দিন—নিশ্চয় জানিও—এক দিন অবশ্যই তোমাদিগের এই নিদারুণ দুঃখের অশ্রুর জন্য আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত বঙ্গবাসীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভগিনীগণ, কাঁদিও না, কাঁদিতে হয় তো এ পাষণ্ডদিগের সম্মুখে ও পবিত্র অশ্রু নিক্ষেপ করিও না—পাষাণে জলসিঞ্চনে কোনও ফল হইবে না। কাঁদিতে হয় তো একবার সকলে মিলিয়া—ব্যথার যে ব্যথিত, দুঃখের যে দুঃখী—সকল ভগিনীতে মিলিয়া একবার শরণাগতের আশ্রয় সেই দীনবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, দুঃখীর এক মাত্র ভরসাস্থল সেই ভারতেশ্বরীর নিকট এ মনোবেদনা কাঁদিয়া জানাইও। তাঁহার দয়ার শরীর—তাঁহারও স্ত্রীহৃদয়—অবশ্যই তিনি তোমাদের দুঃখ শুনিবেন। একবার সকলকে ডাকিয়া, বাঙ্গালির মুখে কলঙ্ক লেপিয়া, তাহাদিগের বিদ্যার অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, সভ্যতার অহঙ্কার, কুলের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কারের মুখে কালি ঢালিয়া দিয়া সেই ভারতেশ্বরীর কৃপার জন্য বল—তাহা ভিন্ন আর যে তোমাদিগের উপায়ান্তর নাই—বল,—

"আয় আয় সহচরী ধরিগে বৃটনেশ্বরী
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী বিনা কেবা আর!
আয় আয় সহচরী ধরিগে ব্রিটনেশ্বরী
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?"

স্ত্রীবিপ্লব।

কয়েক মাস ধরিয়া দাম্পত্য-দণ্ড-বিধির অতি কঠিন দণ্ড ও নিয়ম সকল আমার উপর জারী হইতেছে—জরীমানা, বেত্রাঘাত, কারাবাস, দ্বীপান্তর, নির্জ্জন কারাবাস, সম্পত্তি-বাজেয়াপ্তকরণ, শেষ মৃত্যু পর্য্যন্তও বুঝি আমার অদৃষ্টে ঘটে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি (দোহাই ধর্ম্মের যদি মিথ্যা বলি) আমার কোন অপরাধ নাই, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি রোজ ঠিক আট্টার সময় হাজির থাকি, কখন উপার্জ্জনের এক পয়সা নিজ খরচ বলিয়া লই না, জজ-বিবি রাত্রে না ঘুমাইলে ঘুমাই না, বাছিয়া বাছিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের বই হইতে সম্বোধন-পদ সংগ্রহ করি; তবুও আমার উপর এই সকল কঠিন আজ্ঞা! মনে করিলাম, পূর্ব্ব জন্মে হয়ত কোন দিন পূজার সময়ের ঢাকাই সাড়ী মনোমত হয় নাই—অতএব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলাম। মিলের Subjection of Women পড়িয়া শুনাইলাম, দাম্পত্য-অত্যাচারের Passive obedience প্রিচ করিয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলাম। কলম্ পিসে খাই, সুতরাং বই পড়া বা লেখা ছাড়া অন্য প্রায়শ্চিত্ত জোগায় না। কিছুতেই পাপ গেল না। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভরত শিরোমণি, মহেশ ন্যায়রত্নের নিকট ব্যবস্থা লইয়া নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ক্রমেই কঠিন দণ্ড আজ্ঞা

হইতে লাগিল। হাজার হ'ক, পুরুষ বাচ্ছা—রোক একটু আছে। দাম্পত্য-বীজক সমাজের উন্মূলন করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই দিনই টাবাবেড়ে ওয়ার্লড এসোসিয়েশন নামে একটী সভা স্থাপন করিলাম (পাঠক হাসিবেন না, কলিকাতায় জন আষ্টেক লোক যদি ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন করিতে পারে, তবে টাবাবেড়ে আমরা ওয়ার্লড আসোসিএশন কেন করিতে না পারিব? এখানেও ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিস আছে, প্রাইমেরি ইস্কুল আছে।) প্রথম বক্তা আমি, আমার বিষয় স্ত্রীদমন—স্ত্রীর উপর পুরুষের যে সহজ স্বত্ব ও দেশীয় আইনের স্বত্ব আছে তাহার ব্যবহার করা, আর দাম্পত্য-দণ্ড-বিধি উঠাইয়া দেওয়া। আমার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই চারু বাবু—টাবাবেড়ের গ্লাডষ্টোন—আপনার স্ত্রীর গাঢ় আলিঙ্গন লাভ পুরস্কারের লোভে স্বজাতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ নীতিবিরুদ্ধ যত বিরুদ্ধ হইতে পারে তত বিরুদ্ধ বক্তৃতা ছড়াইলেন। আমার এত বড় মানব-মঙ্গল কার্য্যে একেবারে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। হতাশ্বাস হইয়া বাড়ী গেলাম। এত কাল নিরপরাধ ছিলাম, আজ রাজবিদ্রোহ অপরাধ—ঝাঁটা লাথি প্রভৃতি পড়িতে লাগিল. বিব্রত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। নানা যন্ত্রণায় অনেক দেরিতে নিদ্রা আসিল। সেও সুষুপ্তি নয়, স্বপ্নমাত্র। যে সকল স্বপ্ন তাহার একটী দেখিলে আমি ত আমি, আমার চৌদ্দ পুরুষের প্লীহা চমকাইয়া উঠিত। আমি তো সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যদি সত্যি ঘরের মাথা কাটা যায়—দাম্পত্য-দণ্ড-বিধি তবুও বরং ভাল; কিন্তু—বাবা! মেয়ে মানুষকে অপমান করা তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা কিছু নয়! উহাতেই মহাপ্রলয় ঘটে। চখের উপর দেখিলাম, ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া ঘটিল তাহাও দেখিলাম।

একবার নিদ্রা আসিতেছে আবার ভাঙ্গিতেছে, এই অবস্থায় একবার যেই চক্ষু মুদিয়াছি, অমনি বোধ হইল—স্ত্রীবিপ্লব। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাচি ক্ষেত্রে এক দিকে সমস্ত পুরুষ ও আর এক দিকে সমস্ত স্ত্রীলোক। স্ত্রীশিবির সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ ফিট ফাট, রসদ প্রস্তুত—রণসজ্জা প্রস্তুত—ঢাল তলোয়ারাদি প্রস্তুত—সব প্রস্তুত! পুরুষদিগের শিবিরে সব গোলযোগ—কেহ কাঁদিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে।

দেখিলাম, ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসী জর্ম্মাণ পারসী চীনে সব একত্র হয়েছে, আজ আর Blackniger নাই। যেন কোন একটা ভীষণ বিপদ্‌পাতে জগৎশুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সুরেন্দ্র বাড়ুয্যেকে বলিতেছে—দাদা রক্ষা কর! কেহ বলিতেছে "কি হবে! কি হবে!"কেহ বলিতেছে"বাবা ওদের নহিলে চলে না, কেন চটাচ্চ" কেহ বলিতেছে 'নাহে না বোঝ না, একটু গরম হওয়া চাই বই কি?"কেহ বলিতেছে "নাও ওরা হ'ল, আদ্যাশক্তি ওদের কাছে আবার গরম!" কেহ বলিতেছে "মেয়ে মানুষকে আমাদের উপরে হইতে দিব না, উহারা নীচেই থাকিবে।" এক জন বলিতেছে যুদ্ধ ত দশ জন বলিতেছে যুদ্ধ নয়—সন্ধি। যে কোন সরতে হয় এখন মিটলে বাঁচি। তখন বিষমার্ক চক্ষুর পাতা তুলিয়া বলিলেন "আচ্ছা—দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—একটা সভা কর।" অমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধির ধান্যপেশন যন্ত্রের পাশে সবে মিলিয়া দাঁড়াইল। এমনি ভিড় হইল যে, সমস্ত বেলজিয়ানেরা চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল। তখনি 'রক্ষাকর রক্ষাকর! বাবা, যুদ্ধ নয় সন্ধি কর,গিন্নি সব খাবার ঘরে নিয়ে গেছে,বাবা,পেটের জ্বালায় মলুম'—চারি দিক্ হইতে এ প্রকার ভয়ানক একটা গোল উঠিল। সে গোলে কাণ ঝালা পালা হইয়া উঠিল। কেদারা মনুষ্য (চেয়ারমেন) 'নিয়ম নিয়ম" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। সভার নিয়মাবলীর চতুর্থ রুলের পঞ্চম পদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না! শেষ অনেক বৃথা উদ্যমের পর বিনা তর্কে চীৎকারের চোটে স্থির হইল, সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, সিবিলসার্বিস্, মিলিটারি সার্বিস্, উকীলি, ডাক্তারি, চিকিৎসিত কর্ম্ম, অচিকিৎসিত কর্ম্ম, সব উহাদিগকে খুলিয়া দিব, নামের শেষে আকার বা দীর্ঘ ঈকার না থাকিলে রাজা, অমাত্য, বা কাউনসিলের মেম্বর হইতে পারিবে না। ইত্যাদি।

এই সন্ধিপত্র লইয়া যখন সারফ্রান্সিস্‌শূয়ার এম ডি, মাদম লোরি বিদ্রোহিনীদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল। হাহাহা! এত দিন কি নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইতে ছিলেন? এত দিন এরূপ সর্ত্তে রফা হইতে পারিত, এখন আর হয় না। আমরা

আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না, এই বার আল্টিমেটাম পাঠাই, জবাব আসিলেই হয় সন্ধি, নয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই আমাদের শেষ কথা। পুরুষ জাতি যদি সার্ফ হয়, আমাদিগকে লর্ড বলিয়া মানে, আমাদিগের বাধ্য হয়, আমাদিগকে কখন দ্বিরুক্তি না করে, আর সন্তান প্রসবের সম্পূর্ণ ভার আপনারা গ্রহণ করে তবেই সন্ধি হবে।

জবাব আসিল, আমরা সব হইতে পারি। দাস হইতে পারি, সার্ফ হইতে পারি, স্লেভ্ হইতে পারি, কখনও অবাধ্য হইব না, কখনও উচ্চ কথা বলিব না, কুর্নিস্ ব্যতিরেকে নিকটে পঁহুছিব না, গা টিপিয়া দিব, পায় হাত বুলাইব; কিন্তু যাহা স্বভাবের নিয়ম তাহা কি প্রকারে ব্যতিক্রম করিব? পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া দেবীদিগের দুই বৎসরে তিনবার যে অসহ্য প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে হয়, আমরা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিতাম, যদি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিত। অতএব কেবল ঐ এক সর্ত্ত ছাড়া আর সকল বিষয়েই আমরা স্বীকার।

তখন স্ত্রীলোক মহলে যুদ্ধসভা আহ্বান করা হইল। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বলিলেন—আইস, আমরা আমাদিগের জাতিসিদ্ধ কটাক্ষ, ইঙ্গিত, অশ্রু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা উহাদিগকে কায়দা করি। তখন মিস্ হরিমতী বলিলেন, না-না, আর কায়েদা করিয়া কাজ নাই। কাছে থাকিলেই সন্তান প্রসব করিতে হইবে—সে বড় যন্ত্রণা। তখন কেদারানারী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ফ্রেন্স মাদমেরা অগ্রগামিনী পদাতিনী সাজিলেন। ইংরাজ মিসেরা অশ্বারোহিণী হইলেন। জার্ম্মানিরা তোপখানার অধিষ্ঠাত্রী হইলেন। ইতালীয়ারা পটি ও মলম লইয়া সৈন্যগণের পশ্চাৎ চলিলেন। মুসলমানীরা তাম্বুরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। হিন্দুনীরা দলের পশ্চাদ্ভাগে রসদ যোগাইতে লাগিলেন। চিনানীরা আবগারি মহলের কর্ত্তৃকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ব্রাহ্মিকারা মৃত পুরুষ, আর আমেরিকানীরা মৃতনারী সমাহিত করিবার নিমিত্ত ভার পাইতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মিকাদিগের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। কারণ, কয়েক মাস অবধি দৃষ্ট হইতেছিল উহারা অন্তরে অন্তরে শত্রুর সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছে। হুকুম হইল, উহারা

হিন্দুনীদিগের সহিত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে থাকুক। হিন্দুনীরা উহাদিগের উপর যেন নজর রাখে। ইতি উদ্যোগ-পর্ব্ব।

তখন সমস্ত উদ্যোগ হইলে পর ফৌজ কুচ করিবার হুকুম হইল। ফরাসিনীগণ বিদ্যুদ্বেগে প্রবল বাত্যার ন্যায় পুরুষসৈন্য ভেদ করিয়া একেবারে তাহাদিগের ছাউনি দখল করিল। পুরুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত শত শ্মশ্রুশোভিত আস্ফালিতগুম্ফ হুঙ্কারগর্ভ আরক্তলোচন দষ্টাধর আলোলিতকেশ অর্থাৎ টেরিশূন্য মস্তকে ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। শোণিতপ্রবাহে নদী বহিতে লাগিল। বৃটানীরা পিশাচিনীর ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই রক্ত কর্দ্দমে ঝাঁপ দিয়া প্রলয়কাণ্ড বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন অবশিষ্ট পুরুষেরা একত্রিত হইয়া নারীপূজা আরম্ভ করিল। স্তূপাকৃতি ধূপধুনা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। পুষ্প চন্দন গন্ধ ইকয়েটরিয়ান মারুতে প্রতাড়িত হইয়া কেন্দ্রপ্রবাহে (Polar-current) আনীত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। নৈবেদ্যের আয়োজনের কথা অনির্ব্বচনীয়! পাঠক মহাশয়েরা কল্পনাবলে যত দূর পারেন মনে করিয়া লউন। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তায় পেটুকচূড়ামণি, জিহ্বাগ্রে লালা সম্বরণ করিয়া সে বর্ণন আমার সাধ্যাতীত! পুরুষেরা নারীদিগের স্তব আরম্ভ করিয়াছে। কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি ত আছেই, তাহার উপর হার্ম্মোনিয়া, পিয়ানো, এস্‌রাজ প্রভৃতিও বাজিতেছে। ভুলিয়াছিলাম, এই সকল পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া অরিনকো সমতলক্ষেত্রে নারীপূজা আরম্ভ করিয়াছে। নারীগণ জয়লাভ করিয়া প্রাচিক্ষেত্র ত্যাগ করত উহাদিগের অন্বেষণ করিতেছিল। শেষ যখন অরিনকোক্ষেত্রে উপস্থিত, ধূপধুনা নৈবেদ্যের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। এক জন আর একজনকে বলিল—"এ কেমন যুদ্ধ লো!" অমনি শুনিতে পাইল, পুরুষেরা স্তব করিতেছে—তাহার ধ্বনি সমস্ত বাদ্যযন্ত্রধ্বনি অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে—তাহা ভক্তিভাবে পূর্ণ, স্নেহপ্রস্থ ও প্রেমঘর্ঘর।

সে স্তব এই—হে তরুণসকলমিন্দোর্বিভ্রতীশুভ্রকান্তিং স্তনভারনমিতাঙ্গী রমণীগণ! হে ঘনপীনপয়োধরভারনতে রমণীমণ্ডলি! আমরা অপরাধ করিয়াছি। হে মন্মথচূতমঞ্জরিশ্রবনায়তচারুলোচনে সীমন্তনি! আমাদিগকে

মার্জ্জনা কর। হে বরাভয়দাত্রে! আমাদিগকে বর ও অভয় দাও। শুনিয়াছি, যত্রাকৃতি স্তত্র গুণা বসন্তি। কিন্তু হে চারুভাষিণি! মধুরভাষিণি! সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থসাধিকে! শরণ্যে! আমরা শরণাগত, আমাদিগের প্রতি কেন কঠিন হও? হে গৌরবর্ণে সুরূপে সর্ব্বালঙ্কারাভূষিতে! আমরা ভীত হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর।

যখন উহারা স্তবের শেষ পদ পাঠ করিতেছিল, তখন একটা বিড়ালাক্ষী, উন্নতঘোনা বিকটবদনা, রৌদ্রদগ্ধবরণা, ফরাসিনী মার্সালানী উহাদিগের সম্মুখে। তাহার গায়ে একখানিও অলঙ্কার নাই, পুরাতন ছিন্নবসনে যুদ্ধের রক্ত কর্দ্দম জমাট হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল বুঝি, তাহারই জন্য এই পূজার আয়োজন হইয়া রহিয়াছে। ইহারা বুঝি তাহাকেই গৌরবর্ণা সুরূপা সর্ব্বালঙ্কারাভূষিতা বলিয়া আহ্বান করিতেছে। ভাবিয়া, সে মাগী পুরুষদিগের দলে ঢুকিল, এবং জাতীয়-স্বভাবসুলভ সৌজন্য-সহকারে তাহাদের সহিত (শত্রু হইলেও) কথা কহিতে লাগিল। বলিল—"শুদ্ধ আমায় পূজা করিলে কি হইবে? তোমরা প্রসবের ভার গ্রহণ কর, আমরা সন্ধি করি।"

দূর হইতে মিস্ হরিমতী দেখিল, একটা মার্সালানী পুরুষের দলে ঢুকিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সদল বলে আসিয়া অগ্রেই বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া সে হতভাগিনীর শিরশ্ছেদ করিল। তখন পুরুষগণ 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া হরিমতীর পায়ে জড়াইয়া পড়িল। হরিমতী বলিল—পাপিষ্ঠগণ, এখনও আমাদের সাম্য দিতে রাজি নহিস্, এখনও প্রসবের কষ্ট আমাদের দিতে চাস্, আবার পায়ে পড়িলে দয়া করিব?"—যেমন এই কথা বলা, তেমনি অসি-আস্ফালন। শত শত পুরুষ সে অসির প্রচণ্ড আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইল। অবশিষ্টগণ প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া পানামা যোজক পার হইয়া পড়িল। হরিমতীও ছাড়িবার পাত্র নহেন, সমস্ত দল সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ধাবমানা। স্ত্রীসৈন্য পানামা পঁহুছিয়া দেখিল, খোজারা পথ আটকাইয়াছে। তাহারা কনষ্টাণ্টিনোপলে বসিয়া দেখিল, সব স্ত্রীপুরুষ লড়াই করিতে চলিয়া গেল, তাহারা নিরাশ্রয় ভাবিয়া নৌকা ও জাহাজ চড়িয়া পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইল।

শেষ পানামা যোজকে আজ বিজয়িনী হরিমতীর সাক্ষাৎ পাইল। উহারা সমস্ত অবগত হইয়া হরিমতীকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিল। সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া হরিমতী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। খোজারা সুলতানের বালাখানার তৈয়ারি বিন্দু বিন্দু তৈল দিয়া হরিমতীর লাঙ্গুলে স্থূলত্ব সম্পাদন করিয়া দিল। তখন হরিমতী বলিল—"আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে ৫০ বৎসরের জন্য Truce করিব। বিষুবরেখার উত্তরে পুরুষ আর দক্ষিণে মেয়ে মানুষ থাকিবে। মধ্যে বিষুব রেখায় খোজারা গার্ড থাকিবে। কোনও পুরুষ কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে আসিলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।"

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ!! ৫০ বৎসর স্ত্রী পুরুষে মুখ দেখাদেখি থাকিবে না!—আমার বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল। স্বপ্ন না সত্য? বিবেচনা করিয়া দেখিলাম স্বপ্ন। সত্য নয় স্বপ্ন বটে। প্রাণ একটু স্থির হইল। কতক্ষণ পরে আবার ঘুম আসিল। আবার স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, ৫০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, খোজারা সব মরিয়া গিয়াছে, কেবল জন আষ্টেক স্ত্রীলোক আর জন সাতেক পুরুষ আছে—পৃথিবী বনে পূর্ণ হইয়াছে, একমাত্র হরিমতী অশ্বারোহণে বিষুবরেখায় ঘুরিয়া গার্ড দিতেছে। ঘুম ভাঙিল। প্রলয় আর কাহাকে বলে? রমণীকুল কোমলা অবলা সরলা কুলবালা বটে, কিন্তু বিশ্বাস নাই—একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই প্রলয় সেই মুহূর্ত্তে। কেমন করিয়া সে প্রলয় সংঘটিত করিয়া থাকেন তাহাও সেদিন স্বপ্নাবস্থায় দেখিলাম। তার পর জাগ্রতাবস্থায়ও অনেক দিন অনেক গৃহে সে প্রলয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। দেখিয়া জ্ঞান হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণ গেলেও আর কখন খোঁপাধারিণীর অবাধ্য হইব না। পাঠকবর্গও সাবধান!

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি?

(১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞান ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কার্য্য নাই। এই আকাঙ্ক্ষা ও তদানুষঙ্গিক কার্য্য আবার বিশ্বাসভিত্তির উপর গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিশ্বাস যদি জ্ঞাননিয়ন্ত্রিত ও ভূয়োদর্শন দ্বারা সাব্যস্ত না নয়, তাহা হইলে, তাহা অপ্রামাণিক হইয়া উঠে; সুতরাং লোকের তাহা অগ্রহণীয় হয়। অতএব এ জীবনে আমরা কিসের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, এবং আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যই বা কি, ইহা অবধারণ করিতে হইলে আমাদের জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত তাহা স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু জ্ঞানের ব্যাপ্তি নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ কি এবং জ্ঞানের উদ্ভব হয় কি প্রকারে সে সকল বিষয় বুঝিতে হইবেক। অপিচ, মনের আধেয় বস্তু গুলি কি কি ও তাহাদের কার্য্য প্রকরণই বা কিরূপ তাহা জানিতে পারিলেই জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে এবং জ্ঞানের জন্ম হয় কিরূপে তাহা ও নিরূপিত হইবে। সুতরাং আমাদের জ্ঞানের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণ করিতে গেলে মনস্তত্ত্বে আসিয়া পড়িতে হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেহতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে মনস্তত্ত্বের মূলব্যাখ্যা-বিষয়ক দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের প্রস্তাবের উপসংহারে অগ্রসর হইব।

আমরা সচরাচর 'মন' শব্দ এইরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি যে, দেহে মনের নিবাস এবং দেহের সহিত মন ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইলেও মনের যেন একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, যেন মন দেহে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। শারীর যন্ত্রের সহিত যেমন শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ, মন ও মানসিক বৃত্তি সমূহ সেইরূপ বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দেহ

বলিলে যেমন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সমষ্টিকে বুঝায়, সেইরূপ মন মানসিক-বৃত্তিসমূহের সমষ্টির নাম মাত্র। মন বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু নাই। কিন্তু দেহের সহিত মনের ইহা অপেক্ষা আরও একটু নিকটতর সম্বন্ধ আছে—দেহ ও মন আরো একটু নিগূঢ়সূত্রে আবদ্ধ। অন্ততঃ কোন কোন মানসিক অবস্থা যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া-সংঘটনের উপর নির্ভর করে—একথা সকলেরই জানা আছে। চক্ষু ভিন্ন যে দর্শন হইতে পারে না, এবং কর্ণ ভিন্ন যে শ্রবণ অসম্ভব ইহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। চক্ষু ও কর্ণ দৈহিক যন্ত্র, দৃষ্টি ও শ্রুতি মানসিক বিকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা মনের বিষয় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি যে, মন উপলব্ধি নিচয়ের সমষ্টির (Collection of Perceptions) নাম মাত্র। মানসিক বৃত্তি সমূহ উপলব্ধি হইতে জনিত। মনের ভিতর ইহা ব্যতীত অন্য কিছু আছে কি না, বা থাকিতে পারে কিনা তাহা আমরা জানি না,—তাহা জানিবার অধিকার বা উপায় ও বুঝি নাই। একটি পাখি উড়িতেছে দেখিয়া বুঝিলাম যেমন, উহার উড়িবার শক্তি গতিশক্তির সমবায় মাত্র, এবং সেই শক্তি উহার পক্ষস্থ পেশীর আণবিক গতির প্রকৃতিতে নিহিত ছিল; বুঝিলাম যেমন, ইহার প্রথমটি কার্য্য-ফল, দ্বিতীয়টি কারণ স্বরূপ—সেইরূপ,অন্তর্দৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করিলেই বুঝিতে পারি, মনের উপাদান-ভূত এই যে উপলব্ধি সমষ্টি—ইহাও মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ পরমাণু সমূহের পরিবর্ত্তের ফল মাত্র। উপলব্ধিগুলি কার্য্যফল, পরিবর্ত্তটুকু কারণ। তাহা হইলেই দেখ, মনের বিষয়ে ও আমরা যাহা কিছু জানি, তাহাও মাত্র পরমাণু সমষ্টির কার্য্য বলিয়া জানি। যে সংজ্ঞা মস্তিষ্কের আণবিক চঞ্চলতার ফল,সেই সংজ্ঞা হইতেই উপলব্ধি সমূহের উৎপত্তি। উপলব্ধি সংস্কার ও ভাবনা (Impressions and Ideas) এই দুই ভাগে বিভক্ত। এতদুভয়ের সঙ্গতি হইতেই জ্ঞানের বিকাশ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্বেচ্ছাশক্তি ও যুক্তিশক্তির প্রদর্শিত পথ অনুবর্ত্তন করিয়া মানবমণ্ডলী পরম্পরাগত এই বর্ত্তমান শতাব্দীর অসীম সুখরাশি উপভোগ করিতেছে। কিন্তু সেই যে স্বেচ্ছাশক্তি ও

যুক্তিশক্তি—তাহাদিগের নিয়ন্তা কে?—জ্ঞান। যে জ্ঞানের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, সেই জ্ঞান। জ্ঞান আবার আকাঙ্ক্ষার জন্মদাতা। আকাঙ্ক্ষা অভাব-পূরণেচ্ছার নামান্তর মাত্র। জগতের যাবতীয় জীব এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, মনুষ্য পৃথিবীস্থ অপরাপর পদার্থ হইতে কোন ও পৃথক্ উপাদানে নির্ম্মিত নহে। সেই ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম—সেই চতুঃষষ্টি ভূত—সেই পরমাণু-সংহতি। তবে, বহুশক্তিসমাবেশ হেতু মনুষ্য জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। প্রভেদ পরিমাণে, প্রকারে নহে। সুতরাং সংক্ষেপতঃ জীবমাত্রেরই উদ্দেশ্য যাহা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও যে সেই ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, জীবমাত্রেই অভাবপূরণ জন্য নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদিগের উদ্দেশ্য কেবল আহারান্বেষণ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ। প্রকৃতি যেন অবিরাম তারস্বরে এই আদেশ উদ্ঘোষিত করিতেছেন আর তাহারা অবনতমস্তকে প্রতিনিয়তঃ উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে এই ক্ষমতার বিরাম—এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগের অস্তিত্বলোপের সূত্রপাত হইতেছে। মনুষ্যজীবনে ও অবিকল তাহাই। সদ্যঃপ্রসূত শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই অভাবপূরণে ব্যস্ত। শিশু কাঁদিতেছে, হাত পা নাড়িতেছে—কিসের জন্য? অভাবপূরণ জন্য। বালক দৌড়িতেছে—পড়িতেছে—আবার উঠিতেছে, পিতার জানুদেশ ধরিয়া নূতন কিছু দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে—"ও কি বাবা?"—নূতন কোন ঘটনা ঘটিলেই "এ কেন হয়, বাবা?" বলিয়া শত প্রশ্ন করিতেছে—এসকল করে কেন?—অভাবপূরণাভিলাষে। যুবা গ্রন্থকীট হইয়া অর্দ্ধরাত্র জাগরণে শরীর পাত করিতেছে, বৃদ্ধ আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছে—কেন? সেই অভাবপূরণবাসনায়। অবস্থাভেদেও এ ইচ্ছার তারতম্য নাই। মানুষ প্রথম অবস্থায় তরুকোটরে বাস করিত, আম মাংস ভোজন করিত, বৃক্ষবল্কলে গাত্রাচ্ছাদন করিত—তখন ও যে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া; আর আজ এই যে তাহার সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস, সুখসেব্য আহার, সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছা-

দন—ইহাও সেই প্রবৃত্তির প্ররোচনায়। এই অভাব পূরণে বা শক্তি সমূহের স্বাধীন আচরণেই সুখ। সেই সুখলাভই সকল অবস্থায় সকল লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবার অন্যদিকে দেখ, জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কারণ ব্যতীত বিদ্যুৎ হাসে না, মেঘ ছুটেনা, বৃষ্টি পড়ে না, বজ্র গর্জ্জেনা। কারণ ব্যতীত বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অঙ্কুরে বৃক্ষ জন্মে না, বৃক্ষ দিব্যসাজে সাজে না—ফুল ফল প্রসব করে না। কারণ ব্যতীত পাখী উড়িতে পারে না, পশু পশুকে ধরিয়া খায় না, মানুষের প্রাণ পরের জন্য কাঁদে না। এ পৃথিবীতে কারণ ব্যতীত কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মনুষ্যজীবনের ও কারণ আছে ইহা নিঃসংশয়। আবার, কারণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজনির্দ্দিষ্ট কার্য্য নিরন্তর সংসাধন করিতেছে। কারণ থাকিলেই উপযুক্ত অবস্থায় কার্য্য ঘটাইয়া দিতেছে। অতএব, আমাদের জীবনের যে কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে ইহা স্থির, এবং যাহা আছে কাহাও কার্য্য কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মনুষ্যজীবনের কার্য্য আকাঙ্ক্ষার অনুগামী। আকাঙ্ক্ষা অভাবপূরণেচ্ছা। এই ইচ্ছা কোনও বাধা না পাইলেই কার্য্যে পরিণত হয়। সুতরাং অভাব পূরণ হয়। অভাব পূরণ হইলেই পরিতৃপ্তি জন্মে। পরিতৃপ্তি অর্থে সুখ। অতএব আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সেই অভাবপূরণ অথবা সুখ!

ঐ যে সংসারত্যাগী উদাসীন যোগীপুরুষ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিমীলিত-নেত্রে আত্মাপরমাত্মার সঙ্গতিসুখ উপভোগ করিতেছেন, উনিও যেমন সুখের ভিখারী; আর এই যে দীনাত্মা নরপশু সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া প্রকাশ্য পথে বা রঙ্গরঙ্গভূমে উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিতেছে, সেও তেমনি সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। তবে, প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ মাত্র। এইখানে যুক্তিশক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তির সদ্ব্যয় ও অপব্যয়ের কার্য্য সুন্দররূপে প্রতিভাত হইতেছে। একজন উক্ত বৃত্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর একজন তাহাদের বিরোধে স্বেচ্ছাশক্তির ভরা মস্তকে করিয়া পশুত্বে পরিণত হইয়াছে।

কার্য্যমাত্রই শক্তিবিকাশের নামান্তর মাত্র। এই শক্তি সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারিলেই পূর্ণসুখ। বিরোধে ক্ষণিক সুখ, কিন্তু স্থায়ী দুঃখ। কেন না, একটি শক্তির অভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না, সুতরাং প্রকৃত সুখের ব্যাঘাত ঘটে। আবার, মনুষ্য বংশবৃদ্ধি হেতু বাধ্য হইয়াই সামাজিক জীবে পরিণত হইয়াছে এবং সেই জন্য পরমুখাপেক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং নিজের সুখ অব্যাহত রাখিতে গিয়া পরের সুখের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছে, সামাজিক সুখ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইয়াছে অর্থাৎ স্বার্থের সহিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্যবিধানে যত্ন করিতে হইতেছে। কিন্তু, স্বার্থের সহিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। পদে পদে স্বাতন্ত্র সুখের সহিত সামাজিক সুখের সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা। সেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই পূর্ণ সুখের মূলে কুঠারাঘাত হয়। ঈপ্সিত ফললাভ ঘটিয়া উঠে না। অতএব, যদি বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় পূর্ণ সুখ পাইতে হয়, সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য না করিয়া অপরের সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিতে হইবে। সুতরাং স্বার্থের মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রীতিকেই জীবন কার্য্যের *একমাত্র সহায় করা কর্ত্তব্য। প্রীতি ভিন্ন অন্য কোনও তার হৃদয়কে অপ*রের সহিত একীভূত করিতে পারে না। এই বিশ্বজনীন প্রীতিই কি স্বকীয় কি সামাজিক উভয় শক্তি সামঞ্জস্যের পত্তনভূমি, এবং প্রকৃতি ইহারই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, ইহাই পূর্ণসুখ ও প্রকৃত উন্নতির একমাত্র বর্ত্ম—ইহাই সামাজিক উন্নতি ও পূর্ণসুখের সুবর্ণসোপান। প্রকৃতির লৌহময়ী বাক্যে যাহারা কর্ণপাত না করিবে, যুক্তিশক্তির প্রাধান্য যাহারা না বুঝিবে, যাহারা আংশিক সুখের আশায় স্বেচ্ছাশক্তির অনুসরণ করিবে—তাহাদিগের পতন অনিবার্য্য। প্রকৃতির একজনের প্রতি যে কঠোর নিয়ম, জাতি-সাধারণ সম্বন্ধে ও সেই নিয়ম অব্যর্থ। তাই বলি, যদি সুখ চাও—সুখ চায় না কে? এ জগৎসংসারে সকলেই সুখের ভিখারী!—যদি প্রকৃত সুখের অভিলাষী হও—যদি পূর্ণসুখ উপভোগে ইচ্ছা থাকে, তবে ভালবাস। আপনা ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া পরকে ভালবাস। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া প্রাণ দরাজ করিয়া

আত্মীয়, স্বজন, স্বদেশ—ক্ষমতা থাকে—সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাস। নিশ্চয় জানিও—আবার বলি—নিশ্চয় জানিও, এই বিশ্বজনীন প্রীতিই বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ণ সুখের একমাত্র প্রসূতি—সামাজিক উন্নতির ক্ষেমঙ্করী কল্যাণময়ী জননী।

সুহাসিনী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্পোদ্যানে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উত্তরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা।—— তিলোত্তমাসম্ভব।

শেষ রাত্রের চাঁদ তখনও আকাশে হাসিতেছিল। ভীতমনে ব্যাকুল-চিত্তে গিরিবালার নিকট হইতে পলাইয়া বিনোদ তখনও ধীরে ধীরে চলিতেছিল। মাথার উপর অনন্ত আকাশ, অনন্ত আকাশে অনন্ত সুধার হাসি, হৃদয় মধ্যে ও অনন্ত চিন্তা—বিনোদ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার গমনে বাধা দিবার আর কেহই ছিল না। কেবল একটা কুক্কুর পথ-পার্শ্বস্থ ভস্মস্তূপ হইতে একবার উঠিয়া কাণ ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া হাই তুলিয়া আবার শয়ন করিল, কেবল একটা গাভী পথের এক পার্শ্বে নীরবে চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কদাচিৎ কেবল একটা বৃহৎকায় বাদুড় সমস্ত রাত্রি আহারান্বেষণের পর মাথার উপর দিয়া পাখা নড়িতে নড়িতে বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিল—তাহার গমনে বাধা দিবার কেহই ছিল না। বিনোদ চলিতে লাগিল। সম্মুখেই এক পুষ্পোদ্যান। নানা বর্ণের নানা

জাতীয় পুষ্পে সে উদ্যান হাসিতেছে। সেই পুষ্পোদ্যানে সেই সকল অসংখ্য পুষ্পরাশির মধ্যে একটি পুষ্পময়ী বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা আপন অতুল দেহপ্রভায় শোভিতেছে। গতি রোধ হইল। বিনোদ আর চলিতে পারিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া শুনিল, অপ্সরাকণ্ঠগীতিবৎ —স্বর্গীয় বীণাঝঙ্কারবৎ সে বালিকা গাহিতেছে—

হাসত মধুরে মোহন হাসি বিধুশালিনি সুন্দর যামিনি—ও।
নীলাম্বরতলে গিরই সুধা চিতরঞ্জন চন্দ্রমা হাসত—ও।
তারকা-সুন্দরী হাসত সকলে, ফুলরঙ্গিনী হাসত মঞ্জুল—ও।
কৈছনে ভুলব সা মধুহাসি, মরি, খেলত যা চারু-আননে—ও।
পেখলি' অবহুঁ সোসম সবকো পুলকাতীব পূর্ণিত মোদনে—ও।
তেঁই রে যামিনি! সাধই তুঝে হাস যাবত সূরয না উদে—ও। *

গীত থামিল। গীত থামিল কিন্তু গীতের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের যে বক্ষঃ-বেপন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা থামিল না। বিনোদ বুঝিল, এ কাহার কণ্ঠস্বর। বুঝিল, অতুলকণ্ঠসম্পন্না এ পুষ্পময়ী বালিকা কে। বিনোদ চিনিল সুহাসিনী। যাহার জন্য এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত যন্ত্রণাভোগ—এ সেই সুহাসিনী! বক্ষঃবেপন দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু আর পারিল না। কাহার পদধ্বনি হইল—কে আসিল। নিকটস্থ এক কামিনীঝোপের অন্তরালে বিনোদ লুকাইল।

যে আসিল সে বলিল—"দিদি, তুমি কখন উঠিয়া আসিয়াছ? এখনও যে ভোর হয় নাই!"

সুহাসিনী কিছুই উত্তর করিল না। ইতিমধ্যে সে আপন মনে আবার সেই গান ধরিয়াছিল, এ সকল কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই।

আগন্তুকা আরো নিকটে গিয়া বলিল—"দিদি বাড়ি এস। তুমি এখানে একা বসিয়া ও কি গাহিতেছ?"

সুহাসিনী পশ্চাতে ফিরিল; দেখিল, প্রিয়ম্বদা। বলিল—প্রিয়ম্বদা, আজ কেমন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে দেখিয়াছ?

প্রি। দেখিয়াছি। কিন্তু, চাঁদ অপেক্ষা আমি তোমায় দেখিতে ভালবাসি। দিদি, চল বাড়ী যাই।

* রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ

সু। দেখ, কেমন এই ফুল গুলি হাসিয়া হাসিয়া চাঁদের আলো ধরিবার জন্য দুলিয়া পড়িতেছে! প্রিয়ম্বদা, এ সকল দেখিতে কি তোমার ইচ্ছা যায় না?

প্রি। ইচ্ছা যায়। কিন্তু মালতী যে ডাকিতেছে।

সু। মালতী! সে আবাগী আমার পাখীটি কোথায় রাখিয়াছে, আসিবার সময় এত খুঁজিলাম, পাইলাম না। প্রিয়ম্বদা, তুমি আমার পাখীটি আনিয়া দিবে, ভাই?

প্রি। আনিতে পারি; কিন্তু পাখী লইয়া এখন কি হইবে?

সু। এই গানটি তাহাকে শিখাইব। সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে এই গান গাহিবে।

প্রি। বাড়ী যাইবে না?

সু। চাঁদ ডুবিলে যাইব।

প্রি। তবে ব'স, আমি আসিতেছি।

প্রিয়ম্বদা চলিয়া গেল। সুহাসিনী আবার সেই মধুর কণ্ঠে মধুর গীত ধরিল।

মাস মাস করিয়া বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এক বৎসরের পর আর এক বৎসর ও যায়, সুহাসিনী চারুর কোন ও সংবাদ পায় নাই। যে চারুকে এক দণ্ড না দেখিলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইত, সেই চারুর সঙ্গে আজ দুই বৎসর সাক্ষাৎ নাই। সুহাস চারুর জন্য ভাবে। বালিকা তাহার এক মাত্র ভালবাসার খেলিবার সঙ্গীকে না দেখিতে পাইলে যেরূপ ভাবে—সুহাস চারুর জন্য সেইরূপ ভাবে। বালিকার খেলিবার সঙ্গীর মধ্যে দুই ছিল—এক চারু, আর এক ফুল। এখন চারু নাই, বালিকা সর্ব্বদা ফুল লইয়া থাকে। নির্জ্জনে বসিয়া ফুল তুলে, মালা গাঁথে—আবার সে মালা রাখিয়া চারুর জন্য ভাবে। বৃদ্ধ সতীশচন্দ্র কন্যার এ ফুলপ্রিয়তা দেখিয়া আদর করিয়া তাহাকে 'বনদেবী' বলিয়া ডাকিতেন, আদর করিয়া তাহার জন্য বিশ্বেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে এই পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ উদ্যানের ন্যায় এত ফুল অন্যত্র কোথায়ও আর ফুটিত না। সুহাসিনী মাঝে মাঝে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া এই উদ্যানে বেড়াইতে আসিত।

রাজান্তঃপুরচারিণীদিগের জন্য এ উদ্যানের গায়ে একটি বিশ্রামবাটিকা ছিল। সুহাসিনী প্রিয়ম্বদা, মালতী ও দাসদাসী সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের পূজা দিয়া সে রাত্রির জন্য সেই বাটিকায় আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সঙ্গীগণ যখন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল, বালিকা একাকিনী ধীরে ধীরে এই উদ্যান মধ্যে আসিল। আসিয়া দেখিল, উদ্যান হাসিতেছে—উপরে আকাশের গায় পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে, হাসিভরা মুখে অগণ্য নক্ষত্র তাহার পার্শ্বে শোভিতেছে, নীচে ফুলকুলসুন্দরীরা হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া চন্দ্রকিরণের সঙ্গে জড়াজড়ি করিতেছে—উদ্যান হাসিতেছে। বালিকা স্থির হইয়া বসিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া সে হাসি দেখিল। হৃদয়ে যে হাসির কথা সদা সর্ব্বক্ষণ জাগিতেছে সেই হাসির কথা মনে হইল। বালিকা দেখিল এ সব হাসি সেই হাসির ন্যায়। তেমনি মধুর, তেমনি সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ, তেমনি আনন্দময়। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বালিকা গায়িল। প্রিয়ম্বদা আসিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছে। বালিকা আবার সেই মধুর গীত ধরিল।

সহসা কে ডাকিল—"সুহাস! কথা কর্ণে বাজিল। বালিকা চাহিয়া দেখিল—বিনোদ! সর্ব্বশরীর শীহরিয়া উঠিল, বালিকা ভীতা হইল। আর সে কলকণ্ঠ বাজিল না, বালিকা নীরব হইল। বীণার তার ছিঁড়িল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সম্ভাষণে।

"শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রিয়নাথ মমান্তে।"

উদ্ধবদূত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বিনোদ ও সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, কিসের গিরিবালা? এই যে মুখ—কতক সৌন্দর্য্য, কতক অমায়িকতা, কতক বালিকার লজ্জা—ইহার কাছে কিসের গিরিবালা? এই যে চক্ষু— দীর্ঘ, আয়ত, উজ্জ্বল, উজ্জ্বল অথচ শান্ত, আধজ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ রবি আধ চাঁদ, আধ আশা আধ ভয়—ইহার কাছে কিসের গিরিবালা? গিরিবালার বদনমণ্ডল ও শান্ত, সুনির্ম্মল, মধুরিমাপূর্ণ; সে নয়ন

সরলতা, নির্দ্দোষিতা ও পবিত্রতার আধার—কিন্তু সে অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতার উজ্জ্বল জ্যোতির নিকট বিনোদের স্বার্থসংকুল পাপহৃদয় অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না; কদাচিৎ তাহা হইলেও বিনোদ দেখিত, গিরিবালা চিরদুঃখিনী, আর সুহাসিনী ধনেশনন্দিনী—সুহাসিনী ও গিরিবালার প্রভেদ বিস্তর। বিনোদ ভাবিল কিসের গিরিবালা? সুহাসিনীর নিকট কিসের গিরিবালা?

অধঃপতনে যাইবার পূর্ব্বে লোকে এইরূপ ভাবে। বিনোদও অধঃপতনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, বিনোদ ও এইরূপ ভাবিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা—সে সকল কথা বিস্মৃত হইল। বিনোদ বলিল—"চুপ করিলে কেন, সুহাস?"

সুহাসিনী কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ নীরবে রহিল। বিনোদ আবার বলিল "অনেক দিনে অনেক কষ্টে তোমার দেখা পাইয়াছি, ওরূপ নীরবে থাকিওনা। কি গাহিতেছিলে, সুহাস, আবার সেইটি গাও।"

সেইরূপ অধোমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে বালিকা বলিল—"আমি পোড়ারমুখী তাই ও গান গাহিয়াছি। আগে জানিলে গাহিতাম না।"

বিনোদ বিস্মিত হইল। বলিল—"সে কি সুহাস? তুমি কি রাগ করিয়াছ?"

"রাগ করি নাই। রাগ করিব কেন?" বালিকা যে স্বরে এ কয়টি কথা বলিল তাহা অতি মধুর, শ্রবণে বীণাধ্বনিতুল্য। বীণাধ্বনিতুল্য সে স্বর স্থির হইয়া বিনোদ শুনিয়া বলিল—"রাগ কর নাই, তবে গায়িবে না কেন?"

বালিকা উত্তর করিল না।

কতক্ষণ বিনোদ ও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হৃদয় সমুদ্র—সমুদ্রের ন্যায় সে হৃদয়ে কত ভাবের লহরী উঠিতে লাগিল, উঠিয়া উঠিয়া আবার সেই হৃদয়েই মিলাইতে লাগিল। কিন্তু একটি মিলাইল না, পূর্ব্বহইতেই তাহা হৃদয়ে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করিতেছিল—সে লহরী মিলাইল না। বিনোদ কথা কহিল। বলিল—"সুহাস—সুহাস, একটি কথা—আমাদিগের বিবাহ কি হইবে না?"

বালিকা চমকাইয়া উঠিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই যাহা শুনিবার আশঙ্কায়

বালিকার হৃদয় ভয়ে আকুল হইতেছিল, এক্ষণে তাহা শুনিল। ধীর অথচ ঈষৎকম্পিত স্বরে বলিল—"বি—বা—হ!"

বি। হাঁ, সুহাস, যে বিবাহের সম্বন্ধ শৈশব হইতে হইয়াছে, সে বিবাহ কি হইবে না?

সু। তা আমি কি জানি? পিতাকে বলিবেন।

বি। বলিয়াছিলাম। তিনি এক্ষণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে প্রস্তুত। তোমার কি মত, সুহাস?

সু। পিতার অমতে আমার আবার মতামত কি?

বি। না, সুহাস, মতামত আছে বৈ কি। বল, ইহাতে তোমার মত আছে কি না।

সু। তাহাতে ফল?

বি। তোমার পিতাকে বলিব। তোমার মত হইলে অবশ্যই তিনি বিবাহ দিবেন। বল—বল এ হস্ত পাইব কি না।

বিনোদ নিজহস্তে সুহাসিনীর হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল, তীরের ন্যায় বালিকা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কি বলিতেছেন?"

বি। বল, আমায় ভাল বাসিবে কি না।

সু। ভালবাসিব না কেন? আমি আকাশের চাঁদ, গাছের ফুল, বনের পাখি—এ সকলকে ভালবাসি; আপনাকে ভালবাসিব না কেন?

বিনোদ বিস্মিত হইল। বলিল—"ওকি কথা, সুহাস?"

সু। কেন, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই তো বলিয়াছি।

বি। আমি তাহা বলি নাই। ও হৃদয় কি কখন ও পাইব?

বালিকা আবার চুপ করিল। কথা শুনিয়া অন্তরে শীহরিয়া উঠিল। ক্ষণেকের মধ্যে বালিকা সেই বালিকামূর্ত্তি ধরিল, মুখে অঞ্চল দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

আশ্চর্য্য হইয়া বিনোদ বলিল—"এ আবার কি সুহাস?"

তখন পূর্ব্ববৎ সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে বালিকা বলিল—"বিনু বাবু, এই যে মাধবীলতা সহকারদ্রুমে জড়াইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে লইয়া গিয়া দূরে ঐ উপাসবৃক্ষে তুলিয়া দাও দেখি।"

কথা শুনিয়া বিনোদ আরো আশ্চর্য্য হইল। বলিল—"সুহাস, তুমি বালিকা—এ জ্ঞান তোমার না থাকিতে পারে। যে লতা একস্থানে থাকিয়া একবার একটি বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে তাহাকে শতহস্ত দূরে লইয়া গিয়া বৃক্ষান্তরে তুলিয়া দিব কি প্রকারে? ইহা কি কখন হইয়া থাকে?

বালিকা আবার হাসিল। বলিল—"ইহা যদি না হয়, তবে যে হৃদয় একবার একজনের আশ্রয় লইয়াছে, তাহা আবার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে কিরূপে?"

বিনোদ সুহাসিনীর কথা বুঝিল। বুঝিল, সুহাসিনী বালিকা নয়। বালিকা হইয়াও সুহাসিনী প্রখরবুদ্ধিশালিনী। বিনোদ স্তম্ভিত হইল। সুহাসিনী যে তাহাকে ভালবাসে না—তাহাকে না ভাল বাসিয়া অন্য একজনকে ভালবাসে তাহা সে জানিত। জানিত, কিন্তু সুহাসিনীর মুখে তাহা কখন শুনে নাই। যাহা শুনে নাই, তাহা শুনিল। বিনোদ স্তম্ভিত হইল। কে যেন তাহার মাথায় প্রচণ্ড লগুড়াঘাত করিল। আহত সর্পের ন্যায় বেগে বিনোদ সুহাসিনীকে দুই হস্তে ধরিতে গেল। পথিক যেমন সেই ঊর্দ্ধফণ সর্পকে দেখিয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া যায়, বালিকা তেমনি তীরের ন্যায় দূরে গিয়া দাঁড়াইল। একদিন স্বপ্নে যাহাকে সর্পের ন্যায় দেখিয়াছিল, এক্ষণে সেই বিনোদকে সর্পাকারে সম্মুখে দেখিল। আর বালিকা দাঁড়াইল না, ভয়ে আশ্রমবাটিকাভিমুখে দৌড়িয়া পলাইল। হতাশ হইয়া বিনোদ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য একবার গিরিবালার সেই ভালবাসা—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, সমুদ্রতুল্য; সমুদ্রতুল্য সহস্র তাড়নায় ও প্রশান্ত, স্থির, গম্ভীর অথচ আপন চাঞ্চল্যে আপনি কুলপ্লাবী—সেই ভালবাসার কথা স্মরণ হইল। বিনোদ পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, সুহাসিনীর নিকট কিসের গিরিবালা? এক্ষণে বুঝিল, গিরিবালার নিকট কিসের সুহাসিনী? সে বালিকার প্রতি তাহার পাশব আচরণের কথা স্মরণ হইল। একবিন্দু—একবিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রুবিন্দু অতি সুন্দর, অতি পবিত্র—তাহা অপার্থিব সামগ্রী। পাপীর চক্ষে পরিতাপের অশ্রু স্বর্গের পথে একমাত্র সম্বল।

নিশ্চল প্রদীপ।

[চতুর্দ্দশপদী কবিতা]

আঁধার শর্ব্বরী। বায়ু বহেনা আকাশে।
একটি প্রদীপ জ্বলে (নিথরশরীর),
নিরাশ হৃদয়ে যেন একটি সু-আশা,
অদূর কুটীরে ;—শিখা নড়ে না কদাপি।
আলেখ্যে চিত্রিত চিত্র, কিম্বা ভাবি মনে
কে এক যোগেন্দ্র বুঝি সমাধি-প্রভাবে
মজি তপে ধ'রেছে ও নিশ্চল মূরতি।
উজ্জ্বল জ্বলন শোভা শান্ত সুনির্ম্মল,
সাবিত্রী-সীমন্তে যথা সিন্দূরের ফোটা,
দীপিছে নিথরে দীপ আঁধার চিরিয়া।
হেরি তায় পড়ে মনে দেব ধূর্জ্জটিরে
(যে শিরে কিরীটরূপে হাসে শশিকলা)
নীরবে নিঃশ্বাস রোধি ঊর্দ্ধনেত্রে যবে
সাধিলা অশেষ যোগ গাঢ় যোগে বসি।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

-০-

বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ প্রণীত। বলিল বাঙ্গালাভাষায় লেখক নাই, লিখিত নাই, কবি নাই, কাব্য নাই? স্তম্ভিত মেকলেবৃত্তিপরায়ণ সমালোচকপ্রধান সে দিন যখন লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের পর বাঙ্গালা ভাষায় তেমন সুন্দর গ্রন্থ

অদ্যাপি রচিত হয় নাই,—তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের বিস্ময় জন্মিয়াছিল
হৃদয়ে কুব্ধ হইয়াছিলাম। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, তিনি এবং তাঁহা
ন্যায় (Transition Period এর) মহাত্মাগণ যেন একবার এই পুস্তক খানি
আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করেন। এবং দেখেন যেন, সেই সকল লেখকদিগের কথা
বলিতে গিয়া হরপ্রসাদ বাবু নিজে কেমন অদ্ভুত লিপিপটুতার পরিচয় দি
সুকৌশলে অলক্ষিতে তাঁহাদিগের মধ্যে একখানি উচ্চ আসন অধিকা
করিয়া ফেলিয়াছেন। ১৮০০ সালের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যকা
দিন পর্য্যন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক অবস্থাপরিবর্ত্তসমূহ যেরূ
বিদ্যুত্ত্বরিতগতিতে অথচ সহজ কথায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার
সে বর্ণনা নিজেই এক অভিনব অপূর্ব্ব সামগ্রী। যিনি একবার ইহার প্র
পৃষ্ঠা আরম্ভ করিবেন, তিনি শেষ পৃষ্ঠায় না আসিয়া আর উঠিতে পারিবে
না। বর্ণনা স্রোতের ন্যায় ভাসাইয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লই
যাইবে। কিন্তু বর্ণনার এই স্রোতোগতিত্বের জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রী মহা
'সারদামঙ্গল সঙ্গীত' প্রভৃতি দুই এক খানি উচ্চতম পুস্তকের কথা বি
হইয়া থাকিবেন। ভবিষ্যতে ইহার সংশোধন দেখিলে বড়ই সুখী হই
অতি সদুপদেষ্টার ন্যায় একদল লেখককে সাহিত্যমাত্রব্যবসায়ী হইবার বি
যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি চরমের কথা। কিন্তু—কিন্তু তাহা হইতে
এমন দিন কি কখন আসিবে—ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আবার এমন দি
দিবেন যে, "বাঙ্গালাসাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্র
পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি পৃথিবীমধ্যে এক ম
জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে" ?—হরপ্রসাদ বাবুর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক

ভারতমহিলা—ইহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার অন্য
ফল। ইহা [illegible] বিস্তার সমালোচনা করিবার আমাদিগের আবশ্যকতা না
আবশ্যকতা নাই [illegible] না, যাহা বহুতর বিদ্বন্মণ্ডলী কর্ত্তৃক পঠিত, স
লোচিত ও প্রশংসিত হইলে মহারাজ হোলকার কর্ত্তৃক পারিতোষিক প্র
হইয়াছিল তাহা যে বাঙ্গালায় একখানি উপাদেয় পুস্তক তাহার আর সন্দে
নাই। আবশ্যকতা নাই, অথবা থাকিলেও সে স্থান কোথায় ? স্নেহপ্রবৃ
সহিত বুদ্ধি বৃত্তির ও কর্ম্মক্ষমতার সঙ্গতি হইলে নারীচরিত্রের কিরূপে প্র

পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিরূপেই বা সামাজিক অবস্থা, জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটি কারণে পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা বশতঃ কেহই সে চরিত্রের রমণী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, এবং ঋষিদিগের, পৌরাণিকদিগের ও কবিদিগের সময়ে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কি প্রকার ছিল—লেখক এ সমস্ত বিষয় যেরূপ সুন্দর রূপে সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সীতা হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী ভবানী পর্য্যন্ত রমণীরত্নসমূহের চরিত্র যে প্রকার অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে—আমরা তাহার কোন্ স্থান রাখিয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব? কল্পনায় সে স্থান কোথায়? ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাস—একত্রে সকল শাস্ত্রের এমন সুন্দর সমন্বয় আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। বাস্তবিক্ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে 'ভারতমহিলা' প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা একটি অপূর্ব্ব সুধাভাণ্ড। আমরা সেই সুধা-ভাণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ সুধা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়া এ সমালোচনার উপসংহার করিব। পাঠক পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন—"নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভি রস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি' —এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন, স্ত্রী ও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।"

বীণা।—রাজকৃষ্ণ বাবুর বীণা আবার বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই সুখী হইলাম। তাঁহার ন্যায় সুগায়ক সচরাচর অতি বিরল, আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা, সারদা যেন কৃপা করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন; যেন তাঁহার "ভাঙা বীণা বাধা বিনা স্বকাজ সাধিতে পারে।"

বাল্মীকি রামায়ণ।—রামায়ণ গদ্যে অনুবাদ করিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় যশঃস্বী হইতে পারিয়াছেন অতি অল্প লোকে; সাহিত্য-প্রকাশ যন্ত্র আজ সেই যশোলিপ্সু হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যম দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?—দ্বিতীয় সংস্করণ।—বাস্তবিক কাল গায় কাল কোট দেখিলে বড়ই ঘৃণা হয়, আক্ষেপ হয়, দুঃখিত হই। আবার তাঁহার মুখে 'Babu—that beastly title I hate with all my heart' —এ কথা শুনিলে আমাদিগের ভয় হয়, 'অ রম্বা কিং ভবিষ্যতি' ভাবিয়া অন্তরাত্মা আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠে। লেখক সুকবি বটেন, তাঁহার টুপি টি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা ও সেই টুপিটি সকলের হাতে দিয়া বলি—

"যদি এই টুপি কারো মস্তকে হয় ফিট্
হিট্ ল'য়ে শুধ্‌রে যাও হ'য়ে পড় টিট্॥"

ঘোড়ার ডিম্—খোস্ গল্প নং ১
কুপোকাৎ—খোস্ গল্প নং ২
} বলি, এ খোসগল্পকার

কে? সরল কথায় সরল পদ্যে সরল উপদেশ—লেখক কোন্ মহাত্মা? না প্রকাশিত নাই। নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তি একজন সুকবি, সুচিত্রকর ও সদুপদেষ্টা। কবিত্ব ইহার কোন্ খানে নাই ইহার ছত্রে ছত্রে কবিত্ব; জয়ডাক্তার ও নফরা রাখাল চিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টা উপদেশ ইহাতে যাহা আছে তাহাতে অনেক কাঙালের ঘোঁড়া রে সারিতে পারিবে, অনেক নারকীর চরিত্র-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে

শ্মশানে মিলন। হরিশ্চন্দ্রের শেষ অংশ লইয়া ইহা লিখিত হইয়াছে ভীতিময় শ্মশানভূমে অর্দ্ধদগ্ধবংশখণ্ড হস্তে হরিশ্চন্দ্রের সে চিত্র মহাভার পাঠ করিয়া কাঁদে না এমন ভারতবাসী নাই। বিষয়টি অতি সুন্দর; ইহ লেখা ও অসুন্দর হয় নাই। মধ্যে ২ কবিত্ব আছে, পাঠ করিয়া আম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেখকের বোধ হয়, এই প্রথম উদ্যম। প্রথ উদ্যমে তিনি যে 'প্রেয়সি রে আমার!' বা 'এই কি ভারত?' লিখিয়া এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সে জন্য আমরা তাঁহা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার সোহাগ। ভাগ্যধর বাবু তাঁহার প্রিতমাকে সোহাগ করিয়াছে —সুখের কথা। সোহাগের লেখা উত্তম হইয়াছে, পড়িয়া আমরাও সুখ হইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সোহাগ কি কেবল প্রিয়তমারই ইজারা সামগ্রী? বঙ্গযুবক আজও কি ভ্রাতায় ভ্রাতায়, সখায় সখায় সোহা করিতে শিখিবে না?

বিশ্বাসী—মাসিকপত্র। কুসংস্কার ও কুরীতির অন্ধকার হইতে সমাজ মধ্যে যাঁহা দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতির আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, তাঁহার দীর্ঘজীবন অব প্রার্থনীয়। বিশ্বাসীর দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বিষবৈরী। স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার 'Well wisher' লিখি দেশের অনেক উপকার সাধিয়াছিলেন; বিষবৈরীর দ্বারা কত উপক হইয়াছে জানি না, তবে আশাদলের সভ্যবৃন্দের উপর আমাদিগের আ আছে। এ প্রকার পত্রিকা দিন দিন যত বৃদ্ধি পায় ততই দেশের মঙ্গল।

রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়
নিবাধই ইয়ংমেন্স লাইব্রেরী
জয়নগর পাঠাগার
} পৃথক্ পৃথক্ তিনটি সাধারণ পুস্তকালয়ে পৃথক্ পৃথক্ তিন খানি বিবরণ-পুস্তিকা বিবৃত বিষয় প্রীতিপ্রদ বটে; আম ইহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী।